
ভারত
ভ্রমণ
টুরিস্ট
গাইড
চিত্রসেন

নতুন সংস্করণ : চৈত্র, ১৩৮৫ (এপ্রিল, ১৯৭৯)

চতুর্থ সংস্করণ : ১লা বৈশাখ, ১৩৮৪

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৯
তৃতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৮১

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

দাম : পনেরো টাকা

ভারত ভ্রমণ টুরিস্ট গাইড

এতে আছে :—

* ভারতের প্রতিটি প্রদেশের দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা।
* কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি মহানগরী থেকে ঐ সকল দর্শনীয় স্থানে যাবার ট্রেন, বাস প্রভৃতি যানবাহনের সঠিক নিশানা।
* সরকারী, বেসরকারী থাকার স্থান এবং ঐ সকল জায়গায় স্থান পেতে হলে কোথায় কার কাছে লিখে অনুমতি সংগ্রহ করতে হয় তার বিস্তৃত ঠিকানা।
* দৈনিক থাকা খাওয়া বাবদ বিভিন্ন স্থানের সম্ভাব্য খরচ।
* বিভিন্ন শ্রেণীর হোটেল তালিকা।
* সরকারী টুরিস্ট অফিস ও বেসরকারী ভ্রমণ সংস্থাগুলির (কলকাতায় অবস্থিত) ঠিকানা ও ফোন নাম্বার।
* মেল ও এক্সপ্রেসে শয়ন ও উপবেশনের স্থান সংরক্ষণ কলকাতার কোন্ কোন্ বুকিং কাউণ্টারে হয়ে থাকে তার নির্দেশ।

কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য

* যাঁরা কোন ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে দেশ ভ্রমণ করতে চান, তাঁরা নিচের দুটি ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন :—

1, KUNDU SPECIAL—1, Chittaranjan Avenue ; or, 40/1, Strand Road, Calcutta-1. Phone : 23-1369, 22-7247.

● পশ্চিমবঙ্গ অথবা ভারতের যে কোন দর্শনীয় স্থানের বিষয়ে বিভিন্ন রকমের অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন :—

1. Government of West Bengal—Regional Tourist Bureau.—3/2, Binoy-Badal-Dinesh Bag, Calcutta-1. Phone : 23-8271.

2. Government of India Tourist office—4, Shakespeare Sarani. Calcutta-16. Phone : 44-3521, 0933.

● ট্রেন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য :—

1. HOWRAH STATION ENQUIRY. Phone : 66-2586.

2. SEALDAH STATION ENQUIRY. Phone : 35-4391.

● স্থান-সংরক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য :—

[রেলের নিয়মাবলী মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয়। তাই যাত্রার বেশ কিছুদিন আগে স্টেশন এনকোয়ারী থেকে রিজার্ভেসানের নিয়মকানুন সম্বন্ধে জেনে নেওয়া ভাল।]

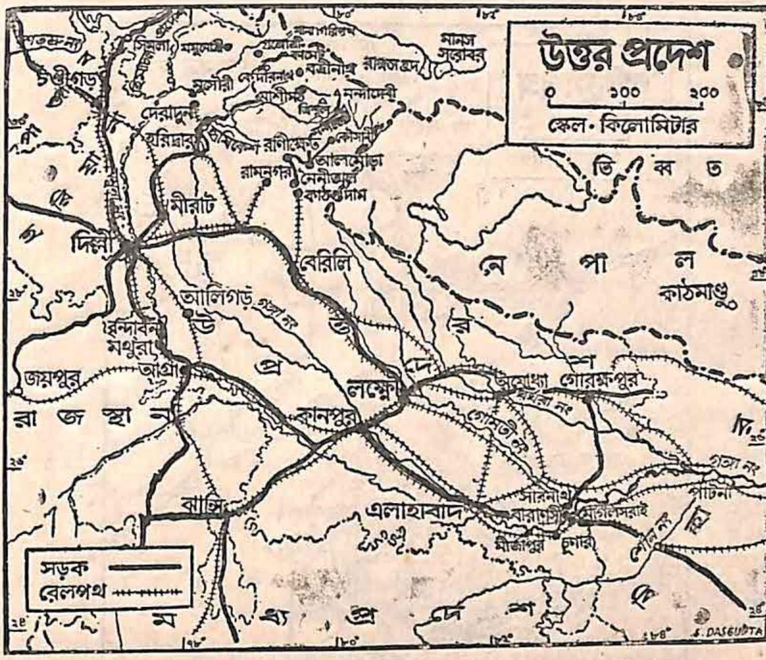
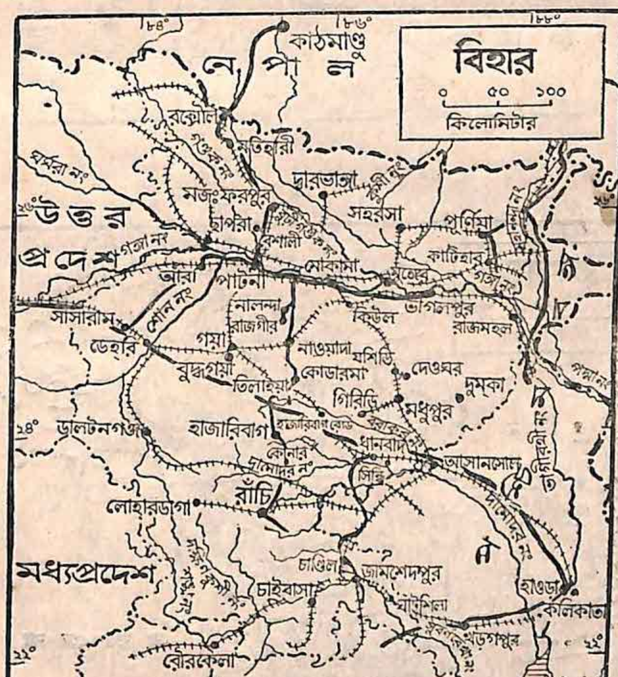
মেল অথবা এক্সপ্রেস ট্রেনে শয়ন ও উপবেশনের স্থান সংরক্ষণের জন্য রেলের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে অনুসন্ধান করুন :—

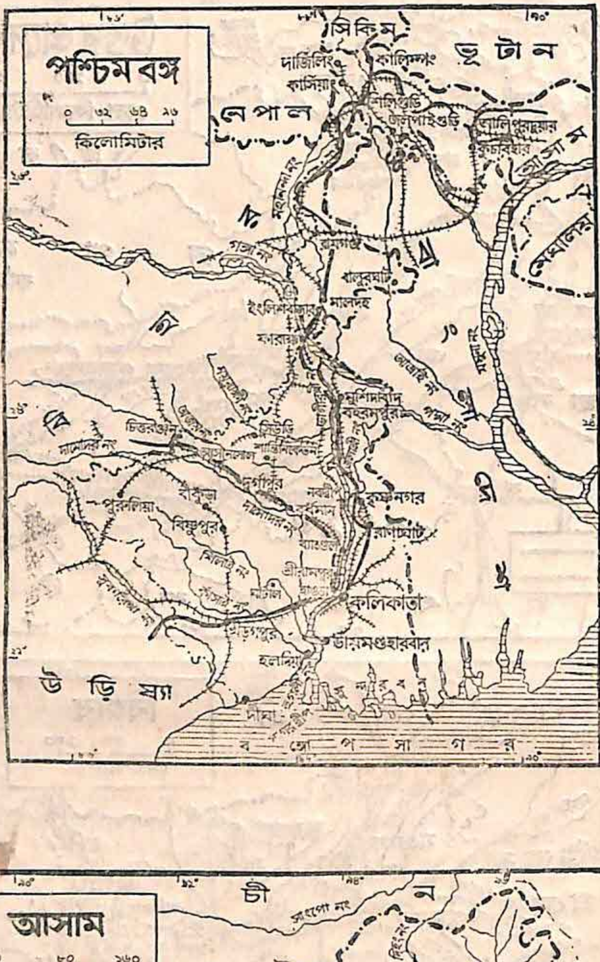
হাওড়া, শিয়ালদা, ফেয়ারলি প্লেস, রসা রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, বিধান সরণী, পার্ক স্ট্রীট, কাশীপুর রোড, খিদিরপুর, সালকিয়া, ঘোলসাপুর, বালিগঞ্জ।

সূচী

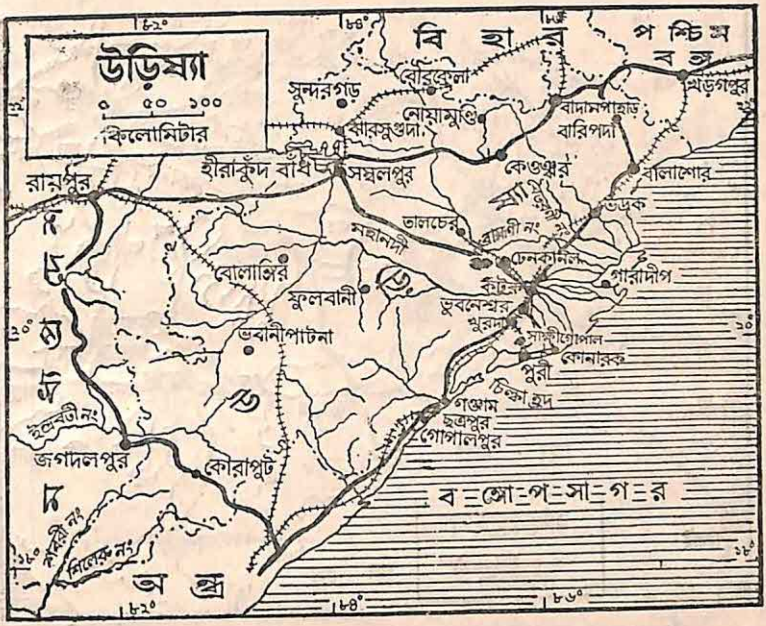
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

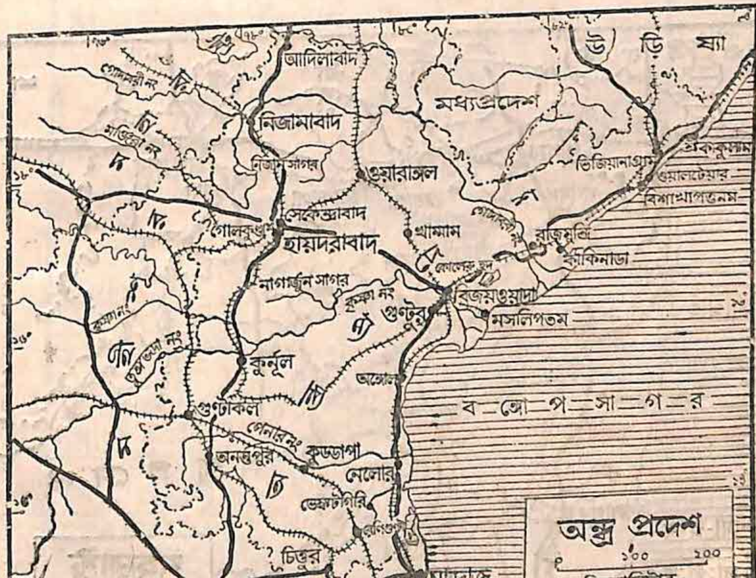
● নিম্নের স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে বহু দর্শনীয় স্থানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

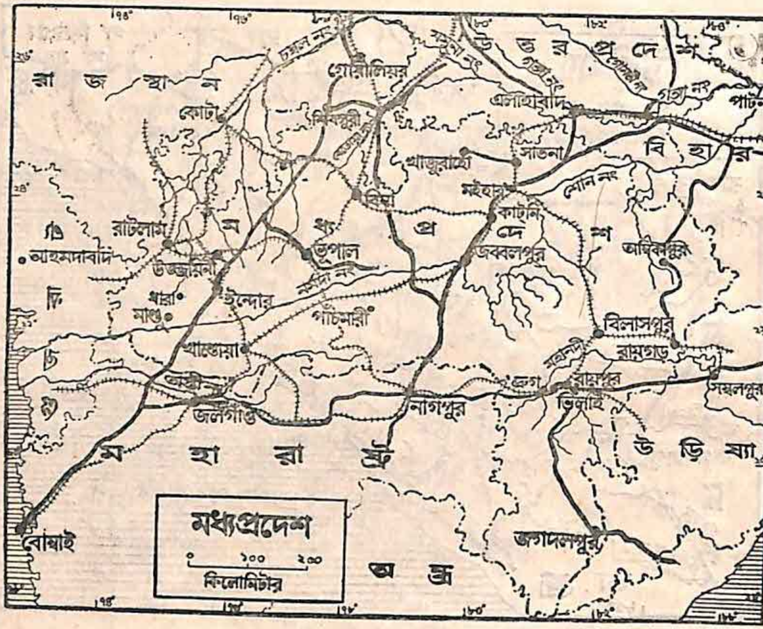

উত্তর প্রদেশ
০ ১০০ ২০০
স্কেল• কিলোমিটার
চণ্ডীগড়
সিমলা
দেরাদুন
হরিদ্বার
মীরাট
দিল্লী
আলমোড়া
নৈনীতাল
কাঠগুদাম
বেরিলি
আলিগড়
বৃন্দাবন
মথুরা
আগ্রা
জয়পুর
রা জ স্থা ন
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
অযোধ্যা
গোরক্ষপুর
এলাহাবাদ
বারাণসী
মোগলসরাই
মীর্জাপুর
চুনার
পাটনা
ঝান্সি
মানস সরোবর
তি ব ব ত
নে পা ল
কাঠমাণ্ডু
সড়ক
রেলপথ
ম ধ্য প্র দে শ
S. DASGUPTA

বিহার
০ ৫০ ১০০
কিলোমিটার
কাঠমাণ্ডু
নে পা ল
রক্সৌল
মতিহারী
দ্বারভাঙ্গা
মজঃফরপুর
ছাপরা
বৈশালী
সহরসা
পূর্ণিয়া
কাটিহার
উত্তর প্রদেশ
আরা
পাটনা
মোকামা
মুঙ্গের
ভাগলপুর
রাজমহল
সাসারাম
নালন্দা
রাজগীর
কিউল
ডেহরি
গয়া
নাওয়াদা
যশিডি
দেওঘর
বুদ্ধগয়া
কোডারমা
দুমকা
তিলাইয়া
গিরিডি
মধুপুর
ডালটনগঞ্জ
হাজারিবাগ
ধানবাদ
আসানসোল
সিন্ধ্রি
রাঁচি
লোহারডাগা
মধ্যপ্রদেশ
চাণ্ডিল
জামশেদপুর
চাইবাসা
ঘাটশিলা
হাওড়া
কলিকাতা
খড়গপুর
রৌরকেলা
উ ড়ি ষ্যা
ব: ো:প: সা: গা: র

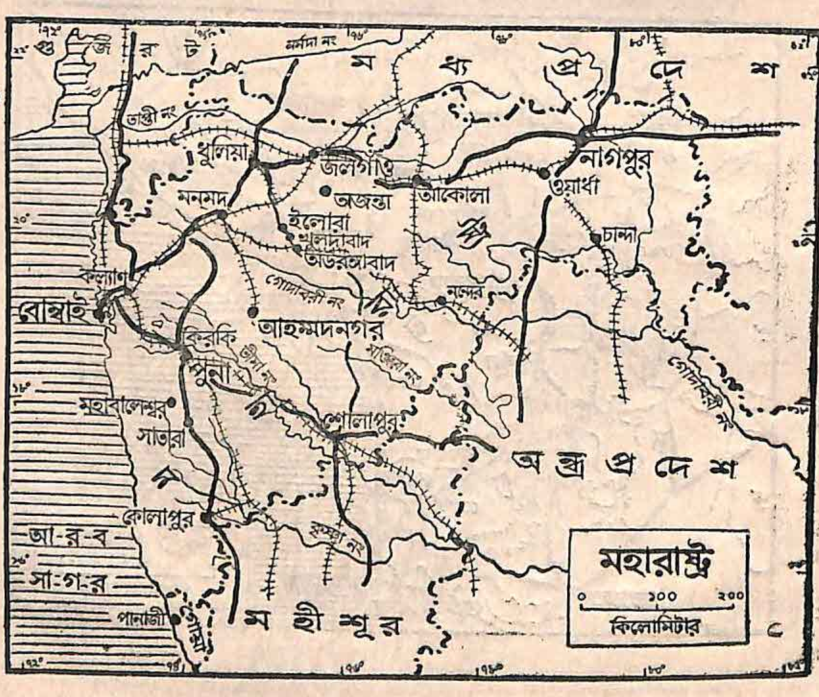

পশ্চিমবঙ্গ
০ ৩২ ৬৪ ৯৬
কিলোমিটার
সিকিম
ভুটান
নেপাল
দার্জিলিং
কালিম্পং
কার্সিয়াং
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
কুচবিহার
আসাম
মেঘালয়
রায়গঞ্জ
বালুরঘাট
মালদহ
ইংলিশবাজার
ফারাক্কা
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
চিত্তরঞ্জন
সিউড়ি
শান্তিনিকেতন
আসানসোল
দুর্গাপুর
বাঁকুড়া
পুরুলিয়া
বিষ্ণুপুর
বর্ধমান
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
রাণাঘাট
শ্রীরামপুর
কলিকাতা
খড়্গপুর
ডায়মণ্ডহারবার
হলদিয়া
উড়িষ্যা
দীঘা
ব ঙ্গো প সা গ র

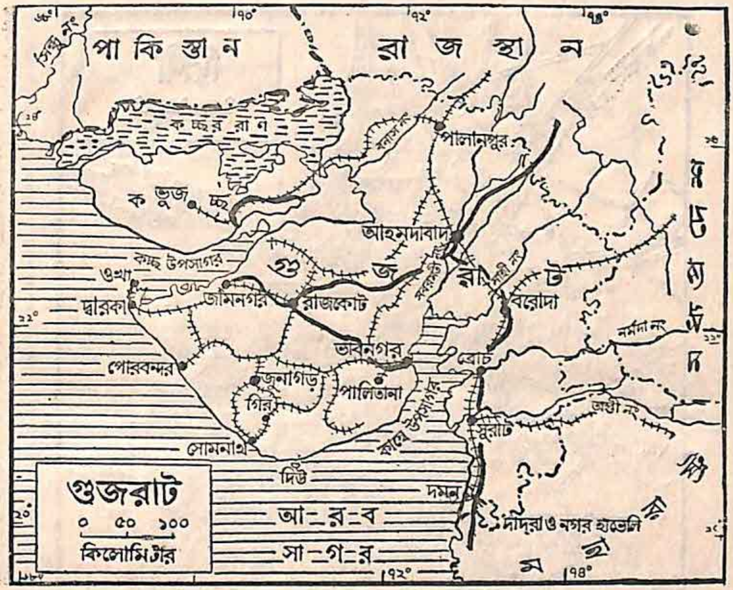

আসাম
০ ৮০ ১৬০
কিলোমিটার
চীন
ভুটান
ডিব্রুগড়
শদীয়া
তিনসুকিয়া
শিবসাগর
উত্তর লক্ষীমপুর
বালিপাড়া
তেজপুর
যোরহাট
গোলাঘাট
গৌহাটি
গোয়ালপাড়া
শিলং
মেঘালয়
লামডিং
ডিমাপুর
কোহিমা
হাফলং
শিলচর
ইমফল
ব্রহ্মদেশ
বাংলাদেশ
ত্রিপুরা
আগরতলা
মিজোরাম

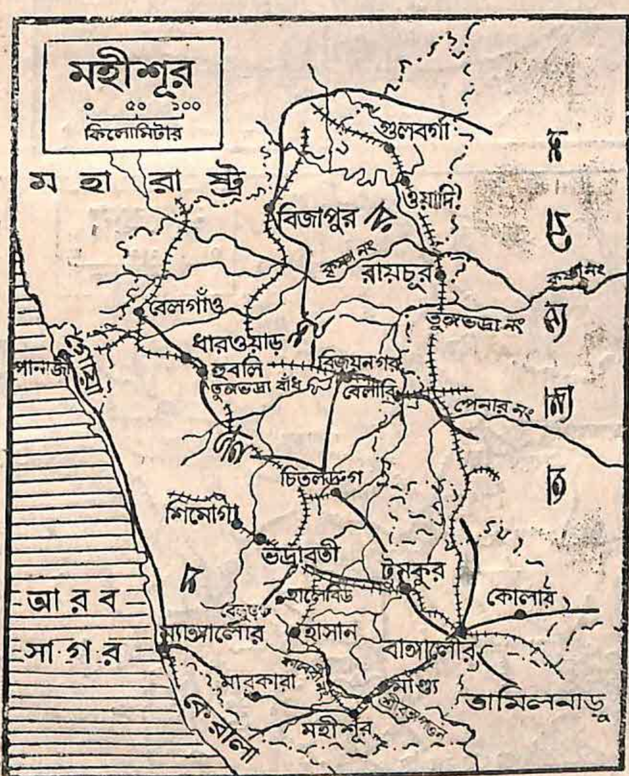

উড়িষ্যা
০ ৫০ ১০০
কিলোমিটার
বিহার
পশ্চিমবঙ্গ
সুন্দরগড়
রৌরকেলা
নোয়ামুণ্ডি
ঝারসুগুদা
বাদামপাহাড়
খড়গপুর
বারিপদা
হীরাকুঁদ বাঁধ
সম্বলপুর
কেওঞ্ঝর
বালাশোর
রায়পুর
ভদ্রক
তালচের
মহানদী
ঢেনকানল
বোলাঙ্গির
পারাদীপ
কটক
ফুলবানী
ভুবনেশ্বর
খুরদা
ভবানীপাটনা
সাক্ষীগোপাল
কোনারক
পুরী
চিল্কা হ্রদ
গঞ্জাম
ছত্রপুর
গোপালপুর
ইন্দ্রবতী নং
জগদলপুর
কোরাপুট
ব-ঙ্গো-প-সা-গ-র
সিলেরু নং
অন্ধ্র

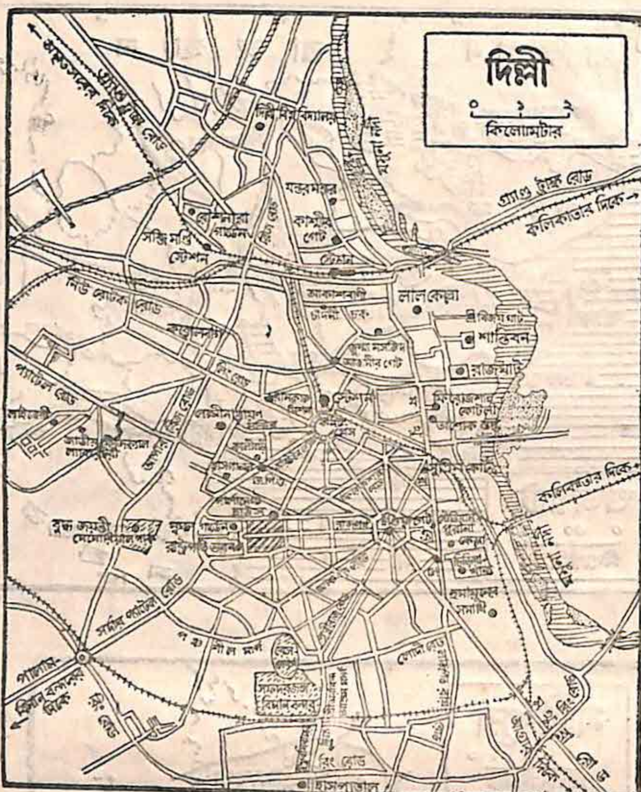

উড়িষ্যা
আদিলাবাদ
মধ্যপ্রদেশ
নিজামাবাদ
নিজাম সাগর
ওয়ারাঙ্গল
ভিজিয়ানাগ্রাম
ওয়ালটেয়ার
বিশাখাপত্তনম
সেকেন্দ্রাবাদ
গোলকুণ্ডা
হায়দরাবাদ
খাম্মাম
রাজমুন্দ্রি
কাকিনাডা
নাগার্জুন সাগর
কৃষ্ণা নং
বিজয়ওয়াদা
গুন্টুর
মসলিপতম
কুর্নুল
অঙ্গোল
গুন্টাকল
ব-ঙ্গো-প-সা-গ-র
পেনার নং
কুড্ডাপা
অনন্তপুর
নেলোর
ভেঙ্কটগিরি
চিত্তুর
মাদ্রাজ
বাঙ্গালোর
তামিলনাড়ু
অন্ধ্র প্রদেশ
কিলোমিটার

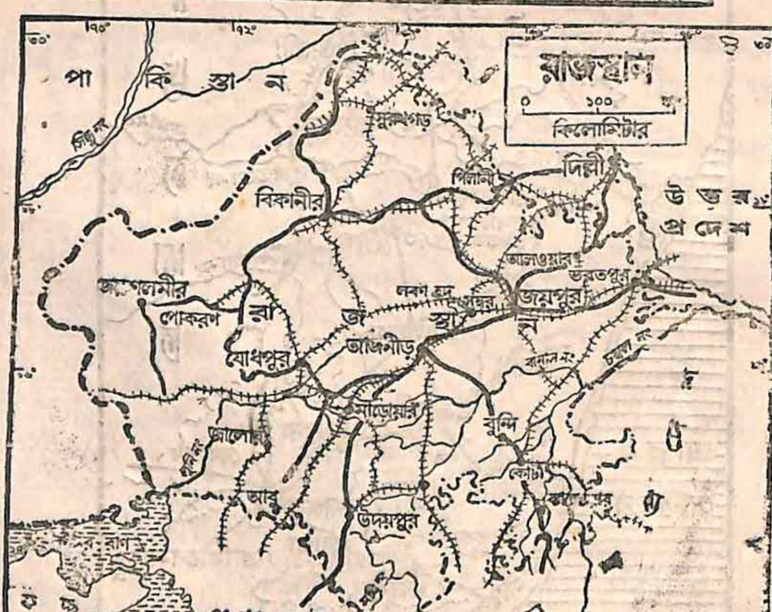

মধ্যপ্রদেশ
০ ১০০ ২০০
কিলোমিটার
রাজস্থান
উত্তর প্রদেশ
বিহার
মধ্য প্রদেশ
মহারাষ্ট্র
উড়িষ্যা
অন্ধ্র
গোয়ালিয়র
কোটা
এলাহাবাদ
পাটনা
খাজুরাহো
সাতনা
মইহার
কাটনি
বিনা
ভুপাল
রাটলাম
আহমদাবাদ
উজ্জয়িনী
জব্বলপুর
ইন্দোর
ধারা
মাণ্ডু
পাচমারী
খাণ্ডোয়া
বিলাসপুর
রায়গড়
রায়পুর
ভিলাই
নাগপুর
জলগাঁও
সম্বলপুর
জগদলপুর
বোম্বাই
শোন নং
নর্মদা নং
যমুনা নং
গঙ্গা নং

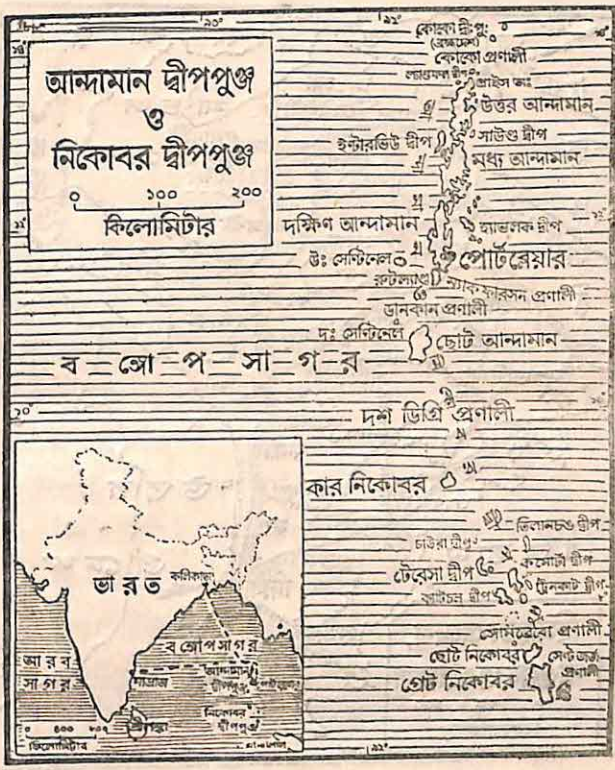

মহারাষ্ট্র
০ ১০০ ২০০
কিলোমিটার
গুজরাট
মধ্য প্রদেশ
অন্ধ্র প্রদেশ
মহীশূর
আ-র-ব
সা-গ-র
নর্মদা নং
তাপ্তী নং
ধুলিয়া
জলগাঁও
মনমদ
অজন্তা
আকোলা
নাগপুর
ওয়ার্ধা
চান্দা
ইলোরা
খুলদাবাদ
ঔরঙ্গাবাদ
কল্যাণ
বোম্বাই
গোদাবরী নং
নন্দের
আহম্মদনগর
কিরকি
পুনা
মহাবালেশ্বর
সাতারা
শোলাপুর
কোলাপুর
কৃষ্ণা নং
পানাজী
গোয়া

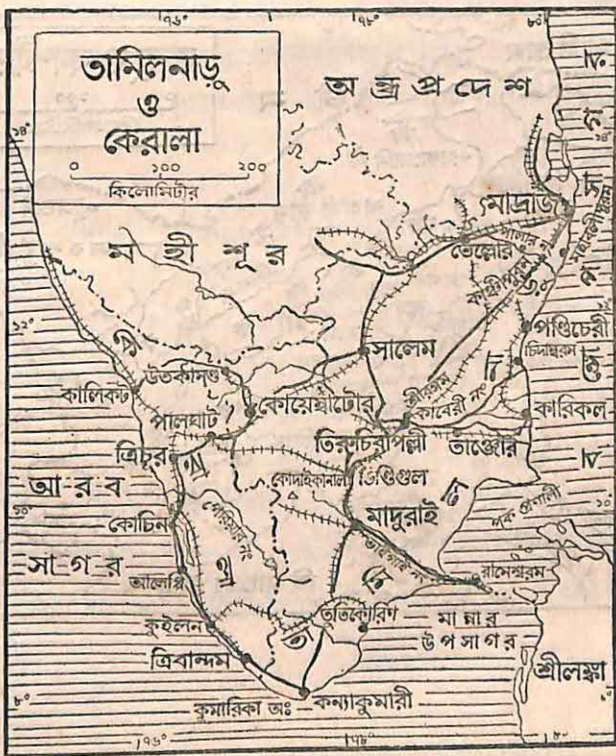

গুজরাট
০ ৫০ ১০০
কিলোমিটার
পাকিস্তান
রাজস্থান
কচ্ছের রাণ
ভুজ
কচ্ছ
পালানপুর
আহমদাবাদ
গুজরাট
কচ্ছ উপসাগর
ওখা
দ্বারকা
জামনগর
রাজকোট
বরোদা
নর্মদা নং
ভাবনগর
ব্রোচ
পোরবন্দর
জুনাগড়
পালিতানা
গির
তাপ্তী নং
সুরাট
সোমনাথ
দিউ
দমন
দাদ্রা ও নগর হাভেলি
আরব
সাগর
মধ্যপ্রদেশ
মহারাষ্ট্র


মহীশূর
০ ৫০ ১০০
কিলোমিটার
মহারাষ্ট্র
গুলবর্গা
ওয়াদি
বিজাপুর
কৃষ্ণা নং
রায়চুর
বেলগাঁও
ধারওয়াড়
হুবলি
বিজয়নগর
তুঙ্গভদ্রা নং
তুঙ্গভদ্রা বাঁধ
বেলারি
পেনার নং
পানাজী
গোয়া
অন্ধ্রপ্রদেশ
চিতলদুর্গ
শিমোগা
ভদ্রাবতী
টুমকুর
হালেবিড
কোলার
আরব
সাগর
ম্যাঙ্গালোর
হাসান
বাঙ্গালোর
মারকারা
মাণ্ড্য
শ্রীরঙ্গপত্তন
তামিলনাড়ু
মহীশূর
কেরালা

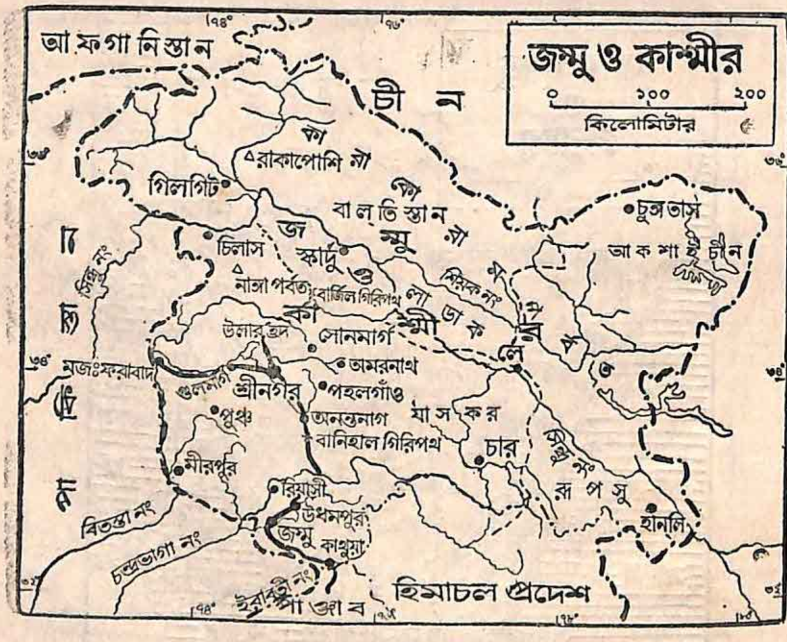

দিল্লী
০ ১ ২
কিলোমিটার
গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড
কলিকাতার দিকে
লালকেল্লা
শান্তিবন
রাজঘাট
চাঁদনী চক
সব্জিমণ্ডি
স্টেশন
কাশ্মীর গেট
রিং রোড
হাসপাতাল


রাজস্থান
১০০
কিলোমিটার
পা কি স্তা ন
বিকানীর
দিল্লী
উ ত্ত র
প্র দে শ
জয়পুর
ভরতপুর
যোধপুর
আজমীড়
পোকরণ
বুন্দি
কোটা
আবু
উদয়পুর
গু জ রা ট


আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
ও
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
০ ১০০ ২০০
কিলোমিটার
কোকো প্রণালী
উত্তর আন্দামান
ইন্টারভিউ দ্বীপ
মধ্য আন্দামান
দক্ষিণ আন্দামান
পোর্টব্লেয়ার
ডানকান প্রণালী
ছোট আন্দামান
ব ঙ্গো প সা গ র
দশ ডিগ্রি প্রণালী
কার নিকোবর
টেরেসা দ্বীপ
ছোট নিকোবর
গ্রেট নিকোবর
ভা র ত
ব ঙ্গো প সা গ র
আ র ব
সা গ র


তামিলনাড়ু
ও
কেরালা
০ ১০০ ২০০
কিলোমিটার
অ ন্ধ্র প্র দে শ
ম হী শূ র
মাদ্রাজ
ভেল্লোর
পণ্ডিচেরী
সালেম
উতকামন্ড
কালিকট
কোয়েম্বাটোর
পালঘাট
কারিকল
ত্রিচুর
তিরুচিরাপল্লী
তাঞ্জোর
ডিণ্ডিগুল
আ র ব
কোচিন
মাদুরাই
সা গ র
আলেপ্পি
রামেশ্বরম
তুতিকোরিণ
কুইলন
মা ন্না র
উপ সা গ র
ত্রিবান্দম
শ্রীলঙ্কা
কুমারিকা অঃ
কন্যাকুমারী


হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা
০ ৫০ ১০০
কিলোমিটার
জম্মু ও কাশ্মীর
হিমাচল প্রদেশ
পাকিস্তান
রাজস্থান
হরিয়ানা
উত্তর প্রদেশ
তিব্বত
জম্মু
চম্বা
ডালহৌসী
পাঠানকোট
ধরমশালা
পালামপুর
মানালী
কাংড়া
কুলু
যোগিন্দরনগর
বিপাশা নং
মাণ্ডি
নাঙ্গাল বাঁধ
অমৃতসর
ইরাবতী নং
জলন্ধর
ভাকরা বাঁধ
শতদ্রু নং
সিমলা
কশৌলি
কালকা
ফিরোজপুর
লুধিয়ানা
চণ্ডীগড়
ভাতিন্দা
পাতিয়ালা
আম্বালা
থানেশ্বর
কর্নাল
পানিপথ
হিসার
রোটক
দিল্লী
রেওয়ারি


জম্মু ও কাশ্মীর
০ ১০০ ২০০
কিলোমিটার
আফগানিস্তান
চীন
পাকিস্তান
কাশ্মীর
রাকাপোশি
বালতিস্তান
গিলগিট
চিলাস
স্কার্দু
জম্মু ও কাশ্মীর
নাঙ্গা পর্বত
বোর্জিল গিরিপথ
লাডাক
সিন্ধু নং
শিয়ক নং
চুসতাস
আকশাই চীন
উলার হ্রদ
সোনমার্গ
অমরনাথ
লে
মজঃফরাবাদ
গুলমার্গ
শ্রীনগর
পহলগাঁও
পুঞ্চ
অনন্তনাগ
যাসকর
বানিহাল গিরিপথ
চার
মীরপুর
রিয়াসী
উধমপুর
রূপসু
হানলি
বিতস্তা নং
চন্দ্রভাগা নং
জম্মু
কাঠুয়া
ইরাবতী নং
পাঞ্জাব
হিমাচল প্রদেশ

॥ উত্তর প্রদেশ ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ভারতের অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজ্য উত্তর প্রদেশ। উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয় ও তিব্বত, উত্তর-পূর্বে নেপাল, পূর্বে বিহার, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমে রাজস্থান, দিল্লী এবং পাঞ্জাব। তুষারমৌলী হিমালয়, ঘন নিবিড় অরণ্য এবং উর্বর গাঙ্গেয় উপত্যকা রাজ্যটিকে সমৃদ্ধ ও সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। এটি চরম অবস্থার দেশ অর্থাৎ গ্রীষ্মে দাবদাহ এবং শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বেশ কয়েকটি স্থানে তুষারপাতের ফলে শীতকাল অসহ্য হয়ে ওঠে। এই রাজ্যে অবস্থিত কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জেলা। হিন্দুদের বেশীর ভাগ তীর্থক্ষেত্রগুলি এখানে অবস্থিত। মুসলিম কৃষ্টির দিক থেকেও এই রাজ্য উন্নত। মুঘল যুগের উন্নতির বহু চিহ্নযুক্ত আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রি এই রাজ্যেই অবস্থিত। হিন্দুদের তীর্থস্থানের মধ্যে প্রয়াগ, হরিদ্বার, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ এই রাজ্যকে মহিমান্বিত করেছে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহারাণপুর দারুল-উলুম এই রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান।

লক্ষ্ণৌ ঃ—

রাজ্যের রাজধানী ও দর্শনীয় শহর। গোমতী নদীর ধারে অবস্থিত শহরটি ভারতের উত্থান পতনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। গোমতী নদী প্রাচীন ও আধুনিক লক্ষ্ণৌকে ভাগ করেছে। পুরাণে কথিত আছে লক্ষণ এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন এর নাম ছিল লক্ষ্মণাবতী। ক্রমে এটি লক্ষ্ণৌ নাম গ্রহণ করেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে লক্ষ্ণৌএর রজতজয়ন্তী হয় অযোধ্যার নবাবদের আমলে। নবাব আসফউদ্দৌলা লক্ষ্ণৌতে রাজধানী সরিয়ে আনেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাবদের অধীনে ছিল এই শহর। ১৮৫৭-এর গণ অভ্যুত্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল লক্ষ্ণৌ। বৃটিশ রেজিমেণ্টের বাসভবন রেসিডেন্সিতে এই বিদ্রোহের চিহ্ন এখনও বর্তামান।

শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এমনকি নবাবী আদব কায়দা ও সৌজন্যপূর্ণ কথোপকথনের জন্য লক্ষ্ণৌ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

যানবাহন ঃ—

লক্ষ্ণৌ—রেলপথে সারা ভারতের সঙ্গে যুক্ত। ইহা উত্তর রেলপথের মুঘলসরাই—সাহারাণপুর সেকশনের একটি বড় জংশন। এখানে ব্রডগেজ ও মীটারগেজ লাইন যুক্ত হয়েছে। দিল্লী থেকে কানপুর হয়ে সরাসরি লক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেস ট্রেনে এখানে আসা যায়। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকেও লক্ষ্ণৌ আসা যায়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে এলে আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট হয়ে আসাই স্থবিধাজনক। কলকাতা থেকে অমৃতসর মেল, দেরাদুন, পাঠানকোট ও লক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেসে সরাসরি লক্ষ্ণৌ যাওয়া যায়।

এ ছাড়া রাজ্য পরিবহন সংস্থা দূরপাল্লার বাস চালান। দিল্লী, বেরিলি, এলাহাবাদ, কানপুর, বারাণসী প্রভৃতি শহরের সঙ্গে বাসপথে সরাসরি যোগাযোগ আছে লক্ষ্ণৌর।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

বড় ইমামবাড়া

নবাবদের দুর্গের নিকট পুরাতন শহরে অবস্থিত ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় ইংরাজরা এটি ধ্বংস করে দেয়। নবাব আসফউদ্দৌলা ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেছিলেন। স্থাপত্য শিল্পের এটি ছিল এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানে নবাব আসফউদ্দৌলা ও তাঁর বেগমের কবর আছে।

ছোট ইমামবাড়া

হুসেনবাদ ইমামবাড়া নামেই এটি পরিচিত। এর গঠন-শিল্প স্থচারু। অভ্যন্তরের রূপসজ্জা দর্শনীয়।

পিকচার গ্যালারী.

এটি ছোট ইমামবাড়ার পাশেই অবস্থিত। লাল ইট দিয়ে পুরো বাড়ীটি নির্মিত। দোতলায় অযোধ্যার নবাবদের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রতিকৃতি আছে।

রেসিডেন্সি

অযোধ্যার রাজসভায় ইংরাজদের দূত এখানে থাকত। গোমতী নদীর

ধারে এটি অবস্থিত। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহীরা এই গৃহের উপর গুলি চালায় এবং বহু ইংরাজ হত্যা করে। এখনও প্রচুর গুলির চিহ্ন বর্তমান।

শহীদ মিনার

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকীতে নির্মিত এই মিনার দেশমাতৃকার স্বাধীনতার বীর শহীদদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

ছত্তর মনজিল

এই প্রাসাদটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় ঔষধ গবেষণাগারে রূপান্তরিত হয়েছে।

সিকান্দারবাগ

বর্তমান বোটানিক্যাল গার্ডেনরূপে পরিচিত।

বারাণসীবাগ

এটি চিড়িয়াখানা। এখানে বন্ধনমুক্ত হিংস্র জন্তুর দৃশ্য আকর্ষণীয়।

থাকবার স্থান :—

এখানে বহু সুদৃশ্য ও ভাল হোটেল আছে। এছাড়া মধ্যম আয়বিশিষ্ট লোকদের থাকবার ও খাবার অনেকগুলি হোটেলও আছে, যেখানে দৈনিক জনপ্রতি ১২—২০ টাকা লাগে। এই সব হোটেলের শুধুমাত্র ঘরভাড়াও পাওয়া যায়। এছাড়া (১) সরকারী গেস্ট হাউস আছে। যার ভাড়া দৈনিক ১২—১৫ টাকা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরও পাওয়া যায়। ভাড়া ৪০ টাকা। সংরক্ষণের জন্য Chief Secretary, Lucknow, U. P.—কে লিখতে হয়।

(২) সরকারী রেস্ট হাউসেও থাকার ব্যবস্থা আছে। Estate officer, Estate Dept. Lucknow-কে লিখতে হয়।

(৩) Canal Inspection Bungalow-তেও জায়গা আছে। আগে থেকে অনুমতি নিতে হয়—Chief Engineer, Lucknow Division-এর কাজ থেকে।

(৪) বনবিভাগের নিরীক্ষণ ভবনের (Forest Inspection Bungalow) অনুমতি নিতে হয়—Chief Conservator of Forest, Lucknow-এর কাছ থেকে।

এলাহাবাদ :—

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমে অবস্থিত। একদা উত্তর প্রদেশের রাজধানী ছিল এলাহাবাদ। এলাহাবাদের ইতিহাস প্রাচীন ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে

রচিত। এখানকার প্রয়াগে রাজা হর্ষবর্ধন সর্বস্ব দান করে পথের ভিখারীতে রূপান্তরিত হতেন। এখনও হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সঙ্গমে স্নান করে পুণ্য অর্জন করেন।

যানবাহন ঃ—

এলাহাবাদ, মোগলসরাই—দিল্লী প্রধান রেলপথের উপর অবস্থিত একটি জংশন। কলকাতা থেকে সরাসরি কালকা মেল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেস, তুফান, দিল্লী জনতা ও আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে এলাহাবাদ যাওয়া যায়। এলাহাবাদের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রদেশে যাবার সমস্ত রেলপথ গিয়েছে। এখান থেকে বারাণসী ও অন্যান্য জায়গায় যাওয়া যায়। বোম্বাই থেকে সরাসরি কলকাতা মেলে এলাহাবাদ আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে নাগপুর হয়েও এখানে আসা যায়। রাজ্য পরিবহন সংস্থা রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বাস চলাচলের ব্যবস্থা করেছে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

আনন্দ ভবন

নেহেরু পরিবারের বাসস্থান এই ভবনটি বহু রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী। এটি অবশ্য একটি দর্শনীয় স্থান।

দুর্গ

হিন্দুতীর্থ এলাহাবাদ মুঘলসম্রাট আকবরকেও আকর্ষণ করেছিল। যমুনার-তীরে সম্রাট একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, যা এখনও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রধান বিচারালয়

এখন যদিও উত্তর প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত হয়েছে তবু এখনও আয়ব্যয়ের কেন্দ্র ও যুক্তপ্রদেশ হাইকোর্ট এখানে অবস্থিত। এটির স্থাপত্যশিল্প দেখার মত।

খসরুবাগ

শহরের মধ্যে এই মুঘল উদ্যান এখনও জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। এখানে তিনটি সমাধি আছে। মধ্যেরটি জাহাঙ্গীর-পুত্র খসরুর, দুই পাশে খসরুর মা এবং বেগমের।

কৌশাম্বী

বুদ্ধের নামের সঙ্গে জড়িত কৌশাম্বী এলাহাবাদ থেকে মাত্র ৬০ কি. মি.

দূরে অবস্থিত। বুদ্ধ এখানে একাধিকবার আগমন করেন। উদয়ন-বাসবদত্তা কাহিনী রাজা উদয়ন যে বৎস রাজ্যে রাজত্ব করতেন, কৌশাম্বী ছিল তারই রাজধানী। এলাহাবাদ থেকে এখানে বাসে আসা যায়।

থাকবার স্থানঃ—

এলাহাবাদে প্রচুর সাধারণ হোটেল আছে। থাকা ও খাবার জন্য দৈনিক ২০ থেকে ২৫ টাকা লাগে। এছাড়া অনেকগুলি ধর্মশালা আছে, যেখানে থাকার ব্যবস্থা করা যায়। ওয়াই. এম. সি. এ-তেও থাকার জায়গা আছে সেক্রেটারী, সিবিল লাইনস্, এলাহাবাদকে স্থান সংরক্ষণের জন্য লিখতে হয়। পূর্তবিভাগের নিরীক্ষণ ভবনেও (P. W. D. Inspection Bungalow) থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে। প্রধান বাস্তকার, পূর্তবিভাগ, (Chief Engineer, P. W. D.) এলাহাবাদের নিকট অনুমতি পাওয়া যায়।

বারাণসী :—

পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীর ধরে বারাণসী বা কাশী শহর অবস্থিত। ১০৮টি ঘাট-এর সমষ্টি কাশী। এটিই শহরের প্রধান সৌন্দর্য। যে কেউ গঙ্গার বুকে নৌকো করে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ঘাটের শোভা দেখতে দেখতে যেতে পারেন। হিন্দুদের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কাশী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে তীর্থযাত্রীরা পূণ্যলাভের আশায় এখানে সমবেত হন।

যানবাহনঃ

মুঘলসরাই—লক্ষ্ণৌ সেকসনে বারাণসী শহরটি অবস্থিত। এখান থেকে মীটারগেজ গাড়ীতে বিহার এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়। সারনাথ ও এলাহাবাদ রেলপথে বারাণসীর সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা থেকে অমৃতসর মেল, দেরাদুন, পাঠানকোট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে সরাসরি বারাণসী আসা যায়। বোম্বাই থেকেও সরাসরি ট্রেনে বারাণসী আসা যায়। এছাড়া বাসপথে বারাণসী উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে যুক্ত।

দ্রষ্টব্য স্থানঃ

কাশী বিশ্বনাথ মন্দির

বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর মন্দির হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মন্দিরে যাবার

প্রধান পথ চক থেকে সরাসরি অথবা বিস্তৃত কচৌরী গলি দিয়ে। এ ছাড়া দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে সরু গলির ভেতর দিয়ে বিশ্বনাথ গলি হয়েও মন্দিরে পৌঁছান যায়। এখানে মন্দিরের পাণ্ডারা টাকার জন্য উৎপাত করে বটে কিন্তু অল্পেতে সন্তুষ্টও হয়। কাশীর গলিতে ছিনতাই ও পকেটমারের থেকে সাবধান থাকা দরকার। মুসলমান আক্রমণকারীর দ্বারা কাশীর প্রথম মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল বিশ্বনাথের মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্দু বিদ্বেষী আউরঙ্গজেব আবার মন্দিরটি ধ্বংস করে নির্মাণ করেন একটি মসজিদ। এরপর হোলকারের মহারাণী এই মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। কাশীতে দুর্গামন্দির ও তিলেভাণ্ডের অবশ্য দর্শনীয়।

বারাণসী শহরের বেনারসী শাড়ীর নাম জানেন না দেশী বা বিদেশী এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। মালাই ও প্যাড়া কাশীর প্রসিদ্ধ খাবার। ততোধিক প্রসিদ্ধ কাশীর ল্যাংড়া আম, যার নাম শুনলে অনেকেরই রসনা সিক্ত হয়।

শুধু তাই নয় হিন্দুস্থানী সংগীতেও কাশীর স্থান নগণ্য নয়। ঠুংরি গান, সানাই এবং তবলা বাদ্যের জন্যও কাশী বিখ্যাত। কাশী বর্তমানে সারা ভারতবর্ষের সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান। গৌতম বুদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার জন্য কাশী এসেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, নানক, রামানুজ প্রভৃতি বিভিন্ন মহামানব পুণ্যভূমি কাশীতে আগমন করেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক নির্মিত কাশী বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিক্ষার পীঠস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 'ভারত কলাভবন' ও 'গায়কোয়াড় লাইব্রেরী' সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিড়লারা বিশ্বনাথ মন্দিরের অনুকরণে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেছেন।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে অনেকগুলি সাধারণ হোটেল আছে। এসব হোটেলে থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা বেশ ভাল। জনপ্রতি দৈনিক থাকা ও খাবার জন্য লাগে ২০—২৫ টাকা। এছাড়া এখানে একাধিক ধর্মশালাও আছে। আর আছে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট অতিথিশালা।

সারনাথ ঃ—

কাশীর ৫ মাইল (৮ কি. মি.) উত্তরে সারনাথ অবস্থিত। গৌতম বুদ্ধত্ব

প্রাপ্ত হবার পর পঞ্চ শিষ্যকে এইস্থানে প্রথম বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। ৬ শতাব্দী থেকে ১২ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থান সারনাথ বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সারনাথ বেনারস থেকে ট্রেনে, বাসে, টাংগায় যাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

ধামেক স্তূপ

মাটির ওপর মাথা তুলে আছে এখনও ধামেক স্তূপ। কালের করাল স্পর্শ এখনও একে ভূলুণ্ঠিত করতে পারেনি। এর উচ্চতা প্রায় ১৫০ ফিট। অশোকের সময় নির্মিত এই স্তূপ বৌদ্ধধর্মের প্রচারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল। এখনও পালি ভাষায় অশোকের লিপি এর গায়ে উৎকীর্ণ আছে।

আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহার

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকবার গৃহ মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক বিহার এবং স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে।

চৌখণ্ডী মণ্ড

আটকোণা টাওয়ার নির্মিত এই মণ্ডটি দর্শকদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মণ্ডটি বর্তমানে ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। সম্রাট আকবর তাঁর পিতৃ-স্মৃতি হিসাবে এটি নির্মাণ করেন।

অশোক স্তূপ

ইষ্টক নির্মিত বৃহৎ স্তূপটি অশোকের নামের সঙ্গে জড়িত। সম্ভবতঃ সম্রাট অশোক এই স্থানটিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছিলেন, কারণ এখানে গৌতম বুদ্ধ প্রথম পঞ্চশিষ্যকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।

মূল গন্ধকুটি বিহার

প্রধান স্তূপের ধ্বংসাবশেষকে স্মরণ করে মহাবোধী সোসাইটি ১৯৩১ সালে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দির গাত্র জাপানী শিল্পীর দ্বারা সুন্দরভাবে চিত্রিত। চিত্রের অবলম্বন বুদ্ধের জীবনী।

এছাড়া সারনাথের প্রধান আকর্ষণ বর্তমানের Archaeological Museum, এখানে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত সমস্ত জিনিসই এই যাদুঘরে সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। এটি একটি অবশ্য অবশ্য দর্শনীয় স্থান।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে দ্বিপ্রহরে খাবার হোটেল আছে। ভাত তরকারী সবই পাওয়া যায়। তবে সারনাথে পৌঁছান মাত্রই আগে অর্ডার না দিলে পাওয়া মুস্কিল।

আগ্রা ঃ—

এই শহরটিকে জনসাধারণের গোচরে আনার সর্বাধিক কৃতিত্ব মোগল সম্রাটদের। সম্রাট আকবর এই স্থানটিকে রাজধানীর উপযুক্ত বিবেচনা করেন। কিন্তু পরে শাজাহান দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করায় আগ্রার গৌরব ম্লান হয়। তবে যতদিন তাজমহল থাকবে ততদিন আগ্রার আকর্ষণ বিশ্ববাসীর কাছে ম্লান হবে না। মুঘলদের পর ইংরাজরা আগ্রাকে তাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী করে। মুঘল যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের লীলাভূমি আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রি আজও দর্শকদের কাছে বিস্ময়। ভারতীয় ও পারসিক স্থাপত্যের এমন মিলন ভারতের আর কোথাও নেই।

যানবাহন ঃ—

আগ্রা, বোম্বাই-দিল্লী রেলপথের অন্যতম জংশন স্টেশন। এখান থেকে রাজস্থান ও মুঘলসরাই যাবার সরাসরি গাড়ী আছে। তাছাড়া আগ্রা, সরকারী পরিবহনের মাধ্যমে বহু স্থানের সঙ্গেই যুক্ত। দিল্লী থেকে 'তাজ এক্সপ্রেস' নামে একটি গাড়ী আছে, যা দিল্লী থেকে সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় আবার দিল্লী ফিরে আসে। কলকাতা থেকে আগ্রা রেলপথে সরাসরি যুক্ত। কলকাতা থেকে তুফান এক্সপ্রেস সরাসরি আগ্রা যায়। দিল্লী এক্সপ্রেস, জনতা এক্সপ্রেস, আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস, এয়ার কণ্ডিশন এক্সপ্রেস ও কালকা মেলে আগ্রা যেতে হলে তুণ্ডলা জংশনে গাড়ী বদল করতে হয়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

তাজমহল

আগ্রার সর্বপ্রধান আকর্ষণ তাজমহল। সকল ঋতুতেই তাজমহল অবিস্মরণীয়, তবে কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে যিনি একবার তাজমহল দেখেছেন

তিনি কখনও একে ভুলতে পারবেন না। সম্রাট শাজাহান তাঁর স্ত্রী মমতাজের সমাধির উপর এই বিশ্ববিখ্যাত মিনারটি নির্মাণ করেন। শ্বেত পাথরে নির্মিত এই সমাধি বিশ্বের বিস্ময়। তাজমহলের প্রধান গম্বুজটি বিশেষ ধরনের তৈরী। চত্বরে আটকোণা প্রধান ঘর। উপরের চত্বরের নীচে গেলে দেখতে পাওয়া যায় শাজাহান ও মমতাজের সমাধি। শ্বেতপাথরের জালি ও সূক্ষ্ম লতাপাতার কাজ সমাধির উপর শিল্প বৈভবকে শতগুণে বর্ধিত করেছে। তাদের প্রবেশ পথে যে হরফগুলি উৎকীর্ণ হয়ে আছে, তা এমন জ্যামিতিক কৌশলে রচিত যে উপরের হরফ ও নীচের হরফের আকারে দৃশ্যতঃ কোন তফাৎ বোঝা যায় না।

দুর্গ

যমুনার তীরে আগ্রার দুর্গ নির্মিত। এটি তাজমহল থেকে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দুর্গে সম্রাট শাজাহান তাঁর পুত্র আউরঙ্গজেব কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। দুর্গের একটি থামে বসান ছোট্ট দর্পণে সমগ্র তাজমহলের প্রতিচ্ছবি পড়ে। কথিত আছে এই দর্পণের মাধ্যমে বৃদ্ধ সম্রাট তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিমন্দিরের প্রতি তাকিয়ে দিনাতিপাত করতেন। দুর্গটি প্রথমে আকবর নির্মাণ করেন।

দেওয়ানী আম

সাধারণের সাক্ষাৎ-গৃহের নাম ছিল দেওয়ানী আম। এটি শাজাহান ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে তৈরী করেন।

দেওয়ানী খাস

ব্যক্তিগত লোকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এর সৃষ্টি। এটি মার্বেল পাথরে নির্মিত। এর সুদৃশ্য ঝরোখা ও লতার কাজ মনোমুগ্ধকর।

জাহাঙ্গীর মহল

আকবরের সৃষ্টি এই মহল হিন্দু ও মুসলমানী গঠনশৈলীর অপূর্ব সংমিশ্রণ।

মতি মসজিদ

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট মতি মসজিদ মুঘলদের এক অন্যতম শিল্প-কীর্তি। অলংকরণ ও গঠনশৈলীর দিক থেকে এর তুলনা নেই।

ইতমদ্দৌলা

এটি নূরজাহানের পিতার সমাধি ভবন। অনেক মূল্যবান পাথর ও মার্বেল পাথর দিয়ে এই সমাধিভবনটি তৈরী হয়।

সেকেন্দ্রা

'এই স্থানে মোগলের মুকুট রতন, শায়িত শান্তির মাঝে'—কবির এই উক্তি সার্থক। আগ্রা শহর থেকে ৫ মাইল দূরে সেকেন্দ্রা অবস্থিত। টাংগা, ট্যাক্সি এবং বাসে যাওয়া যায়। আগ্রা থেকে মথুরা যাবার মোটর-পথের উপর অবস্থিত। সম্রাট আকবরের সমাধিস্থান।

ফতেপুর সিক্রি

আকবরের মানসকন্যা ফতেপুর সিক্রি শহরটি পরবর্তী অধ্যায়ে পরিত্যক্ত হয় জলের অভাবে। আগ্রা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৩ মাইল (৩৭ কি. মি.) দূরে এই সুরম্য প্রাসাদটি অবস্থিত। যদিও পরিত্যক্ত রাজধানী কিন্তু এখনও লাল পাথরের নির্মিত এই প্রাসাদ তাজমহলের পরেই ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জুম্মা মসজিদ ও বুলন্দ দরওয়াজা প্রধান আকর্ষণ ফতেপুর সিক্রির।

সেলিম চিস্তির সমাধিও দেখবার মত।

এছাড়া দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, যোধবাঈ-এর প্রাসাদ, বীরবলের বাড়ী, পাঁচমহল প্রভৃতি প্রাসাদগুলি আজও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ফতেপুর সিক্রিতে থাকবার কোন ব্যবস্থা নেই কিন্তু আধঘণ্টা ছাড়া আগ্রা থেকে বাস যায় ফতেপুর সিক্রি। ট্যাক্সি এবং টাংগার অভাব নেই।

দয়ালবাগের মন্দির

আগ্রার সন্নিকটে এই নির্মীয়মান মন্দিরটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু বছর ধরে বহু ব্যয়ে শ্বেত পাথরে মন্দিরটি নির্মিত হচ্ছে। এর কারুকার্য অতুলনীয়।

থাকবার স্থান ঃ—

আগ্রায় কয়েকটি অত্যন্ত উঁচুমানের হোটেল আছে, যেগুলি স্বভাবতই বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য নির্মিত। মধ্যম আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এখানে প্রচুর হোটেল আছে। আগ্রায় হোটেল সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বেশীর ভাগ হোটেলেই থাকবার এবং খাবার সুবন্দোবস্ত আছে। এইসব হোটেলে দৈনিক জন প্রতি ২০—৩৫ টাকা পর্যন্ত খরচ লাগে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরও পাওয়া যায়; এর ভাড়া ৬০—৮০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া (১) সার্কিট হাউসে (Circuit House) থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে।

স্থান সংরক্ষণের জন্য : District Magistrate, Agra, U. P.-কে লিখতে হয়। (২) পূর্তবিভাগের নিরীক্ষণ ভবন-এ (Inspection Bungalow P. W. D.) থাকা ও খাবার সুবন্দোবস্ত আছে। Chief Engineer, (Roads and Buildings) আগ্রাকে লিখুন। (৩) ফতেপুর সিক্রি ও সেকেন্দ্রাতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বাংলো আছে। এখানে থাকবার অনুমতি Superintendent, Archaeological Dept., (Northern Circle) আগ্রার নিকট পাওয়া যায়।

মথুরা ও বৃন্দাবন :—

শ্রীকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বৃন্দাবন ও মথুরা। মথুরার কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। বাল্য ও কৈশোর কাটে বৃন্দাবনে। যমুনার তীরে বৃন্দাবনের দৃশ্য অপূর্ব। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন ও মথুরার মঠ মন্দির পথঘাট ভক্তদের কাছে পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। বৃন্দাবনের দিকে দিকে মন্দির আর মন্দিরের সমারোহ। কৃষ্ণের স্মৃতিচিহ্ন সর্বত্র ছড়ান। বৃন্দাবনের পথ-ঘাট-মাঠ, যমুনার তীর, কৃষ্ণলীলার স্মৃতি ভক্ত-হৃদয় অহরহ জাগিয়ে তোলে। গোবিন্দ দেবের মন্দিরটি অবশ্য দর্শনীয়। মথুরা পুরাণ ও ইতিহাসের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। মথুরা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বারকাধীশ মন্দিরটি বিশেষভাবে দর্শনীয়। নগর সীমান্তে গীতা মন্দিরটির অলংকরণ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। মথুরার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়ামটি অবশ্য দর্শনীয়।

যানবাহন :—

বৃন্দাবন মথুরা যাবার সহজ পথ আগ্রা থেকে রেলে *৩৫ মাইল (৫৬ কি. মি.) মাত্র। জাতীয় সড়ক দিল্লী-বোম্বাই-এর উপর অবস্থিত। মধ্য ভারত, বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতকে মথুরা যুক্ত করেছে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সঙ্গে। মথুরা বৃন্দাবন, কলকাতা থেকে সরাসরি তুফান এক্সপ্রেসে যাওয়া যায়। মথুরা থেকে বৃন্দাবনের দূরত্ব ৬ মাইল মাত্র। বাস যাতায়াত করে।

থাকবার স্থান :—

মথুরা ও বৃন্দাবনে থাকবার হোটেল অনেক আছে। ঘরভাড়া ১০ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত।

এছাড়া পি. ডব্লু. ডি.-এর নিরীক্ষণ ভবন (Inspection Bungalow), ক্যানাল নিরীক্ষণ ভবন, বনবিভাগ নিরীক্ষণ ভবন ও সাময়িক ইঞ্জিনিয়ারিং নিরীক্ষণ ভবন-এ থাকবার জায়গা আছে। রিজার্ভেসনের জন্য বিভাগীয় প্রধান (Departmental Head)-এর কাছে আগে মত নেওয়া দরকার।

অযোধ্যা :—

কাশী এবং লক্ষ্ণৌ-এর মধ্যে সরযুনদীর তীরে অযোধ্যা শহর অবস্থিত।

রামায়ণের পুণ্য অযোধ্যাভূমিরূপে এই স্থান ভারতীয়দের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। এখানে অনেকগুলি মন্দির আছে।

এছাড়া বৃটিশ আমলের আগে অযোধ্যার নবাবরা নামকরা শাসনকর্তা ছিলেন। ইংরাজ ও মুঘল সম্রাটদের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক ছিল। অবশেষে ইংরাজরা অযোধ্যা অধিকার করে।

যানবাহন :—

লক্ষ্ণৌ এবং বেনারস থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবহনে অযোধ্যা যাওয়া যায়। রেলপথেও বেনারস লক্ষ্ণৌ-এর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কলকাতা থেকে দেরাডুন এক্সপ্রেস ও পাঠানকোট এক্সপ্রেস অযোধ্যা হয়ে যায়।

থাকবার স্থান :—

এখানে কোন ভাল হোটেল নেই। তবে প্রচুর ধর্মশালা আছে, যেখানে থাকার জায়গা পাওয়া যায়।

নৈনীতাল :—

উত্তর প্রদেশ সরকারে গ্রীষ্মাবাস। চারদিকে পাহাড় ঘেরা নৈনীতাল শৈল-শহরটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয়। সাধারণতঃ মে-জুন এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর—এই কয় মাস ভ্রমণের পক্ষে উপযুক্ত সময়। শহরের চারিদিকে পাহাড়, তার মাঝখানে একটি লেক নৈনীতালের শোভাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

যানবাহন :—

নৈনীতাল যাবার সহজ উপায় কলকাতা থেকে ট্রেনে লক্ষ্ণৌ। সেখান থেকে মীটারগেজ গাড়ীতে করে কাঠগোদাম পর্যন্ত যেতে হয়। কলকাতা

থেকে সরাসরি কাঠগোদাম পর্যন্ত 3 tire-এ ঘুমানোর ব্যবস্থা করা যায়। সন্ধ্যায় গাড়ী ছাড়ে লক্ষ্ণৌ থেকে, ভোরে কাঠগোদাম। দিল্লী থেকে এসে বেরিলিতে গাড়ী পাল্‌টে মীটারগেজ ট্রেনে কাঠগোদাম যাওয়া যায়। বোম্বাই থেকে এলে মথুরায় গাড়ী পাল্‌টে মীটারগেজ ট্রেনে কাঠগোদাম আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে অনুরূপ ভাবে আসা যায়। কাঠগোদাম থেকে বাসে নৈনীতাল মাত্র ২২ মাইল (৩৫ কি. মি.)। রাজ্যসরকারের বাস সরাসরি কাঠগোদাম, বেরিলি থেকে নৈনীতাল পর্যন্ত যায়। সমুদ্রতট থেকে ৬৩৬০ ফুট উচ্চ। শীতবস্ত্রের প্রয়োজন।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

নৈনীতাল-এ দেখবার বস্তু লেক। দুপাশে শহর বিস্তৃত। লেকে নৌকা করে ঘুরে বেড়ান এক আকর্ষণীয় ব্যাপার। চায়না পাহাড়েও ওঠা যায়। এই পাহাড়ের উচ্চতা ৮৫°০০ ফিট্। ঘোড়ায় অথবা পদব্রজে এই পাহাড়ে উঠলে—যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহলে হিমালয়ের দূরবর্তী বরফমণ্ডিত পাহাড়ের চূড়াগুলি দেখা যায়। তাছাড়া চায়না পাহাড় থেকে নৈনীতাল লেক অতি সুন্দর দেখায়।

থাকবার স্থান ঃ—

নৈনীতালে আধুনিক রুচিসম্মত হোটেল প্রচুর আছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চ আয়বিশিষ্ট সকলের জন্য উপযুক্ত হোটেলের সংখ্যা যথেষ্ট। সাধারণতঃ ২০ থেকে ৪০ টাকা দিন প্রতি এক এক ব্যক্তির থাকা খাওয়ার জন্য লাগে।

এছাড়া Y. M. C. A এবং (২) Y. W. C. A-তেও থাকা যায়। পূর্বাহ্নে অনুমতি নিতে হয়, Secretary Nainital. নৈনীতাল ক্লাবে থাকবার জায়গা আছে। আদেশ নিতে হয়, Director, State Revenue U. P. Secretariate, Lucknow-এর কাছ থেকে।

রাণীক্ষেত ঃ—

শৈল শহরগুলির ভেতর অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী রাণীক্ষেত। হিমালয়ের দীর্ঘ তুষারশৈলের শোভা রাণীক্ষেতকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

যানবাহন ঃ—

কাঠগোদাম থেকে রাণীক্ষেত বাসে ৫২ মাইল (৮৪ কি. মি.)। কেউ ইচ্ছা করলে নৈনীতাল থেকে সরাসরি সরকারী বাসে রাণীক্ষেত যেতেও পারে। দূরত্ব ৩৭ মাইল। রাণীক্ষেত থেকে আলমোড়া পর্যন্ত সুন্দর বাস রাস্তা আছে। ২৯ মাইল দূরত্ব। রাণীক্ষেত যাওয়ার প্রকৃষ্ট সময় মার্চ থেকে জুন এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। শীতের পোশাক একান্ত প্রয়োজন। সমুদ্রতট থেকে উচ্চতা ৬০০০ ফুট।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

উপত এবং কালিকা

উপত-এ গলফ খেলবার মাঠ আছে। দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম। লোকাল বাসে যাওয়া যায়। কালিকাতে প্রসিদ্ধ কালীমন্দির আছে, অনেকের মতে ভীষণ জাগ্রত। রাণীক্ষেত থেকে দূরত্ব ৩১ মাইল।

চৌবাটিয়া

দূরত্ব ৬ মাইল। লোকাল বাসে যে কোন সময় যাওয়া যায়। এখানে সরকারী ফলের বাগান আছে।

থাকবার স্থান ঃ—

রাণীক্ষেতে নৈনীতালের মত প্রচুর হোটেল আছে। দৈনিক জলখাবার, খাওয়া ও থাকার জন্য ১২ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত লাগে।

এ ছাড়া (১) বনবিভাগ গৃহ (Forest Rest House) আছে ২ মাইল দূরে। আদেশ নিতে হয় conservator of Forests for Mount Circle, Nainital. (২) জিলা পরিষদ ডাকবাংলো ২ মাইল দূরে। আদেশ নিতে হয় সেক্রেটারী, জিলা পরিষদ, আলমোড়া, (৩) পূর্ত বিভাগ নিরীক্ষণ ভবন (P. W. D. Inspection Bungalow) ২ মাইল দূরে। আদেশ নিতে হয়, S. D. O., P. W. D. Ranikhet.

শীকারেচ্ছু ব্যক্তিরা জীম করবেটের ন্যাশনাল পার্ক-এ শিকার করবার জন্য যেতে পারেন। রাণীক্ষেত-রামনগর রাস্তায় ৬৯ মাইল দূরে এই বন্যজন্তুর আবাসস্থান। এখানে বাঘ, হাতি, চিতাবাঘ, হরিণ প্রভৃতি প্রাণী

দেখা যায়। এই পার্ক দেখার সময় ডিসেম্বর থেকে মে মাস। জুন থেকে নভেম্বর বন্ধ থাকে।

আলমোড়া ঃ—

আলমোড়া থেকে চিরতুষার হিমালয়ের দৃশ্য অতীব মনোরম। নন্দাঘুন্টী, নন্দাকোট, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, কামেট, নীলকান্ত, গৌরী পর্বত প্রভৃতি এখান থেকে দেখা যায়। আলমোড়া কুমায়ুনের জিলা সদর। এর উচ্চতা ৫৪০০ ফুট। গরম কাপড়ের প্রয়োজন সব সময়। মার্চ-জুন এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর ভ্রমণের প্রকৃষ্ট সময়।

যানবাহন ঃ—

আলমোড়া বাস পথে সরাসরি কাঠগোদাম, নৈনীতাল, রাণীক্ষেতের সঙ্গে যুক্ত। সরকারী বাস নিয়মিত যাতায়াত করে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

ব্রাইটন এণ্ড কর্ণার

এখান থেকে হিমালয়ের দৃশ্য অতীব মনোরম। বিশেষ করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখবার মত।

কালীমঠ

৩ মাইল দূর। পিকনিকের জায়গা। এখানে মাটির রঙ কালো তাই জায়গার নাম কালীমঠ।

কামারদেবী

কালীমঠ থেকে আধ মাইল দূরে কামারদেবীর পুরানো মন্দির। এখান থেকে পার্কের দৃশ্যসমূহ সুন্দর। এখানে দেবদারু গাছের সমারোহ দেখা যায়।

আলমোড়া থেকে কয়েকটি স্থানে যাওয়া যায়, যেখান থেকে তুষার ধবল হিমালয়ের শৃঙ্গগুলিকে তুলনাহীন মহিমায় বিরাজ করতে দেখা যায়।

কৌসানী

৬২০০ ফিট। আলমোড়া থেকে ৩২ মাইল। পরিষ্কার দিনে ২০০ মাইল পর্যন্ত চিরতুষার হিমালয়ের দৃশ্য এখান থেকে দেখা যায়। কৌসানীতে

আলমোড়া থেকে বাস যায়। এখানে থাকবার তিনটি জায়গা আছে। (১) পূর্ত বিভাগ নিরীক্ষণ ভবন, (P. W. D. Inspection)। (২) সরকারী বাংলো (Govt. Bungalow)। ছুটোর আদেশ পেতে গেলে লিখতে হয়—Executive Engineer. P. W. D. Almora. (৩) জিলা পরিষদ ডাকবাংলো। এখানে গেলে প্রায়ই থাকার জায়গা পাওয়া যায়। কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে নেওয়া দরকার। এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত বিশেষভাবে দর্শনীয়।

বিনসার

৭৯১৩ ফিট উচ্চ। আলমোড়া থেকে প্রায় ১৮ মাইল। ১৫ মাইল পথ নিয়মিত বাস যায়। বাকিটা জীপে যাওয়া যায়। ভগ্ন বীণেশ্বর শিব মন্দির ও শান্ত বৃক্ষশোভিত এই স্থানটি মনোরম। এখানে থাকবার ভাল ব্যবস্থা আছে।

বৈজনাথ মন্দির

৩৬৯৬ ফুট উচ্চ। কৌসানী থেকে ১২ মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। রাণীক্ষেত থেকেও সরাসরি এখানে বাসে যাওয়া যায়।

গোয়ালদান

আলমোড়া থেকে ৫৮ মাইল দূরে ৬৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানে হিমালয়ের দৃশ্য অতীব সুন্দর। রূপমতী রূপকুণ্ড যাবার পথ এখান থেকে।

পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার

নন্দাদেবী ও নন্দাকোট পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এই হিমবাহ। ১২০০০ থেকে ১৪০০০ হাজার ফিট পর্যন্ত এর উচ্চতা। এই হিমবাহটি দু'মাইল লম্বা। আলমোড়া থেকে কাপকোট পর্যন্ত কুমায়ুন মোটরস-এর বাস পাওয়া যায়। তারপর থেকে ঘোড়ায় অথবা পদব্রজে পিণ্ডারী যেতে হয়।

থাকবার স্থান ঃ—

আলমোড়াতে মধ্যম শ্রেণীর হোটেল আছে। থাকা ও খাবার জন্য ১২ টাকা থেকে ২৫ টাকা রোজ ব্যক্তি পিছু লাগে। এছাড়া (১) সার্কিট হাউস এবং

(২) জিলা পরিষদ ডাকবাংলাতেও থাকা যায়। প্রথমটির জন্য লিখতে হয়, Secretary, District Board. Almora. অথবা Deputy commissioner, Almora. দ্বিতীয়টির জন্য লিখতে হয়, S. D, O. Almora.

হরিদ্বার :—

ভগীরথ যখন গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্তে আনয়ন করেন তখন গঙ্গা প্রথম সমতলে নামেন এই হরিদ্বারে। হরিদ্বারে ১২ বছর অন্তর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

যানবাহন :—

হরিদ্বার—দিল্লি, কলকাতা, দেরাডুন ও লক্ষ্ণৌ-এর সঙ্গে সরাসরি ট্রেন দ্বারা যুক্ত। দিল্লি ও অমৃতসর থেকে মুসৌরী এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে ডুন এক্সপ্রেসে সরাসরি হরিদ্বার যাওয়া যায়। এখানে স্থানীয় যাতায়াতের জন্য সাইকেল রিক্সা ও টাংগাই প্রধান যানবাহন। বাস শহরের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে। উত্তর প্রদেশ সরকার ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য কনখল, লছমন ঝোলা, ভীমগোড়া ও হৃষিকেশের মধ্যে বাসের ব্যবস্থা করেছেন। হরিদ্বার দিল্লি থেকে সরাসরি বাসেও যাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

হরিদ্বার থেকে ৩ মাইল দূরে কনখল অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে এখানে দক্ষরাজার রাজধানী ছিল। এখানেই দক্ষরাজ যজ্ঞের সময় সতী অপমানিত হয়ে দেহত্যাগ করেন। শিব তাই যজ্ঞ পণ্ড করে দেন। দুঃখে ক্ষোভে এরপরই মহাদেবের প্রলয় নৃত্য শুরু হয়।

হরিদ্বার থেকে ১৪ মাইল দূরে হৃষিকেশ অবস্থিত। হৃষিকেশ থেকে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গংগোত্রী ও যমুনোত্রী যাবার পথের শুরু। হৃষিকেশে গীতাভবন ও লছমন ঝোলা প্রসিদ্ধ।

থাকবার স্থান :—

হরিদ্বারে হরকি প্যারীর পাশে শান্তিনিকেতন এবং স্টেশনের নিকট গুরুদেব হোটেল নামে দুটি হোটেল রয়েছে। বিশেষ করে শেষের হোটেলটিতে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরও পাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগ লোকই সাধারণ

কয়েকটি হোটেল, ধর্মশালায় অথবা ভাড়া করা ঘরে থাকেন। এমন কোন প্রদেশ নেই যার ধর্মশালা নেই এই হরিদ্বারে। এখানে সর্বত্রই নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা।

দেরাদুন :—

উত্তর ভারতের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেরাদুন। ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয়ের জন্য খ্যাত। এখান থেকে শৈলনগরী মুসৌরী যাবার পথ। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতেও দেরাদুন সমৃদ্ধ।

যানবাহন :—

দেরাদুন—(হরিদ্বার হয়ে) দিল্লী, অমৃতসর ও লক্ষ্ণৌ কলকাতার সঙ্গে রেলপথে যুক্ত। এছাড়া উত্তর প্রদেশ সরকারী বাসও নিয়মিত দেরাদুন দিল্লী ও দেরাদুন হৃষিকেশের মধ্যে চলাচল করে। শহরে রিক্সা, ট্যাক্সি পাওয়া যায়। সরকারী বাসে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখানোর বন্দোবস্থ আছে। মুসৌরী যাবার বাস ও ট্যাক্সি এই দেরাদুনেই পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

রায়পুর তপ্তকুণ্ড

দেরাদুন থেকে ৩ মাইল দূরে এই উষ্ণপ্রস্রবনগুলি অবস্থিত। এখানে চড়ুইভাতি করা যায়।

সহস্র ধারা

শহর থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে উষ্ণপ্রস্রবন এবং ঝর্ণা আছে। সুন্দর চড়ুইভাতির জায়গা।

ডাকাতে গুহা

সামরিক ছাউনি অঞ্চল। দেরাদুন থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে নদীর স্রোত হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে আবার কিছুদূরে গিয়ে উপরে উঠে এসেছে।

সামরিক বিদ্যালয়

দেরাদুন থেকে ৪ মাইল দূরে ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয় অবস্থিত। এই সামরিক বিদ্যালয় পৃথিবীর যে কোন বিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনীয়।

বন গবেষণা কেন্দ্র

ভারতীয় বনবিভাগের গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই কেন্দ্রটি

অবস্থিত। শহর থেকে ৩ মাইল দূরে এর অবস্থান। বাসে যাওয়া যায়। এখানে গেলে বৃক্ষ সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বহু বিষয় জানা যায়।

গান্ধী ময়দান

শহরের উপকণ্ঠে মুসৌরী যাবার পথে এই উদ্যানটি অবস্থিত।

থাকবার স্থান :—

দেরাদুনে ভাল ভাল হোটেল আছে, যেখানে থাকতে ২০ থেকে ৪০ টাকা দৈনিক লোকপিছু খরচ লাগে। এছাড়া Circuit House-এ থাকা যায়। District Magistrate, Dehra Dun কে লিখতে হয়। P. W. D. Inspection House-এ থাকতে গেলে লিখতে হয়, Executive Engineer, Dehra Dun.

চক্রতা :—

চক্রতা একটি সামরিক ছাউনি। মুসৌরী থেকে সিমলা যাবার পথে চক্রতা অবস্থিত। অক্টোবর মাসে এখান থেকে হিমালয়ের দৃশ্য অপূর্ব। এখানে থাকার কোন হোটেল নেই। দেরাদুন শহর থেকে উত্তর প্রদেশ সরকারের বাস নিয়মিত যাতায়াত করে।

(1) Forest Rest House-এ থাকতে হলে লিখতে হয়, Divitional Forest Officer, Chakrata. (2) District Board Dak Bungalowতে থাকতে হলে লিখতে হয় Executive Officer, Antarim Zila Parishad, Dehra Dun.

মুসৌরী :—

মুসৌরী নয়নাভিরাম স্বাস্থ্যকর শৈলনগরী।

যানবাহন :—

৬৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত মুসৌরী শহর দেরাদুন থেকে ২২ মাইল মাত্র। উত্তর প্রদেশ সরকারের আরামপ্রদ বাস দেরাদুন থেকে মুসৌরী নিয়মিত যাতায়াত করে। এছাড়া ট্যাক্সি করেও যাওয়া যায়। দিল্লী থেকে মুসৌরী সরাসরি বাস চলাচল করে।

দ্রষ্টব্য স্থান:—

গান হিল

এই পাহাড়ের উপর থেকে বন্দরপুঞ্চ ও বদ্রীনাথ পর্বতের দৃশ্য সুন্দরভাবে দেখা যায়। বর্তমানে এখানে রোপওয়ে নির্মিত হয়েছে। অতি অল্প খরচে আনন্দে দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে ভ্রমণ করা যায়।

লালটিব্বা

৮৫৬৯ ফুট উচ্চ। ঘোড়া এবং পদব্রজে যাওয়া যায়। এখান থেকে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, নন্দাদেবী ও বন্দরপুঞ্জ পর্বতের দৃশ্য অতি মনোহর।

কেম্‌টি ফল্‌স্

এই জলপ্রপাত মুসৌরীর মধ্যে সব থেকে বড়। তবে বর্ষার পর ছাড়া বেশী জল দেখতে পাওয়া যায় না। শহর থেকে দূরত্ব ৬ মাইল। পথ বিশেষ ভাল নয়।

মসী জলপ্রপাত

৩ মাইল দূর।

ভাট্টা জলপ্রপাত

৪ মাইল দূর। চড়ুইভাতির আদর্শ জায়গা।

থাকবার স্থান:—

মুসৌরীতে বহু ভাল ভাল হোটেল আছে, যেখানে থাকা ও খাবার ভাল বন্দোবস্ত আছে। ২৫ থেকে ৪০ টাকা দৈনিক মাথাপিছু খরচ পড়ে। এই শহর ভ্রমণকারীদের জন্য। তাই এখানে হোটেলের সংখ্যা প্রচুর।

কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ:—

দূর দুর্গম তীর্থভূমির প্রতি মানব মনের আকর্ষণ চিরদিনের। আবার সেই তীর্থ যদি হয় প্রকৃতির লীলাভূমির মধ্যে তাহলে তার আকর্ষণ হয় অপ্রতিরোধ্য। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ তীর্থ ভারতীয় হিন্দুর কাছে সেই মহিমামণ্ডিত। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ যাবার রাস্তার শুরু হৃষিকেশ থেকে। সাধু ও সন্তদের বাসস্থান। এই তীর্থ দেবতার আকর্ষণে প্রতি বছর হাজার

হাজার তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অশেষ কষ্ট সহ্য করে এখানে আসেন। বদ্রীনাথ, নারায়ণ পর্বত এবং অলকানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত।

কেদারনাথ যাওয়ার পথের নিশানা ঃ—

হৃষিকেশ থেকে বাসে দেবপ্রয়াগ ৪৪ মাইল। দেবপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ৪৪ মাইল। মোট ৮৮ মাইল। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গুপ্তকাশী ২৪ মাইল। গুপ্তকাশী থেকে শোন প্রয়াগ ১২ মাইল। এখান থেকে হাঁটাপথের শুরু।

মে মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এখানে যাওয়া যায়, তবে বর্ষাকালে না যাওয়াই ভাল। পথঘাট ভীষণ খারাপ থাকে। কেদারনাথ ১৪১ মাইল হৃষিকেশ থেকে। তার মধ্যে শোনপ্রয়াগ পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়। এখান থেকে গৌরীকুণ্ড ৬ মাইল। এই স্থানের উচ্চতা ৭০০০ ফুট। এখানে যেমন ঠাণ্ডা তেমনি আবার গৌরীকুণ্ড উষ্ণ প্রস্রবনের স্থান। সমস্ত দিনের পথের ক্লান্তি এখানে স্নানে দূর হয়ে যায়। গৌরী কুণ্ডর পাশ দিয়ে মন্দাকিনী বয়ে গেছে। গৌরী কুণ্ড থেকে কেদারনাথ ৯ মাইল এবং উচ্চতা ১১৭৫০ ফুট। পথে থাকবার জন্য সর্বত্র কালীকম্বলীর ধর্মশালা আছে। কেদারনাথে নেপাল সরকারের একটি অতিথিশালা আছে, সেখানে যাত্রীরা থাকতে পারেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং উচ্চতার জন্য শ্বাসকষ্ট হয়। হার্টের রোগীদের এখানে না যাওয়াই উচিত। কোরামিন সঙ্গে রাখা প্রয়োজন। কেদারে যেমন প্রচণ্ড শীত তেমন ধর্মশালা বা অতিথিশালায় লেপ পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণ। পথে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। এই হাঁটাপথের জন্য ডাণ্ডিও পাওয়া যায়। হাঁটাপথের জন্য মালপত্র কম নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাত্রীদের পথশ্রম কমতে পারে ঘোড়ার পিঠে গেলে।

ত্রিযুগী নারায়ণ

কথিত আছে মহাদেবের সঙ্গে গৌরীর বিবাহের সময় নারায়ণ সাক্ষী রেখে এখানে বিবাহ হয়। এখনও সেই যজ্ঞের শিখা নাকি প্রজ্জ্বলিত রাখা আছে। শোনপ্রয়াগ থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে ৮০০০ ফিট উচ্চে ত্রিযুগী নারায়ণ অবস্থিত। এখানে নারায়ণ এবং শিবের মন্দির আছে। এখানকার কালী কম্বলীর ধর্মশালাটি খুবই সুন্দর, তবে মাছির বড় বেশী উপদ্রব।

বদ্রীনাথ যাওয়ার পথের নিশানা ঃ—

বদ্রী ১০১৪৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত। দূরত্ব হৃষিকেশ থেকে ১৮৫ মাইল।

এখানে যাবারও প্রকৃষ্ট সময় মে থেকে নভেম্বর। এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শীতঋতুতে বিশেষ ব্যবস্থা না করে যাওয়া উচিত নয়। কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথ যাবার রাস্তা আছে। রুদ্র প্রয়াগ এই রাস্তার সংযোগস্থল। হৃষিকেশ থেকে রাজ্য সরকারের দৈনিক বাস সার্ভিস আছে।

যোশীমঠ ঃ—

হৃষিকেশ থেকে যোশীমঠ ১৫৭ মাইল এবং উচ্চতা ৬১৫০ ফুট। এখানে ২।৩ দিন থাকা উচিত, কারণ অনেক দ্রষ্টব্যস্থল আছে। এস্থান বদ্রীনাথের শীতাবাস। শংকরাচার্য হিন্দুদের জন্য মঠ নির্মাণ করেন এখানে।

থাকবার স্থান ঃ—

যোশীমঠে থাকবার বিশেষ সুবিধে আছে। নীলকান্ত হোটেলে বাথরুম সংলগ্ন ঘর পাওয়া যায় এবং ভাড়াও খুব একটা বেশী নয়। এছাড়া মন্দির কমিটির ধর্মশালা, বিড়লার ধর্মশালা, গুজরাটি ধর্মশালা প্রভৃতিতে থাকবার ব্যবস্থা করা যায়।

যদি কেউ নন্দনকানন এবং হেম কুণ্ড যেতে চায় তাহলে তাকে যোশীমঠ থেকে পারমিট নিতে হয়। যোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাট ৭ মাইল এবং এখান থেকে নন্দনকানন মাত্র ১২ মাইল। গোবিন্দ ঘাট থেকে সব পথটুকুই হেঁটে যেতে হয়। এখানে হেম কুণ্ড শিখদের প্রধান তীর্থস্থান। গুরু গোবিন্দ সিংহ এখানে নির্জনে তপস্যা করেছিলেন। এখানে একটি লেক আছে। গুরুদোয়ারা এবং একটি বিশ্রামাগারও আছে। গুরুদোয়ারাতে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা আছে। নন্দনকাননে যদি কেউ ফুলের সমারোহ দেখাতে চান তাহলে জুলাই মাসের শেষে এবং আগষ্ট এর ভেতর যেন আসেন।

যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথ ২৭ মাইল। পাণ্ডুকেশ্চর ও হনুমান চটির মধ্য দিয়ে পথ বদ্রীনাথ গিয়েছে। এই পথটি সামরিক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত। বদ্রীনাথের পাণ্ডারা অত্যন্ত ভদ্র এবং আতিথেয়তার অন্ত নেই। যথেষ্ট লেপ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও প্রচুর শীতবস্ত্র সঙ্গে রাখা উচিত।

কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথ যাবার পথ ঃ—

কেদার থেকে শোনপ্রয়াগ ১৫ মাইল। শোনপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ৩৬

মাইল। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পিপলকোট ৫০ মাইল। পিপলকোট থেকে যোশীমঠ ১৯ মাইল। যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথ ২৭ মাইল।

সাধারণতঃ কেদারনাথের দ্বার বদ্রীনাথের ১০ দিন আগে জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয়, তাই প্রথমে কেদারনাথ যাওয়াই প্রশস্ত।

অন্য পথ :—

ইচ্ছা করলে অপর দুটি পথেও কেদারবদ্রী যেতে পারা যায়। হরিদ্বারের কিছু আগে নাজিবাদ নামক একটি জংশন আছে। সেখান থেকে কোটদ্বার রেল স্টেশনে যাওয়া যায়। কোটদ্বার থেকে বাসে শ্রীনগর, রুদ্র প্রয়াগ হয়ে কেদারনাথ যাওয়া যায়। দূরত্ব ১৬৯ মাইল।

এছাড়া কাঠগোদাম ও রাণীক্ষেত থেকে কেদার এবং বদ্রীনাথ যাওয়া যায়। কাঠগোদাম থেকে রাণীক্ষেত ৫৯ মাইল। রাণীক্ষেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ ৮৫ মাইল। কর্ণপ্রয়াগ থেকে বদ্রীনাথ ৬৮ মাইল। আবার কর্ণপ্রয়াগ থেকে শোনপ্রয়াগ বাসে ৭১ মাইল। শোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ ১৫ মাইল পদব্রজে যেতে হয়।

গংগোত্রী-গোমুখ

১০৩০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই স্থানের সঙ্গে জড়িত আছে গঙ্গা ও দেবাদিদেব মহাদেবের পুণ্য কাহিনী। পুরাণে কথিত আছে সগর রাজার ৬০ হাজার সন্তানকে বাঁচাবার জন্য গঙ্গাকে মর্তে আনার প্রয়োজনে ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন। গংগোত্রী সেই জায়গা, যেখানে প্রথম মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গা নেমে আসেন। গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে এখানে।

গংগোত্রী যাবার পথের নিশানা :—

গংগোত্রী হৃষিকেশ থেকে ১৫৬ মাইল। প্রায় সমস্ত পথটিই বাসে যাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যে ১½ মাইল পদব্রজে অথবা ঘোড়ায় করে যেতে হয়। গংগোত্রী যাবার পথে হৃষিকেশ থেকে বাস উত্তরকাশী পর্যন্ত এসে শেষ হয়। গোমুখ অথবা গংগোত্রী যেতে গেলে এখানকার জেলা অধ্যক্ষের অনুমতি নিতে হয়। উত্তরকাশী থেকে আবার বাস পাওয়া যায় লংকা পর্যন্ত। এখান থেকে ১½ মাইল হেঁটে (১০০০ হাজার ফুট নীচে নেমে ৯০০ ফুট উপরে উঠতে হয়।) ভৈরবঘাটিতে পৌছান যায়। এখানে লংকা এবং ভৈরবঘাটির

মধ্যে সেতু নির্মাণের কাজ পুরোদমেই চলেছে। আশা করা যায় ২।৩ বছর পর গংগোত্রী আর হেঁটে যাবার প্রয়োজন হবে না। ভৈরবঘাটি থেকে আবার বাস পাওয়া যায়, যেটি সরাসরি মন্দিরের কাছ পর্যন্ত গেছে।

এখানে আসার সময় কেদার বদ্রীরই মত গরম পোশাকের প্রয়োজন। এখানেও কালীকম্বলীর একটি সুন্দর ধর্মশালা আছে। তাছাড়া আরও ২।১টি ধর্মশালা আছে। এখানে খাবারের বিশেষ অসুবিধে। বিশেষ করে বাঙালীদের। তাই প্রচুর পরিমাণে শুকনো খাবার বা টিনের খাবার সঙ্গে রাখা প্রয়োজন।

গংগোত্রী থেকে গোমুখ ১১½ মাইল। এর সবটাই পদব্রজে যেতে হয়। এমন কি ঘোড়াও পাওয়া যায় না। এই পথের নিশানা খুবই কষ্টসাধ্য, তাই যথাসম্ভব কম মালপত্র নিয়ে একটি উপযুক্ত গাইডের সাহায্যে যেতে হয়। গোমুখের উচ্চতা ১২৭৭০ ফুট। ভীরণ ঠাণ্ডা তাই প্রচুর পরিমাণে গরম-পোশাক ও কম্বল বা লেপ নিয়ে যাওয়া বিধেয়। গংগোত্রী নেকে একদিনে ভুজবাস পৌঁছান যায়, যার দূরত্ব ৯ মাইল। ক্রমাগত চড়াই-এ উঠতে হয় এবং পথও অতিশয় দুর্গম দুরূহ। এই অংশের পাহাড়ে প্রায় সারাক্ষণ ধ্বসে পড়ছে। উচ্চতার জন্য শরীরে দুর্বলতা অনুভূত হয়। খুব সুদৃঢ় শরীর না হলে গোমুখ না যাওয়াই উচিত। পথের পাশে কোন দোকান বা তৃষ্ণার জল পাওয়া যায় না। তাই গংগোত্রী থেকে সব কিছু নিয়ে এগোন উচিত। রাত্রিতে ভুজবাসে বিশ্রাম করতে হয়। এখানে লালবিহারী স্বামীর একটি মঠ আছে, সেখানে থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা আছে। ভুজবাস থেকে সকালে বেরিয়ে গোমুখ দেখে সন্ধ্যায় গংগোত্রী ফিরে আসা যায়। তবে সব সময় সঙ্গে খাবার রাখা একান্ত প্রয়োজন। সম্ভব হলে ফ্ল্যাস্কে করে চা অথবা কফি নেওয়া উচিত। তা না হলে ঐ ঠাণ্ডায় গোমুখ যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

যমুনোত্রী যাবার পথের নিশানা ঃ—

গংগোত্রী থেকে যমুনোত্রী যাবার পথ উত্তর কাশী—ধরাসু হয়ে। সানাচটি পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়। দূরত্ব ১৩৮ মাইল। সানাচটি থেকে হাঁটাপথ শুরু। কুলির সাহায্যে মালপত্র নিয়ে যেতে হয়। অপ্রয়োজনীয় মালপত্র সরকারী হেপাজতে রেখে যাওয়া যায়। পথে ২।৩ মাইল ছাড়াই চটি আছে, যেখানে রাত্রে থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক চটিতেই মুদির দোকানের সঙ্গে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া এমন কিছু বেশী নয়। খাবারও দোকানের

থেকেই পাওয়া যায়। এখানে ভাড়ায় লেপ তোষকও পাওয়া যায়। যমুনোত্রী যেতে খুব চড়াই আছে, যা অতিক্রম করতে বেশ কষ্ট হয়। তবে পথের কষ্ট লাঘব হয়ে যায় যমুনোত্রী পৌঁছালে। এখানে তিনটি উষ্ণ প্রস্রবন আছে। একটির তাপ এত বেশী যে এখানে কাপড়ে বেঁধে চাল ও আলু সেদ্ধ করার রীতি আছে এবং প্রসাদ হিসাবে সকলেই তা খায় ও সঙ্গে নিয়ে আসে। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত কম গরম, তাতে স্নান করতে খুবই আরাম। তৃতীয়টি আরও একটু কম গরম। এখানে খাবার জন্য পুরী এবং হালুয়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এমনকি চাও পাওয়া কষ্টসাধ্য। এখানে যমুনা ও গঙ্গা দুই বোনের মন্দির আছে। এর চার মাইল উত্তর থেকে যমুনার উৎপত্তি।

গংগোত্রী যমুনোত্রী, কেদারবদ্রী যাবার পথ সংকেত ঃ—

হৃষিকেশ—নরেন্দ্রনগর ১০ মাইল। নরেন্দ্রনগর—টিহরী ৪০ মাইল। টিহরী—ধরাস্থ ২৬ মাইল। ধরাস্থ—উত্তর কাশী ১৯ মাইল। উত্তর কাশী—লংকা ৫৪ মাইল। লংকা—ভৈরবঘাটা ১½ মাইল। ভৈরবঘাটা—গংগোত্রী ৫½ মাইল।

—গংগোত্রী—উত্তর কাশী ৬১ মাইল। উত্তরকাশী—ধরাস্থ ১০ মাইল। ধরাস্থ—কুতনৌর ৭২ মাইল। কুতনৌর—সামাচটি ৫ মাইল। সামাচটি——হনুমান চটি ৫ মাইল। হনুমান চটি—ফুলচটি ৩ মাইল। ফুলচটি—জানকী চটি ২ মাইল। জানকীচটি—যমুনোত্রী ৫ মাইল।

উত্তরকাশীর উত্তরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া বা ফটো তোলা নিবিদ্ধ। কুতনৌর থেকে বাসে মুসৌরী যাওয়া যায়। দূরত্ব ৫০ মাইল।

যাঁরা গংগোত্রী, যমুনোত্রী হয়ে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ যেতে চান তাঁদের উত্তরকাশী ধরাস্থ হয়ে টিহরী আসতে হয়। টিহরী থেকে শ্রীনগর বাস পাওয়া যায়। শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ যাওয়া যায়। উত্তর কাশী থেকে কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ যাবার সরাসরি বাস পাওয়া যায়।

বাসের ভাড়া প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটামুটি হৃষিকেশ থেকে যমুনোত্রী, গংগোত্রী, কেদার, বদ্রীনাথ গিয়ে হৃষিকেশ ফিরে আসা পর্যন্ত একজনের বাসভাড়া লাগে নিম্নশ্রেণীতে মোটামুটি ১০০ টাকার মত এবং উচ্চ শ্রেণীতে লাগে প্রায় দেড়গুণ।

এই কয়টি তীর্থস্থানে যেতে হলে কি কি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে :—

(১) কলেরার টিকা নেওয়ার সার্টিফিকেট। (কোন ডাক্তারী সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হয় না।) মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অথবা কর্পোরেশনের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আলাদা সার্টিফিকেট প্রয়োজন। (২) বর্ষাতি অথবা ছাতা। (৩) টর্চ লাইট। মোমবাতি ও দেশলাই। (৪) ছড়ি (পাহাড়ে ওঠার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত)। (৫) ঔষধ। (৬) রৌদ্রের চশমা। (৭) হকি স্যু অথবা কেডস। (৮) টিনের খাবার এবং শুকনো খাবার। (০) ফুটানো ছাড়া জল না খাওয়া। (১০) বিছানা বাঁধার জন্য Plastic-এর চাদর। (১১) পর্যাপ্ত গরম পোশাক, লেপ বা কম্বল।

॥ মধ্য প্রদেশ ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

মধ্যপ্রদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ রাজ্য। এ রাজ্যে বহু রাজন্যবর্গের বাস ছিল স্বাধীনতার আগে। বর্তমানে সব রাজ্যই ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত। গ্রেট বৃটেন এবং জাপানের থেকে আয়তনে বড় মধ্য প্রদেশ ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই রাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনেক। সম্রাট অশোক, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্রাটরা, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। মারাঠাদের উত্থানের আগে পর্যন্ত এখানে মুঘলদের কর্তৃত্ব ছিল। শিবাজী মধ্যভারত দখল করেছিলেন। অবশেষে ইংরেজ কর্তৃত্ব ১৯৪৭ পর্যন্ত এখানে বজায় ছিল। এর উত্তরে রাজস্থান, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, পূর্বে উত্তর প্রদেশ পশ্চিমে গুজরাট অবস্থিত। দর্শনীয় বহুস্থান মধ্যপ্রদেশকে মহিমামণ্ডিত করেছে।

জব্বলপুর :—

মধ্যপ্রদেশের একটি দর্শনী শহর।

যানবাহন :—

এলাহাবাদ থেকে ৩৭০ কি. মি. দূরে পশ্চিম রেলের খাণ্ডোয়া এবং এলাহাবাদ লাইনে অবস্থিত। এছাড়া মধ্য প্রদেশ সরকারের বাস জব্বলপুরকে এলাহাবাদ, নাগপুর, ইন্দোর, খাজুরাহো প্রভৃতি বড় বড় স্থানের সঙ্গে যুক্ত করেছে। শহরে সাইকেল রিক্সা ও ট্যাক্সি প্রচুর পাওয়া যায়। ভাড়া এমন কিছু একটা বেশী নয়। এখানে গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম এবং শীতে প্রচণ্ড শীত। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত যাওয়াই প্রশস্ত। শীতকালে প্রচুর শীতবস্ত্র নেওয়া উচিত।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

ভেরাঘাট

জব্বলপুরের সব থেকে সেরা দ্রষ্টব্য বস্তু হচ্ছে মার্বেল পাহাড়। শহর থেকে

১৩ মাইল দূরে অবস্থিত এ মার্বেল পাহাড় দর্শকদের মুগ্ধ করে। নিয়মিত বাস এবং ট্যাক্সি দুই-ই পাওয়া যায়। মার্বেল পাহাড় দেখতে হলে নৌকো করে নর্মদা নদীর মধ্য দিয়ে ২ মাইল যেতে হয়। পূর্ণিমা রাতে এর দৃশ্য মনোরম।

মদন মহল

গোণ্ড রাজাদের এখানে একটি সুন্দর দুর্গ আছে। এর ছাদ থেকে জব্বলপুর শহরের দৃশ্য সুন্দর।

চৌষট্‌ যোগিনী মন্দির

দেবী দুর্গার সহচরীদের ৮১টি মূর্তি আছে এখানে। দেখতে হলে সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের উপর উঠতে হয়। এই সমস্ত মূর্তিই ১০ম শতকের আগে নির্মিত হয়।

জলপ্রপাত

নর্মদার তীর থেকে ১ মাইল দূরে নর্মদার উপর অবস্থিত জব্বলপুরের সমধিক প্রসিদ্ধ এই জলপ্রপাত। এর দৃশ্য অতীব সুন্দর।

থাকবার স্থান ঃ—

জব্বলপুরে থাকার অনেক হোটেল আছে। এখানে থাকার এবং খাবার জন্য ২৫—৪০ টাকা মাথাপিছু দৈনিক লাগে। এছাড়া Y. M. C. A-তেও থাকা যায়। (Secretary, Y. M. C, A. Jabbalpur. M. P.)-এর কাছে আগে থেকে লিখে অনুমতি নিতে হয়। এছাড়া সারকিট হাউস ও রেস্টহাউস আছে। আদেশ নিতে হয় Executive Engineer, Jabbalpur Division Jabbalpur.

কান্‌হা জাতীয় পার্ক

জব্বলপুর থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই রক্ষিত বনে বাঘ, সম্বর, হরিণ, বাইসন ইত্যাদি জন্তু দেখতে পাওয়া যায়।

পাঁচমারী ঃ—

চির সবুজ সাতপুরা পাহাড়ে অবস্থিত পাঁচমারী মধ্য প্রদেশের একমাত্র হিল স্টেশন। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা মাত্র ৩৫০০ ফিট। পাঁচমারী যাবার নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন পিপারিয়া। ইটারসি—জব্বলপুর সেক্সনে পড়ে। পিপারিয়া দিল্লী থেকে ৫৬৭ এবং বোম্বে থেকে ৫৩৭ মাইল। দিল্লী

ও বোম্বাই উভয় জায়গা থেকেই সরাসরি গাড়ী আছে। কলকাতা থেকে যাবার একমাত্র গাড়ী হাওড়া—বোম্বাই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)। এ ছাড়া হাওড়া—নাগপুর লাইনের বিলাসপুরে নেমেও পিপারিয়া যাওয়া যায়। পিপারিয়া থেকে থেকে পাঁচমারী ৩২ মাইল। সুন্দর পিচের রাস্তা আছে। বাস এবং ট্যাক্সি পাওয়া যায়। মহাভারতে কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডব এখানে ১২ বছর অজ্ঞাত বাসের কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। পঞ্চমণ্ডি বা পাঁচটি গুহা এখনও বর্তমান। এখানে বর্ষাকাল জুন—সেপ্টেম্বর। এই কটি মাস ছাড়া বছরের সব সময়েই যাওয়া যায়। শীতকালেও বেশী ঠাণ্ডা নয়।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে থাকার খুব বেশী হোটেল না থাকলেও সার্কিট হাউস এবং ডাক-বাংলোতে থাকা যায়। পূর্বেই এস. ডি. ও. পাঁচমারীর নিকট থেকে লিখিত মতামত লাগে। এছাড়া আসবাবসহ বাংলো ভাড়া পাওয়া যায়। অনুমতির জন্য সেক্রেটরী, টুরিস্ট ট্রাফিক এডভাইসারী কমিটি, পাঁচমারীকে লিখতে হয়।

খাজুরাহো ঃ—

মধ্যযুগীয় স্থাপত্য ও কৃষ্টির বিপণি খাজুরাহো মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। খাজুরাহো যাবার সব থেকে সুবিধাজনক পথ সাতনা। সাতনা জব্বলপুর ও এলাহাবাদের মধ্যে অবস্থিত একটি স্টেশন। কলকাতা থেকে গেলে, বোম্বাই মেলে (ভায়া এলাহাবাদ) সাতনা স্টেশনে নামা যায়। এখান থেকে খুব ভোরে বাস ছাড়ে। ৭২ মাইল দূরে খাজুরাহোতে নিয়ে যায়। কেউ ইচ্ছা করলে একই দিনে ঐ বাসে সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় সাতনা শহরে ফিরে আসতে পারেন। এখানে থাকার হোটেল আছে। দিল্লী থেকে এলে দিল্লী—বোম্বাই রুটে ঝাঁসী স্টেশনে নামতে হয়। ঝাঁসী স্টেশন থেকে হরপালপুর ট্রেন আছে। ৫৩ মাইল দূর। এখান থেকে বাস এবং ট্যাক্সিতে খাজুরাহো যাওয়া যায়। এ ছাড়া ঝাঁসী—মানিকপুর লাইনের মাহোবা স্টেশনে দূরত্ব ৬০ মাইল। এ ছাড়া ঝাঁসী—মানিকপুর লাইনের মাহোবা স্টেশনে নেমেও বাসে ৪০ মাইল খাজুরাহো। তাছাড়া কানপুর ও খাজুরাহোর মধ্যে বাস সার্ভিস আছে।

খাজুরাহো আজ পরিত্যক্ত গ্রাম, কিন্তু খাজুরাহো বন্দেলা রাজাদের সময় রাজধানী ছিল। এঁরা ৯—১৩ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এখানকার

৮৫-টি নির্মিত মন্দিরের মধ্যে ২২-টি বর্তমান। মন্দিরগুলির গঠন সৌষ্ঠব ও ভাস্কর্য মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে হয়!

থাকবার স্থান ঃ—

খাজুরাহোতে থাকবার জন্য সার্কিট হাউস এবং টুরিস্ট লজ তৈরী হয়েছে। এখানে থাকার এবং খাবার ব্যবস্থা আছে। আগে আদেশ নিতে হয়—টুরিস্ট অফিসার, খাজুরাহো, এম. পি। অথবা কালেক্টার, ছত্তরপুর, এম. পি।

গোয়ালিয়র ঃ—

গোয়ালিয়র একদা সিন্ধিয়ার রাজধানী এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের পীঠস্থান ছিল। গোয়ালিয়র দিল্লী-বোম্বাই রুটের একটি বড় স্টেশন। বাস অথবা ট্রেনে যাওয়া যায় দিল্লী থেকে। কলকাতা থেকে গেলে আগ্রা ও ঝাঁসী হয়ে গোয়ালিয়র যাওয়া যায়। আগ্রা থেকে গোয়ালিয়র বাস যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

দুর্গ

দুর্গটি শহরের থেকে ৩০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এটিই পুরানো শহরের সব থেকে বৃহৎ দ্রষ্টব্য। উত্তর ভারতের ইতিহাসে এই দুর্গটির স্থান অতি উচ্চে। দুর্গে ঢুকতে গেলে ৫টি গেট পেরোতে হয়। আলমগিরি গেট (অউরঙ্গজেবের নামে), বাদল মহল অথবা হিন্দোলা গেট, গুহারী মহল ইত্যাদি। এই গুহারী মহল বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। হস্তি গেটের মধ্য দিয়ে গেলে মানমন্দির প্রাসাদে পৌঁছান যায়। এটি মহারাজা মানসিং নির্মাণ করেছিলেন।

এছাড়া দুর্গের বাইরে শহরের পূর্বদিকে মিয়া তানসেন ও মহম্মদ গৌসের সমাধি আছে। এখানে জলবিলাস ও মতিমহল নামে দুটি প্রাচীন প্রাসাদ আছে।

থাকবার স্থান ঃ—

গোয়ালিয়রে কয়েকটি সাধারণ হোটেল আছে। এছাড়া সার্কিট হাউস এবং ডাকবাংলোও আছে। আদেশ নিতে হয়, যথাক্রমে Superintending Engineer, P. W. D. Mati Mahal, Gwalior এবং Asst, Engineer P. W. D. Dak Bungalow, Gwalior.

শিবপুরী ঃ—

গোয়ালিয়র থেকে রেলে এবং বাসে ৭৩ মাইল দূরে এই শহর অবস্থিত। গোয়ালিয়র মহারাজার গ্রীষ্মাবাস ছিল। এখানে মহারাজা মাধব রাও-এর সমাধি আছে। সমাধির চারপাশে মুঘল উদ্যান আছে। সার্কিট হাউসের সামনে একটি স্থান আছে যেখানে তাঁতিয়া টোপীকে ইংরাজরা ফাঁসি দিয়েছিল।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে সাধারণ কয়েকটি হোটেল আছে। এছাড়া সার্কিট হাউস ও ডাকবাংলোতে থাকা যায়—আদেশ নিতে হয়, কালেক্টার, শিবপুরী।

ভূপাল ঃ—

মধ্যপ্রদেশ সরকারের রাজধানী। ইহা ২½ মাইল বিস্তৃত একটি লেকের পারে অবস্থিত।

যানবাহন ঃ—

ভূপাল, দিল্লী—বোম্বাই—মাদ্রাজ রুটের উপর অবস্থিত রেল স্টেশন। মাণ্ডু, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, জব্বলপুর, সাঁচী, বিদিশা, খাজুরাহো এবং গোয়ালিয়রের সঙ্গে ভূপালের নিয়মিত বাস যোগাযোগ আছে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

সর্দার মঞ্জিল প্রাসাদ

প্রাচীন ভূপালের রাজ-দরবার ছিল।

বল্লভ ভবন

বর্তমান ভূপাল-রাজধানীর সেক্রেটারিয়েট ভবন।

জামা মসজিদ

১৮৩৭ সালে নির্মিত এই মসজিদটি দর্শনীয়।

মতি মসজিদ

দিল্লীর জুম্মা মসজিদের অনুকরণে তৈরী।

লেক

ভূপালে দুটি লেক আছে। উচ্চ এবং নিম্ন এই দুই ভাগে বিভক্ত। নৌকো পাওয়া যায় ঘুরবার জন্য। সন্ধ্যায় এই লেক অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করে।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে থাকবার ভাল ভাল হোটেল আছে। সাধারণতঃ জনপ্রতি ১ দিনের থাকা খাওয়ার জন্য ২৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত লাগে। এছাড়া সার্কিট হাউস আছে। আদেশ নিতে হয়—Hospitality officer, Ballav Bhaban, Bhupal. এম, এল, এ হোস্টেলেও থাকা যায়। অনুমতি আগের অফিসারের কাছে পাওয়া যায়। এছাড়া বহু ধর্মশালাও আছে, যেখানে বিনা পয়সায় থাকা যায়।

সাঁচী ঃ –

অশোকের নামের সঙ্গে সাঁচীর নাম জড়িত। সাঁচীর স্তূপের কথা জানে না এমন ভারতীয় খুব কমই আছে।

যানবাহন ঃ—

সাঁচী, দিল্লী-বোম্বাই-ও মাদ্রাজ লাইনের উপর অবস্থিত। কলকাতা থেকে বোম্বাই মেলে ইটারসী জংশনে গাড়ী বদল করে ভূপাল হয়ে সহজেই সাঁচী যাওয়া যায়। ভূপাল থেকে ৪২ মাইল। রাজ্য সরকারের বাস নিয়মিত সাঁচী, ভূপাল ও বিদিশার মধ্যে যাতায়াত করে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

অশোকের পিলার

বর্তমানের স্তম্ভটি আগের খণ্ডিত অংশ। এই স্তম্ভের উপরের সিংহটি ভারত সরকারের প্রতীক।

বৃহৎ পাত্র

পাথরের তৈরী এই বৃহৎ পাত্রটিতে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য সংগ্রহ করে ভিক্ষুকদের দান করা হত।

স্তূপ

বৌদ্ধধর্ম প্রচারক এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের নিদর্শন।

পাথরের অলিন্দ

স্তূপের চারদিকে এই অলিন্দ তৈরী। বিভিন্ন ব্যক্তি, যাঁরা দান করেছেন তাঁদের নাম উৎকীর্ণ আছে।

বিদিশা

মাত্র ৬ মাইল দূরে এই শহর অবস্থিত। অশোকের পর যখন মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে তখন বিদিশাকে রাজধানী করে সুঙ্গরা রাজত্ব শুরু করে।

থাকবার স্থান ঃ—

সাঁচীতে কোন হোটেল নেই। তবে ভ্রমণকারীদের জন্য Travellers' Lodge আছে। জনপ্রতি প্রায় ২০ টাকা লাগে, থাকা এবং প্রাতরাশের জন্য। ম্যানেজারের কাছে আবেদন করতে হয়। এছাড়া সার্কিট হাউসে থাকা যায়। এর জন্য কালেক্টার, রাইসেন, এম, পি-কে লিখতে হয়। বৌদ্ধ গেস্ট হাউস আছে। অনুমতি নিতে হয় ভিক্ষু অধিকর্তা, মহাবোধী সোসাইটি, সাঁচী।

উজ্জায়নী ঃ

শিপ্রা নদীর তীরে কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের নামের সঙ্গে জড়িত উজ্জয়িনী বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে ১২ বছর অন্তর কুম্ভমেলা হয়।

যানবাহন ঃ—

ভূপাল থেকে ১১৫ মাইল দূরে পশ্চিম রেলওয়ের একটি স্টেশন।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ

যন্তর মন্তর

মহারাজা জয়সিংহ নির্মিত এই মানমন্দিরটি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শিপ্রাঘাট ও ত্রিবেণী

এখানে স্নানে প্রভূত পুণ্য হয় বলে সাধারণের ধারণা।

মহাকাল মন্দির

বহু প্রাচীন শিব মন্দির।

থাকবার স্থান :—

এখানে থাকার হোটেল আছে। ২০ থেকে ৩০ টাকা জন প্রতি দৈনিক খরচ লাগে।

এছাড়া সার্কিট হাউসে থাকতে হলে—কালেক্টর, উজ্জয়িনী-র নিকট লিখতে হয়। P. W. D. Dak Bungalow-তে থাকতে হলে Executive Engineer উজ্জয়িনীকে লিখতে হয়। এছাড়া একাধিক ধর্মশালা আছে, যেথানে থাকবার ব্যবস্থা আছে।

ইন্দোর :—

হোলকারদের রাজধানী ছিল ইন্দোর। সরস্বতী নদীর তীরে ইন্দোর অবস্থিত। সিপাহী বিদ্রোহে ইন্দোরের স্থান ছিল উচ্চে।

যানবাহন :

ইন্দোর পশ্চিম রেলের খাণ্ডোয়া জংশন থেকে ৮৬ মাইল দূরে। কলকাতা থেকে বোম্বে মেলে খাণ্ডোয়া জংশনে গাড়ী বদল করে যাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশ সরকারী বাস ইন্দোরকে গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, বিদিশা, সাঁচী, মাণ্ডু, বাঘগুহা এবং ভূপালের সঙ্গে যুক্ত করেছে। একদিন ছাড়া ইন্দোর থেকে আহমেদাবাদ বাস যায়। একদিন ছাড়া বাস বোম্বেও যায়। এছাড়া ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। ইন্দোর থেকে মাণ্ডু পর্যন্ত পর্যটন বিভাগের গাড়ীর বন্দোবস্ত আছে। শনিবার ও রবিবার এই বাস যায়। বাস সকাল ১০-৩০ যায় এবং বিকালে ফেরে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

ছত্র বাগ

হোলকার রাজাদের এখানে সমাধি আছে। মাধব রাও হোলকারের সমাধিটি অতীব মনোরম।

কাঁচি মন্দির

এই মন্দিরে দিগম্বর জৈনের মূর্তি আছে। মন্দিরটি প্রচুর মণিমুক্তা ও কাঁচ দিয়ে অলংকৃত।

বড় গণপতি

এখানে একটি বৃহৎ গণেশের মূর্তি আছে।

থাকবার স্থান :—

ইন্দোরে থাকবার অনেকগুলি হোটেল আছে। এছাড়া সার্কিট হাউসে থাকার জন্য কমিশনার, ইন্দোর ডিভিসনকে লিখতে হয়। ধর্মশালাও অনেক আছে।

বাঘ গুহা :—

অজন্তা, ইলোরার মত বাঘ গুহাও পাথরে খোদিত এবং বৌদ্ধ নির্মাণ-রীতির অনুরূপ। ৯টি গুহা ছিল কিন্তু কালের করাল গ্রাসে এখন মাত্র ৫টি বর্তমান। ইন্দোর রেল স্টেশনটি বাঘ গুহায় যাওয়ার পক্ষে অনুকূল। এখান থেকে বাসে প্রায় ১০০ মাইল যেতে হয়। নিয়মিত বাস উজ্জয়িনী, ধর, ইন্দোর এবং বাঘের মধ্যে চলাচল করে।

থাকবার স্থান :—

এখানে থাকবার তেমন কোন হোটেল নেই। একটি জৈন ধর্মশালা আছে। পূর্ত বিভাগের বাংলোর জন্য, Assistant Engineer. P. W. D. (Bridge & Road) Sarderpur. Dist. Dhar.—এর অনুমতি নিতে হয়।

মাণ্ডু :—

বিন্ধ্য উপত্যকায় মাণ্ডু একটি অত্যন্ত সুন্দর শহর। চারিদিকে পাহাড় এবং পাহাড়ী-নদীতে ঘেরা এই শহরটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যানবাহন :—

মাণ্ডু যাবার রেলপথ তিনটি। রটলম থেকে ৬২ মাইল, ইন্দোর থেকে ৬২ মাইল এবং মৌ থেকে ৪০ মাইল। এছাড়া নিয়মিত বাস মাণ্ডু থেকে উজ্জয়িনী, ধর, ইন্দোর, আহমেদাবাদ, ভূপাল, মৌ-এর মধ্যে চলাচল করে। এছাড়া মধ্য প্রদেশ সরকারের পর্যটন বিভাগ শনিবার ও রবিবার ইন্দোর থেকে বাসের ব্যবস্থা করেন। সকাল ১০-৩০ টায় ইন্দোর থেকে বাস ছাড়ে এবং সন্ধ্যা ৭টায় ফিরে আসে। জনপ্রতি ভাড়া ১২ টাকা।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

বাজ বাহাদুরের প্রাসাদ

সুন্দরী রূপমতীর সঙ্গে মাণ্ডুরাজ বাজবাহাদুরের প্রণয় একটি উপভোগ্য কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি সেই বাজবাহাদুরেরই দর্শনীয় প্রাসাদ।

রূপমতী প্যাভিলিয়ন

সুন্দরী রাজনর্তকী রূপমতীর প্রমোদ নিকেতন।

জাহাজ মহল

দুটি হ্রদের মধ্যে অবস্থিত এই প্রাসাদটি জাহাজের মত মনে হয়। এর গঠন শৈলী মনোরম।

হোসাঙ শাহের সমাধি

এই সমাধি মন্দিরটি পাঠান স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

নীলাকান্তেশ্বর

এই শিব মন্দিরটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখান থেকে সমস্ত মাণ্ডু শহরটি অতি সুন্দর দেখায়।

জুম্মা মসজিদ

দামাস্কাসের বৃহৎ মসজিদের অনুকরণে আফগান শিল্পের নিদর্শন এই জুম্মা মসজিদ।

হিন্দোলা মহল

এটি সাধারণের সঙ্গে রাজাদের সাক্ষাৎকারের জন্য তৈরী হয়েছিল।

থাকবার স্থান ঃ—

মাণ্ডুতে থাকবার কোন হোটেল নেই। মধ্যপ্রদেশ সরকারের পর্যটন বাংলো আছে। এক একজনের থাকার জন্য ১'৫০ করে লাগে। সঙ্গে খাবার ব্যবস্থাও আছে, তার জন্য আলাদা খরচ লাগে। থাকার জন্য Executive Engineer, P. W. D. Dhar. M. P.-এর কাছে আবেদন করতে হয়। এছাড়া একটি ধর্মশালাও আছে।

॥ উড়িষ্যা ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

উড়িষ্যার উত্তরে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে অন্ধ্র প্রদেশ ও বঙ্গোপসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ।

সমুদ্র ও মন্দিরের দেশ উড়িষ্যা। সমুদ্রবিলাসীরা উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে অবসর বিনোদনের জন্য সমবেত হন। অন্যদিকে উড়িষ্যার সুপ্রাচীন মন্দির-গাত্রে খোদিত মূর্তিগুলি দর্শকদের বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ, কোণারকের সূর্যমন্দির বিশ্ববিশ্রুত।

ভুবনেশ্বর :—

উড়িষ্যার নতুন রাজধানী ও শিল্পশহর। পূর্বের রাজধানী ছিল কটক। ভুবনেশ্বর, কলকাতা—মাদ্রাজ রুটের একটি বড় স্টেশন।

যানবাহন :—

পুরী এক্সপ্রেস, মাদ্রাজ মেল, হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ও জনতা এক্সপ্রেসে ভুবনেশ্বর যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২৫০ মাইল। দিল্লী অথবা বোম্বাই থেকে ভুবনেশ্বরে আসতে হলে খড়্গপুর হয়ে আসতে হয়। শহরে বাস এবং ট্যাক্সি পাওয়া যায়। এছাড়া উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের বাস নিয়মিত ভুবনেশ্বরকে পুরী, চিল্কা, কটক, কোণারক, পরাদীপ এবং সম্বলপুরের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

লিঙ্গরাজ মন্দির

ভুবনেশ্বরের এই মন্দিরটি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন! দশম শতাব্দীর শেষে নির্মিত এই মন্দিরের খোদিত মূর্তিগুলি আজও জীবন্ত।

রাজারাণী মন্দির

প্রায় পরিত্যক্ত এই ক্ষুদ্র মন্দিরটি ভাস্কর্যের এক অতি অনুপম নিদর্শন।

পরমেশ্বরের মন্দির, মুক্তেশ্বর মন্দির, বৈতাল মন্দির, গৌরীকেদার

এই মন্দিরগুলি বিশেষভাবে দর্শনীয়। গৌরীকুণ্ডের জল পেটের অসুখের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ধৌল গুহা

ভুবনেশ্বর থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই গুহাটি ভারত ইতিহাসের এক অতি মূল্যবান বিষয়। এখানে অশোকের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

ভুবনেশ্বর থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত এই গুহাগুলি গুহাশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। প্রাচীন বৌদ্ধ জৈন ভারতে ভিক্ষুরা কিভাবে গুহায় বসবাস করতেন তা গুহাগুলি দেখলে অনুমান করা যায়।

থাকবার স্থান :—

ভুবনেশ্বরে থাকবার বহু হোটেল আছে। জনপ্রতি থাকা খাবার জন্য দৈনিক ২০ থেকে ৩০ টাকা লাগে। এছাড়া পর্যটন বাংলো আছে। এখানেও থাকা খাবার ব্যবস্থা আছে। টুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসার, পুরী রোড, ভুবনেশ্বর—৬-এর কাছে আবেদন করতে হয়।

চিল্কাহ্রদ :—

চিল্কাহ্রদের সৌন্দর্য মনোরম। এখানে লঞ্চ বা নৌকায় ভ্রমণ করা যায়।

যানবাহন :—

চিল্কা যাবার সুবিধা হল, ট্রেনে রম্ভা স্টেশন থেকে চিল্কা যাওয়া। রম্ভা, ভুবনেশ্বর—মাদ্রাজ রুটে অবস্থিত। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ মেল, হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ও জনতা এক্সপ্রেস-এ করে রম্ভা যাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে আরামে যাওয়া যায় বালু গাঙ স্টেশনে নামলে। এখান থেকে ১ মাইলের মধ্যে চিল্কা। সাইকেল রিক্সায় অতি সহজে যাওয়া যায়।

থাকবার স্থান :—

এখানে থাকার কোন হোটেল নেই। ভুবনেশ্বর থেকে চিল্কা নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

গোপালপুর :—

গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত গোপালপুরের সমুদ্র বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। যাঁরা সমুদ্রের ভয়ালরূপ দেখতে চান এবং সমুদ্র-স্নানের মাদকতা অনুভব করতে চান তাঁদের কাছে ভারতের সব থেকে আদর্শ সমুদ্র-নিবাস হল এই গোপালপুর।

যানবাহন :—

গোপালপুর যাবার সব থেকে সুবিধা—বহরমপুর (গঞ্জাম) স্টেশনে নামা। সমস্ত গাড়ীই এখানে থামে। মাদ্রাজ মেল, হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ও জনতা এক্সপ্রেস এখানে থামে। কলকাতা থেকে এক রাত্রের ভ্রমণে পরের দিন সকালে বহরমপুর পৌঁছান যায়। এখান থেকে ১০ মাইল গোপালপুর। নিয়মিত বাস গোপালপুর বহরমপুরের মধ্যে চলাচল করে।

থাকবার স্থান :—

এখানে থাকবার ভাল ভাল হোটেল আছে। থাকা এবং খাবার জন্য জনপ্রতি দৈনিক ২০ থেকে ৪০ টাকা লাগে। এছাড়া বহু কটেজ ভাড়া পাওয়া যায়, যেখানে রান্না করে খাবার ব্যবস্থা আছে।

হীরাকুঁদ বাঁধ :—

মহানন্দা নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এই হীরাকুঁদ বাঁধ। নদীতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের জন্য কাজে লাগান হয়।

যানবাহন :—

হীরাকুঁদ যাবার নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন সম্বলপুর। সম্বলপুর রেল-স্টেশন থেকে হীরাকুঁদ ১০ মাইল। কিন্তু সুবিধার দিক থেকে ঝারসাগুদা স্টেশনে নামাই শ্রেয়। ঝারসাগুদা স্টেশনটি হাওড়া-বোম্বাই (ভায়া নাগপুর) রুটের জংশন স্টেশন। সম্বলপুর যেতে হলে এখানে গাড়ী বদল করতে হয়। মাদ্রাজ থেকে এলে মাদ্রাজ, ভিজিয়ানাগ্রাম, রায়পুর হয়ে ঝাংসাগুদা স্টেশনে আসা যায়। দিল্লী থেকে নাগপুর হয়ে ঝারসাগুদা আসা যায়। এখান থেকে

৪৫ মাইল হীরাকুঁদ। নিয়মিত বাস সম্বলপুর, ঝারসাগুদা ও হীরাকুঁদের মধ্যে চলাচল করে।

থাকবার স্থান ঃ—

হীরাকুঁদে কোন হোটেল নেই। তবে নিরীক্ষণ ভবন (Inspection Bungalow) আছে এবং হীরাকুঁদ গেস্ট হাউস আছে। এখানে থাকতে গেলে অনুমতি নিতে হয়, Executive Engineer, Hirakud Dam Project, Hirakud, Orissa-এর কাছ থেকে।

পুরী ঃ—

জগন্নাথদেবের মন্দির ও সমুদ্রের সৌন্দর্যের জন্য পুরী একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান।

যানবাহন ঃ—

হাওড়া থেকে সরাসরি পুরী এক্সপ্রেস ট্রেনে করে পুরী যাওয়া যায়। এছাড়া আজকাল কলকাতা ও পুরীর মধ্যে এক্সপ্রেস বাস চলাচল করছে। পুরী থেকে ভুবনেশ্বর কোনারক যাবার নিয়মিত বাস সার্ভিস আছে। পুরীর মধ্যে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখার জন্য সাইকেল রিক্সা ভাড়া নিলে ভাল হয়।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে সাগরের তীরে বহুসংখ্যক হোটেল আছে। দৈনিক থাকা এবং খাবার জন্য জনপ্রতি ১২ থেকে ৩০ টাকা লাগে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘরভাড়া পাওয়া যায়। ধর্মশালাও আছে। পাণ্ডা অথবা রিক্সওয়ালাদের কাছে ঐ সব থাকবার জায়গার খবর পাওয়া যায়।

কোনারক ঃ—

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত এখানকার সূর্য মন্দির বিশ্ববিশ্রুত। মন্দিরের ভাস্কর্য বিস্ময়কর। একটি রথের আকৃতিতে মন্দিরটি পরিকল্পিত। মন্দির, মৃদঙ্গ, মুরলী-বাদিনী মূর্তিগুলি মন্দির শীর্ষদেশে আশ্চর্য মহিমায় অবস্থিত। প্রতিটি ক্ষুদ্র বৃহৎ মূর্তি সুনিপুণ দক্ষতায় সারা মন্দির দেহে উৎকীর্ণ।

যানবাহন ঃ—

কোনারক যাবার সব থেকে সহজ রাস্তা ভুবনেশ্বর হয়ে। ভুবনেশ্বর থেকে

বাসে কোনারক ৪০ মাইল। পুরী থেকে বাস রোজ যাতায়াত করে। ৫৩ মাইল পথ। সকালে ভুবনেশ্বর বা পুরী থেকে বাসে যাত্রা কোনারক ঘুরে সন্ধ্যায় ফিরে আসা যায়। ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কার নিয়েও পুরী বা ভুবনেশ্বর থেকে কোনারক ঘুরে আসা যায়। হোটেল ম্যানেজার কার বা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

থাকবার স্থান ঃ—

কোনারকে থাকার আজকাল সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে। পর্যটন বিভাগের ডাকবাংলো আছে। এখানে থাকার জন্য জনপ্রতি ৪'৭৫ এবং দুজনের জন্য ৯'৫০ দৈনিক লাগে। খাবারও আলাদা ব্যবস্থা আছে। আবেদন করতে হয়—ম্যানেজার, পান্থনিবাস, কোনারক, উড়িষ্যা—এর কাছে।

॥ বিহার ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বিহারের উত্তরে নেপাল, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল এই বিহার। অশোকের রাজধানী ছিল বিহারের অন্তর্গত পাটলিপুত্রে। গৌতম বুদ্ধ বর্তমান বুদ্ধগয়ার নিকটে বোধি লাভ করেন। বিহার ভারত সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র।

পাটনা ঃ—

বিহারের রাজধানী ও বড় শহর।

যানবাহন ঃ—

হাওড়া—মুঘলসরাই (মেন লাইন)-এর উপর পাটনা একটি বড় জংশন। পাটনা থেকে ট্রেনে গয়া যাওয়া যায়। হাওড়া থেকে অমৃতসর মেল, দিল্লী এক্সপ্রেস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেস, জনতা এক্সপ্রেস, তুফান এক্সপ্রেস ও আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে পাটনা যাওয়া যায়। দিল্লী থেকে অনুরূপ গাড়ীতে পাটনা আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে আসতে হলে খড়্গপুর, আসানসোল হয়ে পাটনা যেতে হয়। বোম্বাই থেকে আসতে হলে গয়াতে গাড়ী পালটে আসা যায় অথবা বোম্বাই হাওড়া জনতা এক্সপ্রেসে সরাসরি পাটনা আসা যায়।

শহরে বাস, সাইকেল রিক্সা ও ট্যাক্সি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

শহরের হাইকোর্ট, এসেম্ব্লি, লাইব্রেরী ও বিশ্ববিদ্যালয় দেখার মত। শহরের প্রান্তে একটি শস্যাগার আছে। কথিত আছে এখানে পূর্বে শস্য মজুত করে রাখা হত। দুর্ভিক্ষের দিনে জনসাধারণের জন্য এই শস্যাগার উন্মুক্ত করে দেওয়া হত।

পাটলিপুত্র

শহর থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। অশোকের রাজধানী এখানে অবস্থিত

ছিল। মাটি খুঁড়ে পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখনও রাজপ্রাসাদের প্রধানগৃহের কড়িগুলো পর্যন্ত দণ্ডায়মান।

থাকবার স্থান ঃ—

পাটনা যেহেতু বিহারের রাজধানী, তাই এখানে অনেকগুলি ভাল ভাল হোটেল আছে। ২০ থেকে ৪০ টাকার মধ্যে দৈনিক থাকা খাওয়া বাবদ জনপ্রতি খরচ পড়ে। এছাড়া সার্কিট হাউস, পূর্তবিভাগের ডাকবাংলো ও ধর্মশালা আছে। বাংলোর জন্য—সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, পূর্তবিভাগ, পাটনা-র অনুমতি নিতে হয়।

গয়া ঃ—

গয়া হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে বিষ্ণুপাদ পদ্ম দর্শন করা এবং শ্রাদ্ধাদিকর্ম সম্পন্ন করার বিধি আছে।

যানবাহন ঃ—

গয়া, হাওড়া—মুঘলসরাই কর্ড লাইনের উপর অবস্থিত একটি বড় জংশন। গয়া থেকে পাটনা যাবার এবং রাঁচী যাবার পথ আছে। হাওড়া থেকে কাল্‌কা মেল, শীততাপনিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেস, বোম্বাই মেল, দুন এক্সপ্রেস প্রভৃতি গাড়ীতে সরাসরি গয়া যাওয়া যায়। দিল্লী থেকে সরাসরি অনুরূপ ভাবে আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে খড়্গপুর, আসানসোল হয়ে গয়া আসা যায়। বোম্বাই থেকে হাওড়া মেলে গয়া আসা যায়। গয়ায় সাইকেল রিক্সা ও বাস পাওয়া যায় শহরে ঘোরার জন্য। এছাড়া গয়া থেকে পাটনা, রাঁচী, রাজগীর প্রভৃতি স্থানে যাবার জন্য রাজ্য সরকারের বাস আছে।

বুদ্ধগয়া ঃ—

গয়া থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। বুদ্ধগয়া যাবার জন্য ট্যাক্সি, টাংগা, বাস ও সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের এ এক পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে বোধিবৃক্ষের তলায় তপস্যা করে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। এখানে অশোকের লিপি আছে। অনেকগুলি বৌদ্ধ মন্দির আছে। বুদ্ধগয়ার মন্দির, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন।

থাকবার স্থান ঃ—

বুদ্ধগয়ায় থাকবার কোন হোটেল নেই। গয়ায় হোটেল আছে তবে খুব

ভাল ধরণের হোটেলের অভাব। (১) নিরীক্ষণ ভবন (Inspection Bungalow) আছে। Executive Engineer P. W. D. Gaya-এর কাছে আবেদন করতে হয়। (২) পর্যটন বাংলো (Tourist Bungalow) আছে। Caretaker, Tourist Bungalow, Bodh Gaya-এর কাছে অনুমতি নিতে হয়। (৩) এছাড়া প্রচুর ধর্মশালা আছে, যেখানে থাকার জায়গা পাওয়া যায়। বিশেষভাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘ উল্লেখযোগ্য।

রাজগীর :—

রাজগীর বুদ্ধের জীবন ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

যানবাহন :—

আসানসোল পাটনা রুটের একটি জংশন ব্যক্তিয়ারপুর। এখানে গাড়ী বদল করে রাজগীরের গাড়ী পাওয়া যায়। ব্যক্তিয়ারপুর—তুফান এক্সপ্রেস, জনতা এক্সপ্রেস, আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস, দিল্লী এক্সপ্রেস প্রভৃতি গাড়ীতে সরাসরি হাওড়া থেকে যাওয়া যায়। বোম্বে থেকে সরাসরি বোম্বাই—হাওড়া এক্সপ্রেসে ব্যক্তিয়ারপুর আসা যায়।

এছাড়া বাসে রাজগীর সরাসরি পাটনা ও গয়ার সঙ্গে রাজ্য পরিবহন কর্তৃক যুক্ত। দৈনিক বাস পাওয়া যায় রাজগীরের জন্য। ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। পাটনা এবং গয়া থেকে রাজগীরের দূরত্ব যথাক্রমে ৬৪ এবং ৪২ মাইল।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

অজাতশত্রুর দুর্গ

মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। এখানে রাজা অজাতশত্রুর নির্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃশ্যমান।

রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ ও তপ্তকুণ্ড

প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ সমগ্র শহরে ছড়ানো। এখানে অনেকগুলি তপ্তকুণ্ড আছে। কুণ্ডে স্নানের ব্যবস্থাও আছে। চর্মরোগের পক্ষে এইসব কুণ্ডে স্নান বিশেষ উপকারী।

সোনভাণ্ডার দুর্গ

কথিত আছে এটি বিম্বিসারের খাজাঞ্চিখানা ছিল। ইংরাজরা বহু চেষ্টা করেও এটিকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

শান্তি স্তূপ

এখানে জাপানের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা পর্বতের উপরে কয়েক বছর আছে অতি সুদৃশ্য শ্বেত পাথরের একটি বৌদ্ধ স্তূপ নির্মিত হইয়েছে। এখন রোপওয়ের মাধ্যমে ঐ স্তূপে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গৃদ্ধকূট পাহাড়

কথিত আছে এই পাহাড়ে গৌতমবুদ্ধ সুজাতার হাত থেকে পায়সান্ন গ্রহণ করেছিলেন।

নালন্দা

রাজগীর থেকে রেলপথে নালন্দা ৯ মাইল। এছাড়া নালন্দা রাজগীরের মধ্যে বাসও চলাচল করে। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। এখানে প্রচুর মঠ, স্তূপ ও বুদ্ধের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়ে এই ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করেন। এখানকার প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ বিভাগটি অবশ্য দ্রষ্টব্য।

থাকবার স্থান ঃ—

রাজগীরে কোন ভাল হোটেল নেই। তবে থাকবার প্রচুর ব্যবস্থা আছে।

(১) যুব হোস্টেল আছে—এখানে থাকার জন্য, "কেয়ারটেকার, রাজগীর"-এর অনুমতি নিতে হয়।

(২) মিন্সটেরিয়েল কোয়াটার্স-এ থাকার জন্য Executive Engineer, P. W. D. Bihar Shariff-কে লিখতে হয়। প্রতি ফ্ল্যাটের ভাড়া দৈনিক ৪ টাকা।

(৩) ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড নিরীক্ষণ ভবনে থাকতে হলে—District Engineer, District Board, Patna-এর কাছে অনুমতি নিতে হয়।

(৪) জেলাবোর্ড ডাকবাংলোর জন্য একই ব্যক্তির অনুমতি প্রয়োজন।

(৫) সার্কিট হাউসের জন্য Executive Engineer, Bihar Shariff, Dt. Patna-এর অনুমতি নিতে হয়।

(৬) রাজগীর বিশ্রামাগারে আগে থেকে আদেশ সংগ্রহ করতে হয় না। এছাড়া জৈন, বার্মিজ ও চাইনিজ ধর্মশালা আছে যেখানে ঘরভাড়া পাওয়া যায়।

বৈশালী :—

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যতগুলি রাজ্য ভারতে ছিল তার মধ্যে বৈশালী ছিল অন্যতম। গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলির মধ্যে বৈশালীর স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে।

যানবাহন :—

বৈশালী যাবার সব থেকে সুবিধা মজঃফরপুর পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়া। হাওড়া থেকে নর্থ বিহার এক্সপ্রেস সোজা সমস্তিপুর যায়। এখানে গাড়ী বদল করে মজঃফরপুর যেতে হয়। হাওড়া থেকে দূরত্ব ৩৫৪ মাইল। বেনারস থেকে ১৬৬ মাইল মাত্র। দিল্লী এবং বোম্বে থেকে মুঘলসরাই হয়ে বেনারস অথবা পাটনা, মজঃফরপুর হয়ে বৈশালী যাওয়া যায়। বৈশালী মজঃফরপুর থেকে ২৩ মাইল। বিহার সরকার মজঃফরপুর রেল স্টেশন থেকে একটি পর্যটন বাস চালান। তুপুর ১টা নাগাদ ছাড়ে এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসে। জন প্রতি যাতায়াত ভাড়া ৩·৫০ টাকা।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

তুর্গ

রাজা বিশাল-এর তুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। এখানে প্রাচীন আইনসভা ছিল।

অশোকের শিলালিপি

এখানে অশোকের শিলালিপি আছে।

বুদ্ধস্তূপ

বুদ্ধের সময়ের স্তূপ এখানে বর্তমান।

থাকবার স্থান :—

মজঃফরপুরে কয়েকটি হোটেল আছে। কিন্তু খুব ভাল হোটেল নেই। বৈশালীতে থাকার কয়েকটি জায়গা আছে।

(১) গেস্ট হাউস (২) রেস্ট হাউস—তুটির অনুমতি নিতে হয়—S. D. O., P. W. D. Hazipur অথবা Executive Engineer P. W. D., No. 1, Muzaffarpur-এর কাছ থেকে। (৩) যুব হোস্টেলে থাকতে হলে—B. D. O. বৈশালী-এর অনুমতি নিতে হয়।

হাজারীবাগ ঃ—

জেলা সদর। এখানকার জল-হাওয়া অত্যন্ত ভাল। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বহু লোক এখানে আসেন। বিশেষ করে শীতকাল এখানে বিশেষভাবে উপভোগ্য।

যানবাহন ঃ—

হাজারীবাগ রোড় স্টেশন, গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে আসানসোল—মুঘলসরাই রুটের একটি বড় স্টেশন। দিল্লী থেকে সরাসরি গাড়ী আছে। কাল্‌কা মেল ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেসে হাজারীবাগ আসা যায়। বোম্বে এবং মাদ্রাজ থেকে আসতে হলে মুঘলসরাই-এ গাড়ী বদল করতে হয়। হাজারীবাগ, বিহার রাজ্য পরিবহন দ্বারা পাটনা, রঁাচী, কোডারমা প্রভৃতি বড় বড় শহরের সঙ্গে যুক্ত।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

শহরটি ছবির মত সাজান। এখানকার বিশেষ আকর্ষণ জাতীয় পার্ক। এখানে বাঘ, হরিণ, সম্বর, নীলগাই প্রভৃতি পশুগুলিকে প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় রাখা হয়। জাতীয় পার্কটি শহর থেকে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। ট্যাক্সি পাওয়া যায়। বন বিভাগ একটি স্টেশনওয়াগানে করে দর্শক নিয়ে যায়। জনপ্রতি পাঁচ টাকা ভাড়া লাগে।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে খুব ভাল হোটেল নেই। তবে চলনসই কয়েকটি হোটেল আছে যেখানে খাবার ও থাকার জায়গা আছে। এছাড়া বনবিভাগের নিরীক্ষণ ভবন ও সার্কিট হাউস আছে। Execntive Engineer P. W. D. হাজারীবাগ-এর কাছে দরখাস্ত করতে হয়।

রাজারাপ্পা

হাজারিবাগের ৫০ কি. মি. দূরে রামগড়। এর প্রায় নিকটেই তেহুঘাট। আর একটি পথে পৌঁছান যায় রাজারাপ্পা। এখানকার কালীমন্দির একটি পীঠস্থান। এখানে দামোদর নদী ও পাহাড়ের মধ্যে খাদ কেটে একটি সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করা হয়েছে।

রঁাচী ঃ—

রঁাচী বিহারের অন্যতম বড় শহর। সরকারী বহু কাজকর্ম এখানে করা হয়। এছাড়া বর্তমানে রঁাচী বৃহৎ শিল্প শহর। দর্শনীয় স্থান।

যানবাহন ঃ—

কলকাতা থেকে রঁাচী যাবার সরাসরি গাড়ী আছে। দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের

রাঁচী এক্সপ্রেসটি কলকাতা থেকে রাঁচী যায়; পাটনা থেকে রাঁচী ট্রেনপথে যুক্ত। দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে আসতে হলে গয়ায় ট্রেন বদল করে রাঁচী যাওয়া যায়। সড়ক পথে রাঁচী বিহার রাজ্য পরিবহন দ্বারা সকল বড় বড় শহরের সঙ্গে যুক্ত। সম্বলপুর, নেতার হাট, রামগড়, হাজারীবাগ, কোডারমা প্রভৃতি শহরের সঙ্গে বাস দ্বারা রাঁচী যুক্ত। শহরে সাইকেল রিক্সা ও ট্যাক্সিই প্রধান যানবাহন।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ

রাচী লেক

শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রাকৃতিক হ্রদটি অতি মনোরম।

মোরাবাদী পাহাড়

এই পাহাড়ে উপর অবস্থিত কালীমন্দির বহু দর্শনার্থীকে আকর্ষণ করে।

ঠাকুর পাহাড়

এটি রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে জড়িত। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি মনোরম বাড়ী আছে ঠাকুর পরিবারের। এখানে কবিগুরু বহুদিন কাটিয়েছেন।

কাঁকে

রাঁচী শহর থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার মানসিক হাসপাতাল দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষে এতবড় মানসিক হাসপাতাল আর একটিও নেই।

জোনা ও হুড্রু জলপ্রপাত

দুটি জলপ্রপাতই রাঁচীর দর্শনীয় বস্তু। বর্তমানে হুড্রুর উপর জলবিদ্যুতের জন্য বাঁধ নির্মাণ হওয়ায় জলপ্রপাতের জল বিশেষভাবে কমে গেছে। শহর থেকে নিয়মিত বাস যায়।

দশন জলপ্রপাত

রাঁচী—জামসেদপুর রোডে রাঁচী থেকে ৭ মাইল গিয়ে মোড় নিতে হয়। তারপর আরও ৫ মাইল গেলে পড়ে এই জলপ্রপাত। বনবিভাগ এখানে একটি নিরীক্ষণ ভবন নির্মাণ করেছেন। আগে থেকে নির্দেশ নিয়ে এখানে থাকা যায়। জলপ্রপাতটি দেখবার জন্য বনবিভাগ সুন্দরভাবে সিঁড়ি দিয়ে পাড় বাঁধিয়ে দিয়েছে।

নেতারহাট

রাঁচী থেকে নেতারহাটে নিয়মিত বাস যায়। দূরত্ব ৯৬ মাইল। গরমকালে এখানে যাওয়ার খুব অসুবিধা, কারণ প্রচণ্ড উত্তাপ। শীতকাল, বিশেষ করে অক্টোবর—ফেব্রুয়ারীই প্রশস্ত সময় নেতারহাট যাবার। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এখানে বিশেষ উপভোগ্য। নেতারহাট পালামৌ পর্বতমালায় অবস্থিত। পালামৌ ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। সূর্যাস্ত দেখতে হলে নেতারহাট বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে যেতে হয়। এখানে বনবিভাগ, রাঁচী সরকারী ডাকবাংলো প্রভৃতিতে থাকা যায়। আগে থেকে টুরিস্ট অফিসার, রাঁচী অথবা নেতারহাট—এঁদের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে হয়।

থাকবার স্থান ঃ—

রাঁচীতে সুন্দর সুন্দর কয়েকটি হোটেল আছে। স্টেশনের কাছে এবং শহরের মধ্যে হোটেলগুলি অবস্থিত। বিছানাপত্র সহ ঘর পাওয়া যায়। জন প্রতি ১৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত দৈনিক খরচ লাগে এই সব হোটেলে। এছাড়া সার্কিট হাউস ও পূর্ত বিভাগের নিরীক্ষণ ভবন আছে। এখানে থাকার অনুমতি Executive Engineer, P. W. D. রাঁচী অথবা টুরিস্ট অফিসার, রাঁচী-র কাছ থেকে নিতে হয়।

জামসেদপুর ঃ—

টাটানগর বা জামসেদপুর ভারতবর্ষের ইস্পাত শিল্পের পথপ্রদর্শক। বিহারের অন্যতম এই শহরটি সিংভূম জেলায় অবস্থিত।

যানবাহন ঃ—

কলকাতা-নাগপুর মেন লাইনের উপর টাটানগর একটি রেলওয়ে জংশন। বোম্বে মেল, বোম্বে এক্সপ্রেস, রাঁচী এক্সপ্রেস প্রভৃতি ট্রেনে সরাসরি কলকাতা থেকে জামসেদপুর যাওয়া যায়। বোম্বে থেকেও অনুরূপভাবে যাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকে খড়্গপুরে গাড়ী বদল করে আসা যায়। দিল্লী থেকে আসানসোল

হয়ে আসা যায়। এ ছাড়া জামসেদপুর—পাটনা, রাঁচী, গয়া প্রভৃতি বড় বড় শহরের সঙ্গে রাজ্য পরিবহনের বাস দ্বারা যুক্ত।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

টাটার লোহার কারখানা একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু। জামসেদপুরের জল সরবরাহের জন্য নির্মিত জলাধারটির দেখবার মত। শহর থেকে এর দূরত্ব ৬ মাইল। বাসে যাওয়া যায়।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে কয়েকটি হোটেল আছে। দৈনিক ২০—৪০ টাকার মত খরচ। এ ছাড়া টাটা কোম্পানীর গেস্ট হাউস আছে।

দামোদর ভ্যালি করপোরেশন (ডি, ভি, সি,) :—

দামোদর নদীতে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করে চাষের সুবিধার জন্য সময়মত সেই জল ছাড়ার ব্যবস্থা করা হয়! ঐ জল থেকে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঐ বিদ্যুৎ বিভিন্ন শিল্পে ও সাধারণের ব্যবহারে লাগানো হয়।

বোকারো থার্মাল পাওয়ার

হাজারীবাগ শহর থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪৭ মাইল। বাস চলাচল করে। এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনাগারটি দেখবার মত।

কোনার বাঁধ

এখানে জল সঞ্চয় করে রাখা হয়। বোকারো থেকে ১৫ মাইল, তিলাইয়া থেকে ৫৮ মাইল ও হাজারীবাগ থেকে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। সব জায়গা থেকেই রাজ্য পরিবহনের বাস আছে। এছাড়া ট্যাক্সিও পাওয়া যায় সর্বত্র।

মাইথন বাঁধ

এখানে জলাধার ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। বাঁধের নীচে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি দেখবার মত। কাছাকাছি রেল স্টেশন বরাকর, আসানসোল-মুঘলসরাই লাইন অবস্থিত। বরাকরে নেমে রিক্সা বা ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। কলকাতা-দিল্লীর মধ্যে চলাচলকারী যে কোন গাড়ীতেই বরাকরে আসা যায়। সব থেকে সুবিধা আসানসোল থেকে যাওয়া। মাত্র ১৬ মাইল। রাজ্য

পরিবহনের বাস ধানবাদ, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, রাঁচী, সিন্ধ্রি প্রভৃতি জায়গা থেকে নিয়মিত যাতায়াত করে।

পাঞ্চেৎ বাঁধ

এখানেও জলাধার আছে। আসানসোল থেকে পাঞ্চেৎ মাত্র ১৯ মাইল। মাইথন ও আসানসোল থেকে নিয়মিত বাস পাঞ্চেতে চলাচল করে।

তিলাইয়া বাঁধ

এটিও জলাধার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। নিকটস্থ রেল স্টেশন কোডারমা। এটি ধানবাদ-মুঘলসরাই রুটে অবস্থিত। কলকাতা থেকে দুন এক্সপ্রেস, কালকা মেল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেস প্রভৃতি গাড়ীতে কোডারমা যাওয়া যায়। দিল্লী থেকেও অনুরূপভাবে যাওয়া যায়। বোম্বে ও মাদ্রাজ থেকে মুঘলসরাই-এ গাড়ী বদল করে যাওয়া যায়। কোডারমা স্টেশন থেকে তিলাইয়া ১২ মাইল মাত্র। এছাড়া রাজ্য পরিবহনের বাস নিয়মিত তিলাইয়া, পাটনা, রাঁচী, কোডারমার মধ্যে যাতায়াত করে।

প্রত্যেকটি জায়গাতেই নিরীক্ষণ ভবন আছে দামোদর ভ্যালির (ডি, ভি, সি,)। থাকবার অনুমতি নিতে হয়: Chief Information Officer, D. V. C., Bhabani Bhaban, Calcutta-700027 কাছ থেকে।

প্রত্যেকটি স্থানেই নৌকায় করে ঘোরবার ব্যবস্থা আছে।

ঘাটশীলা, মধুপুর, জসিডি, দেওঘর, গিরিডি, শিমুলতলা ও দুম্‌কা:—

প্রমোদভ্রমণ ও স্বাস্থ্যনিবাসের উপযুক্ত স্থান হিসাবে এই কয়েকটি জায়গা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র বিত্তবানেরাই নন, মধ্যবিত্ত বাঙালীরা তাঁদের সামর্থ্যের ভেতর বলে এই সকল স্থানে প্রায়ই স্বাস্থ্যোদ্ধার ও অবসর বিনোদনের জন্য গিয়ে থাকেন।

ঘাটশীলা

হাওড়া থেকে ২১৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। প্রমোদভ্রমন ও স্বাস্থ্যনিবাসের উপযুক্ত জায়গা। সুবর্ণরেখার তীরে ভ্রমণ অত্যন্ত আরামদায়ক। নিকটবর্তী

মৌভাণ্ডারে তামার খনি আছে। বন পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পথটি চলে গেছে মৌভাণ্ডারের দিকে।

এখানে থাকার জন্যে কয়েকটি হোটেল আছে। থাকা ও খাওয়ার জন্যে মাথাপিছু খরচ পড়ে ২০ থেকে ৪০ টাকা। ভাড়া বাড়ীও পাওয়া যায়।

হাওড়া থেকে ঘাটশীলা যাবার কয়েকটি গাড়ী আছে। হাওড়া-বম্বে এক্সপ্রেস, ষ্টিল এক্সপ্রেস, হাওড়া-রাঁচী এক্সপ্রেস, হাওড়া-রাউরকেল্লা এক্সপ্রেস এবং হাওড়া-টাটানগর প্যাসেঞ্জার। তাছাড়া খড়্গপুর থেকে খড়্গপুর-টাটানগর প্যাসেঞ্জারেও ঘাটশীলা যাওয়া যায়।

মধুপুর

হাওড়া থেকে ২৮২ কিঃ মিঃ দূরে মধুপুর অবস্থিত। সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন স্থান স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে বিখ্যাত। প্রাকৃতিক পরিবেশে অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থানরূপে মধুপুর দীর্ঘকাল ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এখানে পি, ডব্লু, ডি-র বাংলোতে থাকা যায়। ভাড়া-বাড়ীও পাওয়া যায়। মাথাপিছু দৈনিক ব্যয় আট থেকে বারো টাকা। ভাড়া-বাড়ীতে নিজেদের খুশি ও সামর্থ্য মত রান্না করে খাওয়া যায়।

হাওড়া থেকে মধুপুর যাবার গাড়ী অনেকগুলি। তুফান এক্সপ্রেস, সাউথ বিহার এক্সপ্রেস, নর্থ বিহার এক্সপ্রেস, মিথিলা এক্সপ্রেস, দিল্লী জনতা এক্সপ্রেস, অমৃতসর মেল, মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার।

শিয়ালদা থেকে সমস্তিপুর প্যাসেঞ্জার মধুপুর যায়।

জসিডি

হাওড়া থেকে ৩১১ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর জল হাওয়া এবং প্রমোদভ্রমণের উপযুক্ত স্থান।

থাকার জন্য বাড়ী ভাড়াও পাওয়া যায়।

হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে যে ট্রেনগুলি মধুপুর যায়, সেগুলিতে জসিডিও যাওয়া যায়।

দেওঘর বা বৈদ্যনাথধাম

হাওড়া থেকে ৩১৭ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। প্রচীন তীর্থভূমি ও স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে বৈদ্যনাথ মন্দির, নন্দন পাহাড়, ত্রিকূট পাহাড় এবং স্থানীয় কয়েকটি আশ্রম বিশেষভাবে দর্শনীয়।

এখানে ধর্মশালা, হোটেল এবং ভাড়া-বাড়ীতে ভ্রাম্যমানেরা থাকতে পারেন। দৈনিক জনপ্রতি ব্যয় আট থেকে বারো টাকার মত।

হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে জসিডি স্টেশনে নেমে আবার দেওঘরের ট্রেন ধরতে হয়। জসিডি থেকে প্রত্যহ ন'খানি ট্রেন দেওঘর যাতায়াত করে। জসিডি থেকে বাসেও দেওঘর যাওয়া যায়।

গিরিডি

হাওড়া থেকে গিরিডির দূরত্ব ৩২০ কিঃ মিঃ। এটি একটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে উশ্রী ফল্‌স এবং মাইল পাঁচেক দূরবর্তী পরেশনাথ পাহাড় বিখ্যাত। হাওড়া এবং শিয়ালদা থেকে ট্রেন মধুপুর স্টেশনে নেমে, ট্রেন বদল করে গিরিডি যেতে হয়। মধুপুর থেকে তৃতীয় স্টেশনই গিরিডি।

এখানে পি, ডব্লু, ডি-র বাংলো ও ভাড়া বাড়ীতে থাকা যায়।

শিমূলতলা

হাওড়া থেকে ৩৩৬ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। জসিডির পরবর্তী স্টেশন। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ার জন্য বিখ্যাত।

এখানে ভাড়া-বাড়ীর সন্ধান করে থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। জায়গাটি শান্ত আর নির্জন বলে অনেকের পছন্দ।

হাওড়া থেকে দিল্লী-জনতা এক্সপ্রেস, মিথিলা এক্সপ্রেস, মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার এবং শিয়ালদা থেকে সমস্তিপুর প্যাসেঞ্জার শিমূলতলা স্টেশনে থামে।

দুম্‌কা

হাওড়া থেকে পূর্ব রেলপথের লুপ লাইনে রামপুর হাটের দূরত্ব ২০৭ কিঃ মিঃ। ওখান থেকে বাসে প্রায় ৬০ কিঃ মিঃ দুম্‌কার দূরত্ব।

ডুম্‌কা স্বাস্থ্যকর স্থান। বসন্তে যখন পলাশ ফোটে তখন এই স্থানের সৌন্দর্য ভ্রমণকারীর দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

এখানে পি, ডব্লু, ডি-র ডাকবাংলোতে অথবা ভাড়া-বাড়ীতে থাকা যায়।

ডুম্‌কা যেতে হলে দেওঘর থেকে বাসে অথবা রামপুর হাট থেকে বাসে যেতে হয়। কলকাতা থেকে রামপুর হাট হয়ে যাওয়াই সুবিধে।

হাওড়া থেকে রামপুর হাট—গয়া প্যাসেঞ্জার, কিউল প্যাসেঞ্জার, দানাপুর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার, সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার, রামপুর হাট প্যাসেঞ্জার, আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস ও দার্জিলিং মেলে যাওয়া যায়।

॥ আসাম ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত আসামের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাংলাদেশ। পূর্বে ব্রহ্মদেশের সীমানা আসামের সঙ্গে মিলিত। প্রাকৃতিক রমণীয়তা আসামের বৈশিষ্ট্য। পর্বত, অরণ্য ও বিশাল নদী আসাম রাজ্যটিকে সৌন্দর্যের আকর করে তুলেছে।

গৌহাটি ঃ—

প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুর বর্তমানের গৌহাটি। এককালে বিভিন্ন শাসকদের রাজধানী ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদ বিধৌত এই শহরটির দৃশ্য অতিশয় মনোরম।

যানবাহন ঃ—

গৌহাটি—ট্রেনে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কলকাতা, ডিব্রুগড় প্রভৃতি শহরের সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা থেকে নিউ বনগাইগাঁও এক্সপ্রেস ট্রেনে বনগাইগাঁও পর্যন্ত যাওয়া যায়। তারপর মীটারগেজ গাড়ীতে করে গৌহাটি পৌঁছান যায়। দিল্লী থেকে বারাউনীতে গাড়ী বদল করে সরাসরি গৌহাটি আসা যায়। লক্ষ্ণৌ, বারাণসী থেকে মীটারগেজ গাড়ীতে সরাসরি গৌহাটি আসা যায়। বোম্বে থেকে বারাউনী হয়ে গৌহাটি যাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকে গৌহাটি যাবার পথ কলকাতা হয়ে। আসাম রাজ্য পরিবহনের দ্রুতগতি বাস গৌহাটিকে ডিব্রুগড়, কাজীরাঙ্গা, বরপেটা রোড, শিলং, শিবসাগর প্রভৃতি শহরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এছাড়া শহরের মধ্যেও বাস যাতায়াত করে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

হাজো মন্দির

গৌহাটি থেকে ১৪ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত এই মন্দিরটি হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমানদিগের নিকট পবিত্র।

তৈল শোধনাগার

নুনমাটি তৈল শোধনাগার ১৯৬১ সাল থেকে তৈল শোধন করে চলেছে। ভারত-রুমানিয়ার যৌথ প্রয়াসে নির্মিত এই শোধনাগার।

জনার্দন মন্দির

শহরের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদী তীরে অবস্থিত এই পাহাড়ী মন্দিরটি হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এখানকার বৌদ্ধ মূর্তিটি দেখবার মত।

বশিষ্ঠ আশ্রম

গৌহাটি শহর থেকে ৭ মাইল দূরে এই আশ্রমটি অবস্থিত। প্রবাদ অনুযায়ী মহর্ষি বশিষ্ঠের বাসস্থান ছিল।

নবগ্রহ মন্দির

নবগ্রহের অবস্থান এই মন্দিরে। কথিত আছে এখান থেকে জ্যোতির্বিদ্‌রা গণনা করতেন।

কামাক্ষা মন্দির

শহর থেকে ৬ মাইল দূরে নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত কামাক্ষা মন্দির প্রত্যেক হিন্দুর নিকট এক পবিত্র পীঠস্থান। তান্ত্রিক যোগসাধনার কেন্দ্র। সতীর ৫২ পীঠের এক পীঠ।

উমানন্দ মন্দির

ব্রহ্মপুত্র নদের একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত এই মন্দিরটি বিশেষ দর্শনীয়। এখানে শিবলিঙ্গ আছে। শিবরাত্রিতে এখানে একটি মেলা হয়।

থাকবার স্থান ঃ—

গৌহাটিতে থাকবার অনেকগুলি হোটেল আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলও পাওয়া যায়। থাকা ও খাওয়ার জন্য ১৫—৩০ টাকা জনপ্রতি দৈনিক লাগে। এ ছাড়া সার্কিট হাউসে থাকা যায়। স্পেশাল অফিসার, সার্কিট হাউস, গৌহাটির কাছে আবেদন করে আগাম ব্যবস্থা করা যায়। তাছাড়া ডাকবাংলো আছে। একই ব্যক্তির কাছে আবেদন করতে হয়।

শিলং ঃ—

আসামের রাজধানী শিলং। ৪৯০৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই শহরের আবহাওয়া খুবই সুন্দর। শিলংএর পাহাড়ের দৃশ্য এতই মনোরম যে বিদেশীরা

একে প্রাচ্যের 'স্কটল্যাণ্ড' বলে আখ্যা দেন। গল্ফ্, পোলো, ঘোড়দৌড় প্রভৃতির বিশেষ সুবিধা আছে এখানে।

যানবাহন :—

শিলং গৌহাটি থেকে মাত্র ৬৩ মাইল। আসাম রাজ্য সরকারের বাস আধ ঘণ্টা অন্তর শিলং ও গৌহাটির মধ্যে যাতায়াত করে। তাছাড়া রাজ্য পরিবহন শিলংকে নওগাঁ, ডিব্রুগড়, শিলচর, কাজিরাঙ্গা প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

ওয়ার্ড লেক

এই কৃত্রিম হ্রদটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। একপাশে রাজভবন অন্যপাশে বোটানিক্যাল গার্ডেন এই হ্রদের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। হ্রদের উপর একটি সুদৃশ্য সেতু আছে। এখান থেকে বৃহৎ বৃহৎ মাছ দেখা যায়। হ্রদের প্রচুর পরিমাণে শালুক ফুল ফোটে। হ্রদের বুকে নৌকো-ভ্রমণ খুবই উপভোগ্য।

জলপ্রপাত

শিলংএ পাহাড়ী নদী অনেকগুলি আছে। তাদের গতিপথ কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হলেই জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। তাই শিলংএ অনেকগুলি জলপ্রপাত দেখা যায়। বিশপ ও বিডন জলপ্রপাত ৩½ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে শিলংএর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। ক্রিনোলাইন, সুইট, গামার ও স্প্রেড ঈগল জলপ্রপাত শহরের চারিদিকে বিস্তৃত। শেষোক্ত জলপ্রপাতটির নামকরণ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

এখান থেকে নিয়মিত বাসে ৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি যাওয়া যায়। পৃথিবীর সব থেকে বেশী বৃষ্টিপাত হয় এই চেরাপুঞ্জিতে। স্বভাবতই বর্ষাকালে বিভিন্ন পাহাড়ে প্রচুর জলপ্রপাত দেখা যায়। সব থেকে বড় জলপ্রপাতটি ১০০০ ফুট উচ্চ থেকে নামে। এর নাম মোসমাই জলপ্রপাত।

থাকবার স্থান :—

শিলংএ থাকার জন্য কয়েকটি বেশ অভিজাত হোটেল আছে। এ ছাড়া অনেকগুলি সাধারণ হোটেলও আছে। জনপ্রতি দৈনিক ২৫—৬৫ টাকা

পর্যন্ত লাগে। এ ছাড়া সরকারের টুরিস্ট বাংলো আছে। টুরিস্ট অফিসার, পোলো গ্রাউণ্ড, শিলংএর নিকট আবেদন করতে হয়। সার্কিট হাউসেও থাকা যায়। এর জন্য ডেপুটি কমিশনার, খাসী ও জয়ন্তিয়া হিল্‌স, শিলং-এর কাছে আবেদন করতে হয়।

কাজিরাঙ্গা বন্যজন্তু সংরক্ষণ বাগান :—

কাজিরাঙ্গা এক শৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য জগৎ বিখ্যাত। প্রায় ৫০০ গণ্ডার এই বনে আছে। বুনো মোষ, হরিণ, হাতি, চিতাবাঘ, ময়ালসাপ প্রভৃতি অসংখ্য প্রাণী এখানে দেখা যায়।

যানবাহন :—

নিকটতম রেল স্টেশন জাকলাবান্ধা, শিলঘাট-ছাপরমুখ ব্রাঞ্চ লাইনে অবস্থিত। এখান থেকে কাজিরাঙ্গা মাত্র ২৭ মাইল। তবে সব থেকে সুবিধা জোড়হাট থেকে যাওয়া—মাত্র ৬০ মাইল দূরত্ব। দৈনিক বাস সার্ভিস আছে। এছাড়া গৌহাটি, শিলং, নওগাঁ, ডিব্রুগড়ের মধ্যে সরাসরি নিয়মিত বাস চলাচল করে। সংরক্ষিত বাগানটি দেখার জন্য জিপ এবং হাতির ব্যবস্থা আছে। জনপ্রতি ১০—১৫ টাকা লাগে।

থাকবার স্থান :—

বনবিভাগের নিরীক্ষণ ভবন আছে আরিমারাতে। এর দূরত্ব ১০½ মাইল। এ ছাড়া বাগুরিতেও একটি নিরীক্ষণ ভবন আছে। এর দূরত্ব ৭ মাইল। এ ছাড়া টুরিস্ট বাংলো আছে। দৈনিক জনপ্রতি ২০—৫০ টাকা পর্যন্ত লাগে। পূর্ত বিভাগেরও নিরীক্ষণ ভবন আছে। এ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এন, এইচ), জোড়হাট, শিবসাগর, আসাম-এর নিকট অনুমতি নিতে হয়।

মানস সংরক্ষিত পশু বাগান :—

উত্তর কামরূপ জেলায় অবস্থিত ভুটানের পাদদেশে এই সংরক্ষিত বাগানটি বন্যজন্তু ও দুষ্প্রাপ্য পক্ষীর জন্য বিশেষ আদৃত। অক্টোবর থেকে এপ্রিল এই বাগানটি দেখার উপযুক্ত সময়।

যানবাহন :—

নিকটস্থ রেল স্টেশন বড়পেটা রোড। মথানগুড়ি স্টেশন থেকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখান থেকে কোন নিয়মিত বাস নেই। তাই যাওয়ার

আগে টুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসার, চেনকুটী, এম, সি, রোড, গৌহাটি ৩-এর কাছে মতমত নিতে হয়।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে একটিই থাকবার জায়গা আছে—মথানগুড়ি বনবিভাগ ডাকবাংলো। এখানে থাকবার জন্য District forest officer, Bokakhat, Assam-কে লিখতে হয়।

শিবসাগর ঃ—

প্রাচীন অহম্ রাজাদের নির্মিত বৃহৎ হ্রদ। শিবসিংহ থেকে শিবসাগর নামের উৎপত্তি। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে অহম্ রাজারা রাজত্ব করেছেন। তাদের অনেক নিদর্শন এখনও দেখা যায়।

যানবাহন ঃ—

শিবসাগর যেতে হলে সব থেকে সুবিধা সিমলাগুড়ি স্টেশনে নামা। এটি মরিয়ানী জংশন ও ডিব্রুগড় সেকশনে অবস্থিত। এখান থেকে বাসে যাওয়া যায় শিবসাগর। তবে বেশী সুবিধা জোড়হাট থেকে বাসে যাওয়া। মাত্র ৩৪ মাইল পথ। নিয়মিত বাস চলাচল করে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

শিব দোল, দেবী দোল ও বিষ্ণু দোল

এই মন্দিরগুলি অহম্ রাজারা নির্মাণ করেছিলেন। বৃহৎ শিবসাগর হ্রদের তীরে এই মনোরম মন্দিরগুলি অবস্থিত।

রং ঘর

এটি একটি খোলা ময়দান, যেখানে অহম্ রাজাদের সময়ে হাতীর লড়াই, কুস্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত।

কারেং ঘর

৮ মাইল দূরে অবস্থিত এই গৃহটি অষ্টাদশ শতকে তৈরী। এটি প্রাচীন অহম্ রাজাদের রাজধানী ছিল।

জয়সাগর পুষ্করিণী

প্রায় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রুদ্র সিংহ কর্তৃক এই জলাধার ও মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।

তলাতল ঘর

টানেলের মধ্য দিয়ে যাবার পথ। ডিকো নদীর ধার দিয়ে এই ঘর। সমস্তটাই রং ঘরের সামনে অবস্থিত।

থাকবার স্থান :—

শিবসাগরে অনেক হোটেল আছে। থাকা খাওয়ার জন্য জনপ্রতি—২০—৩০ টাকা দৈনিক খরচ লাগে। এ ছাড়া সার্কিট হাউস অথবা ডাকবাংলোতেও থাকার ব্যবস্থা আছে।

ডিব্রুগড় :—

ডিব্রু ও ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গমে অবস্থিত এই শহরটি অতীব মনোরম। সর্বনাশা ব্রহ্মপুত্রের বেগকে প্রশমিত করার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে এখানে।

যানবাহন :—

জোড়হাট শহর থেকে মাত্র ৫২ মাইল, সরাসরি বাসপথে ডিব্রুগড় যুক্ত। এ ছাড়া পাণ্ডু থেকে সরাসরি রেলপথও আছে। রাজ্য পরিবহন শিবসাগর, জোড়হাট, ডিব্রুগড় প্রভৃতির মধ্যে দৈনিক বাস চালান।

থাকবার স্থান :—

কয়েকটি হোটেল আছে। এ ছাড়া সার্কিট হাউসে থাকা যায়।

ডিগবয় :—

ভারতবর্ষের বৃহত্তর তৈল শোধনাগার এবং খনিজ তৈলের ডিপো। নাহারকাটিয়াতে (২০ মাইল) নতুন তৈল খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তৈলের উৎপাদন আরও বেড়ে গেছে।

যানবাহন :—

তিনসুকিয়া থেকে ব্রাঞ্চ লাইনে ডিগবয় যাওয়া যায়। ডিব্রুগড় থেকে বাস আছে। দূরত্ব ৬০ মাইল।

থাকবার স্থান :—

থাকবার কোন জায়গা নেই, তাই, ডিব্রুগড় থেকে এখানে এসে সেইদিনই ফিরে যাওয়া বিধেয়।

॥ মণিপুর ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

মণিপুর ভারতের সঙ্গীত ও নৃত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। মণিপুরী সঙ্গীত ও মণিপুরী নৃত্য বিশ্বে বিশেষ আদরণীয়। বিশেষ পোষাকে সজ্জিত এই নৃত্য মনোমুগ্ধকর। বর্মা, আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের সঙ্গে এর সীমানা যুক্ত। মহাভারতের যুগেও মণিপুরের প্রসিদ্ধি ছিল। এখানে অর্জুন চিত্রাঙ্গদা-পুত্রের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন।

মণিপুরের চিরসবুজ রৌদ্র ঝলমল প্রান্তর আর নৃত্যের তালে তালে মৃদঙ্গ-ধ্বনি যেন দূরের পথিককে ডাক দিতে থাকে।

যানবাহন ঃ—

লামডিং-ফারকাটিং সেকশনে মণিপুর রোড স্টেশনে নামতে হয়। গৌহাটি থেকে সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ আছে। মণিপুর রোড থেকে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল ১৩৪ মাইল। নিয়মিত বাস দ্বারা যুক্ত। মণিপুর রাজ্য পরিবাহনের বাস পাওয়া যায়, যা নিয়মিত ডিমাপুর ও ইম্ফলের মধ্যে যাতায়াত করে। পথে কোহিমা হয়ে যায়। নাগাল্যাণ্ড রাজ্য পরিবহন ডিমাপুর ও কোহিমার মধ্যে বাস চালান।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

লঙ্গথাবল

শহরের চিহ্ন নেই, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে প্রথিত পাইন ও কাঁঠালগাছের বনের মধ্যে সুন্দর কতকগুলি মন্দির আছে। ইম্ফল থেকে ৫ মাইল।

মিউজিয়াম

মণিপুরের মিউজিয়ামটি দেখবার বস্তু। প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বস্তুসকল, পোশাক, চিত্রগৃহ প্রভৃতি সুন্দর। রবিবার ছাড়া প্রত্যহ খোলা থাকে।

গোবিন্দজীর মন্দির

এই স্বর্ণ মন্দিরটির বিশেষ আকর্ষণ হল, এখানে নিয়মিত রাসলীলা ও গোষ্ঠলীলা হয়। এখানকার নৃত্য দেখবার মত।

খেরামবন্ধ বাজার

ভারতের বৃহত্তম মহিলা পরিচালিত বাজার। এটাই মণিপুরের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে মণিপুরী তাঁত ও হস্তশিল্পের মনোরম নিদর্শনগুলি দেখা যায়।

উগরুল এবং মাও

উগরুল (উচ্চতা ৭০০০ ফুট) এবং মাও (উচ্চতা ৫৭৬২ ফুট) এই দুটি মণিপুরের শৈল শহর। এখানে থাকবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

থাকবার স্থান ঃ—

মণিপুরের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর হোটেল আছে। জনপ্রতি দৈনিক ২৫—৪৫ টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ে। ডাকবাংলো ও সার্কিট হাউসেও থাকবার সুবন্দোবস্ত আছে। জেলাশাসক, ইম্ফল-এর নিকট আবেদন করতে হয়। এছাড়া টুরিষ্ট হোম আছে। পাবলিসিটি অফিসার, মণিপুর সরকার, ইম্ফল-এর নিকট অনুমতি নিতে হয়।

॥ ত্রিপুরা ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ত্রিপুরায় প্রাচীনকালে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। আসামের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই প্রদেশটি বনসম্পদে পরিপূর্ণ। এখানকার সুতিবস্ত্র এবং তার উপর বোনা ডিজাইন শিল্প-রসিকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

আগরতলা :—

ত্রিপুরার রাজধানী ও বড় শহর।

যানবাহন :—

আগরতলায়, রেলপথে যাওয়া কষ্টসাধ্য। কলকাতা থেকে দৈনিক উড়োজাহাজ যায়। রেলের সুবিধা না থাকায় কলকাতা থেকে অল্প ভাড়ায় আগরতলার জন্য একটি জনতা সার্ভিস আছে। এ ছাড়া প্লেনের ভাড়াও সস্তা।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ

এই রাজপ্রাসাদটি একেবারে শহরের মধ্যে অবস্থিত। রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ১৯৪০ সালে এটি নির্মাণ করেন। বৃহৎ দুটি জলাশয় রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদ ও জলাশয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি সুন্দর মুঘল গার্ডেন আছে।

মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ

রাজপ্রাসাদ থেকে ২ মাইল দূরে শহরের পূর্বে একটি টিলার উপর অবস্থিত এই কলেজ। ১৯৪৭ সালে এই কলেজটি নির্মিত হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের জন্য এই কলেজ ভবনটি প্রসিদ্ধ।

চতুর্দশ দেবতাবাড়ী

৫ মাইল দূরের এই মন্দিরটি পুরোনো আগরতলায় অবস্থিত। প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখা যায়। আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে এখানে বিরাট মেলা বসে।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে কয়েকটি হোটেল আছে। তবে খুব ভাল হোটেল নেই। ২০—৩০ টাকা জনপ্রতি দৈনিক লাগে। এ ছাড়া সার্কিট হাউস আছে। জেলাশাসক, আগরতলার কাছে আবেদন করতে হয়। পূর্তবিভাগের ডাকবাংলোর জন্য—প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, আগরতলা, ত্রিপুরার কাছে আবেদন করতে হয়।

॥ জম্মু ও কাশ্মীর ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ভারতের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত এই রাজ্য ভূস্বর্গরূপে পরিচিত। এর প্রাকৃতিক দৃশ্য যথার্থই বিশ্বের বিস্ময়। তুষার পর্বত, চীনার পপলার বীথি বেষ্টিত উদ্যান, পাইন দেওদার অরণ্য, পদ্ম ও জলজ শৈবালে শোভিত বিশাল লেক কাশ্মীরের সম্পদ। এর নরনারী অনুপম সৌন্দর্যের প্রতীক। জম্মু, লাডাক ও কাশ্মীর এই তিনটি ইউনিট নিয়েই জম্মু কাশ্মীর রাজ্য। রাজধানী শ্রীনগর। শীতকালীন রাজধানী জম্মু। হিমালয়ের কোলে ভারতের প্রতিরক্ষায় সদাজাগ্রত এই দেশ। চীন, রাশিয়া ও পাকিস্তানের সীমানা এই রাজ্যটিকে স্পর্শ করে আছে।

জম্মু ঃ—

শক্তিশালী ডোগরা জাতির বাস এই জম্মু শহরে। বাহু বংশের একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। রাজা কৃষ্ণদেব নির্মিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। রাজা কাপুরদেব রচিত কাপুরগড় দুর্গ জম্মু থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

যানবাহন ঃ—

জম্মু কাশ্মীর যেতে হলে উত্তর রেলের পাঠানকোট শেষ রেল স্টেশন। কলকাতা থেকে সরাসরি পাঠানকোট ও জম্মু যাবার জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। কালকা মেলে গিয়ে দিল্লীতে গাড়ী বদল করে কাশ্মীর মেলেও পাঠানকোট যাওয়া যায়। দিল্লী থেকে পাঠানকোট সোজা গাড়ী আছে। বোম্বে থেকে দিল্লী আম্বালা হয়ে পাটানকোট যাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকেও দিল্লী হয়ে পাঠানকোট যাওয়া যায়। পাঠানকোট থেকে রাজ্য পরিবহনের বাস আছে। নিয়মিত পাঠানকোট ও জম্মুর মধ্যে বাস চলাচল করে। এ ছাড়া অমৃতসর থেকে সরাসরি জম্মুতে বাস যায়। কাশ্মীর যাবার পথে জম্মু অবস্থিত। এখানে

রাত্রিবাস আরামপ্রদ, কারণ এখানে একটি ডাকবাংলো আছে। দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণের পর কাশ্মীর-যাত্রীরা পাঠানকোট থেকে বাসে জম্মুতে এসে এক রাত্রির জন্য সরকারী ডাকবাংলো অথবা কোন হোটেলে বিশ্রাম নিতে পারেন। জম্মু থেকে শ্রীনগর বাস পাওয়া যায়। তবে জম্মু পৌঁছেই পরদিনের বাসের আসন সংরক্ষণ করে না রাখলে একদিন দেরী হয়ে যেতে পারে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

মানসর

২ মাইল বিস্তৃত এই হ্রদটির শোভা খুবই সুন্দর। পাশের পাহাড়গুলি পাইন গাছে ঘেরা, তার মাঝে এই ঘন নীল জলের হ্রদটি দৃষ্টিকে সহজেই আকর্ষণ করে নেয়।

শ্রীবৈষ্ণবদেবী

কাতরা হয়ে জম্মু থেকে ৩৬ মাইল দূরে এই গুহাটি অবস্থিত। সমুদ্রতল থেকে ৫৩০০ ফুট উচ্চে। এই গুহাটির দ্বার খুবই সংকীর্ণ, কিন্তু ১০০ ফুট দীর্ঘ। হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে আসেন স্নানের জন্য।

কিস্তবার

হিমালয়ের মধ্যে একটি সুন্দর হিল স্টেশন। এই স্থানটি জলবায়ু, বিশেষ-ভাবে রোগমুক্তকর জলের জন্য বিখ্যাত।

থাকবার স্থান ঃ—

জম্মুতে প্রচুর হোটেল আছে। দৈনিক জনপ্রতি ২৫—৫০ টাকা লাগে। এছাড়া বিরাট টুরিস্ট বাংলো আছে, যাতে ৫০টি ঘর আছে। খাওয়ারও সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। সরকারী ডাকবাংলোতে থেকে সন্নিকটের যে কোন রেস্তোরাঁতে খেয়ে নেওয়া যায়।

শ্রীনগর :—

কাশ্মীর রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস। কাশ্মীর ভ্যালী তার সৌন্দর্য ফুলে ফলে, তুষার পাহাড়, নদী ও লেকের জলে নিরন্তর অপরূপ মহিমায় প্রকাশ করে চলেছে।

নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত কাশ্মীর বরফের আবরণে মণ্ডিত। এপ্রিল মাসে যেন কোন যাদুকরের মোহন যাদুদণ্ড স্পর্শে চমকিত হয়ে জেগে ওঠে সে। কাশ্মীর নতুন করে তৈরী হয় পর্যটকদের গ্রহণ করার জন্য। শংকরাচার্য ও হরি-পর্বতের মধ্যে অবস্থিত এবং ঝিলম নদী দ্বারা বেষ্টিত শ্রীনগর শহরটি সৌন্দর্যে মনোরম হয়ে ওঠে।

যানবাহন ঃ—

দিল্লী, বোম্বে ও কলকাতা থেকে পাঠানকোট সরাসরি ট্রেন আছে। কলকাতা থেকে হিমগিরি এক্সপ্রেসে জম্মু যাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকে দিল্লীতে গাড়ী বদল করে পাঠানকোট যাওয়া যায়। শ্রীনগর ২৪৬ মাইল পাঠানকোট থেকে। এই পথে যাবার জন্য নিয়মিত রাজ্য সরকারের বিশেষ আরামপ্রদ বাস আছে, যা ১ ½ দিনে শ্রীনগর পৌঁছায়। অতি সকালে যাত্রা করলে শ্রীনগর পৌঁছান যায়। ১ ½ দিনে শ্রীনগর যাবার সময় বাণীহাল, বাটোট বা কুদএ রাত্রিবাস করতে হয়। পরের দিন ১২ টার মধ্যে শ্রীনগর পৌঁছান যায়। রাত্রি-বাসের জন্য এই সমস্ত জায়গায় ডাকবাংলো আছে। যে গাড়ী সকালে ছেড়ে রাত্রে শ্রীনগর পৌঁছায়, সে গাড়ীতে গেলে অচেনা জায়গায় মনোমত হোটেল ইত্যাদি রাত্রে খুঁজে নেওয়া অসুবিধাজনক হতে পারে। তাই একরাত্রি পথে বিশ্রাম নিয়ে যাওয়াই বিধেয়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

মোগল উদ্যান

প্রত্যেক রবিবার রাজ্য সরকারের আরামপ্রদ বাস মোগল উদ্যানগুলি ঘুরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনে। অনেকগুলি উদ্যান আছে। পাহাড়ের কোলে, কখনো বা ঝিলের কুলে নয়নাভিরাম উদ্যানগুলি বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প ও বৃক্ষ সমারোহ মানুষকে বিহ্বল করে তোলে।

চশমাশাহী

ডাল হ্রদের উপর হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই মোগল উদ্যানটি শ্রীনগর থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার ঝর্ণার জলে নাকি বহু অসুখ নিরাময় হয়। সম্রাট সাজাহান এই উদ্যানটি নির্মাণ করেছিলেন।

শালিমার

শ্রীনগর থেকে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত এই মোগল উদ্যানটি সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান যখন গোলাপবাগে চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করতেন তখন প্রেমের এক দিব্যলোকের সৃষ্টি হত।

নিশাত বাগ (আরামের বাগান)

শ্রীনগর থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত এই মোগল উদ্যানটি নূরজাহান-ভ্রাতা আসফজা তৈরী করেছিলেন। ইনি একজন ফুলের সমাজদার ছিলেন। পীর-পাঞ্জাল-এর তুষার-শুভ্র শিখরগুলির নীচে এই উদ্যান যে কোন পথিকের দৃষ্টি হরণ করে নেয়।

নাসীম বাগ (প্রভাতের হাওয়ার বাগান)

শালিমার উদ্যান থেকে আরও ৩ মাইল দূরে রবস্থিত এই উদ্যানটি সম্রাট আকবর নির্মাণ করেছিলেন। চীনার গাছের সমারোহ এই উদ্যানে। এখানকার দৃশ্যাবলী মনোরম।

আচ্চাবল

এটিও একটি মোগল উদ্যান। শ্রীনগর থেকে ৩৯ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি নির্মাণ করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। নূরজাহানের অতি প্রিয় ছিল এই মোগল উদ্যানটি। এখানে প্রায়ই তিনি অবসর বিনোদন করতেন। এখানকার ঝর্ণাটি সর্ব বৃহৎ এবং এই জলে ট্রাউট মাছ ধরা হয়।

শ্রীনগর যেমন ঝিলম নদীর ছোঁয়ায় চঞ্চল, তেমনি অনেকগুলি সুদৃশ্য হ্রদও শ্রীনগরের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে।

ডাল হ্রদ

তিনদিকে পাহাড়ে ঘেরা এই হ্রদটি শ্রীনগরের প্রধান সৌন্দর্য। কাশ্মীরের স্বাদু জলের হ্রদের মধ্যে এটি অন্যতম। গ্রীষ্মে যখন এই হ্রদের বুকে কাশ্মীর কমল প্রস্ফূটিত হয়, তখন জলের দৃশ্য অবর্ণনীয়। ৫ মাইল লম্বা এবং ২½ মাইল চওড়া এই প্রাকৃতিক হ্রদ সৌন্দর্যের রাণী। ডাল লেকের বাগানে প্রচুর পরিমাণে সবজির চাষ হয়। ডাল লেকের চারিদিকে অনেকগুলি মোগল উদ্যান আছে, যার সৌন্দর্য ডাল-এর সঙ্গে মিশে সমস্ত পরিবেশটিকে মোহময় করে

তোলে। ডালের তীর দিয়ে বাসে, ট্যাক্সিতে ঘোরা যায়। তবে সব থেকে ভাল বোধ হয় সিকারা (বিশেষ এক ধরনের বোট) করে ডালে ঘুরে বেড়ান। লেকের তীরের পাহাড় যখন তার তুষারের মুকুট পরে জল-দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখে তখন ভ্রাম্যমানের দৃষ্টি সৌন্দর্য-সুধায় পূর্ণ হয়ে যায়।

নেহেরু পার্ক

গাগরিবল হ্রদে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর নামে এই পার্কটি নির্মিত হয়েছে। শংকরাচার্য পাহাড়ের দিকে মুখ করে এই পার্ক দাঁড়িয়ে। এখানে জলস্কেটিং-এর ব্যবস্থা আছে।

নাগিন হ্রদ

চীনার বাগের খাল দিয়ে যুক্ত এই হ্রদটি লম্বায় প্রায় ২ মাইল ও চওড়ায় ½মাইল। সিকারা করে ঘুরে বেড়ান অতীব আনন্দদায়ক।

মানসবল

শ্রীনগর থেকে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত এই হ্রদটি অতি শান্ত ও স্থির। বসন্তের আগমনে এই হ্রদের চারপাশ মেতে ওঠে ফুল ফোটানোর খেলায়। তখন হ্রদের দৃশ্য অবিস্মরণীয়।

উলার হ্রদ

এশিয়ার বৃহত্তম সুপেয় জলের হ্রদ উলার। ১৪ মাইল দীর্ঘ এই হ্রদের চতুর্দিকের দৃশ্য আকর্ষণীয়। শ্রীনগর থেকে উলারের দূরত্ব ৩৫ মাইল। ট্যাক্সি অথবা রাজ্য সরকারের ভ্রমণ-সূচীর অন্তর্গত আরামপ্রদ বাসে গুণ্ডারবল, সোপর ও বন্দীপুর হয়ে উলার ঘুরে আসা যায়।

অপরওয়াত

১২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই হ্রদটি প্রায়শই বরফে আচ্ছাদিত থাকে। ছোট ছোট আইসবার্গ ও ভাসমান বরফ দেখা যায়।

শেষনাগ

জুন মাস পর্যন্ত বরফে ঢাকা শেষনাগ জুনের শেষে সবুজ হ্রদে পরিণত হয়। অমরনাথের পথে ১২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই হ্রদ।

কোনসরনাগ

পীরপাঞ্জাল পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত এই হ্রদ অতীব মনোরম। ১২০০০ ফুট

উচ্চে অবস্থিত এই হ্রদে জুন মাস পর্যন্ত আইসবার্গ ভেসে বেড়ায়। সেপ্টেম্বরে বরফ গলে বৃহৎ হ্রদের আকারে রূপান্তরিত হয়।

নীলনাগ

৬৮০০ ফুট উচ্চে শ্রীনগর থেকে ২১ মাইল দূরে এই হ্রদ অবস্থিত। যুশমার্গ থেকেও নীলনাগ যাওয়া যায়। ১৭ মাইল বাসের পথ আছে, বাকি পথ হয় পনি না-হয় হেঁটে যেতে হয়।

গুলমার্গ

বিশ্বের অন্যতম দর্শনীয় পার্বত্যভূমি। পাইন এবং ফারের সমারোহে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। গুলমার্গের আক্ষরিক অর্থ ফুলের বাগান। গুলমার্গ ৮৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। শ্রীনগর থেকে ২৮ মাইল। শ্রীনগর থেকে টাংমার্গ পর্যন্ত বাস আছে। তারপর বাকি ৪ মাইল পথ হয় পনিতে না হেটে যেতে হয়। অবশ্য শ্রীনগর থেকে ট্যাক্সিতে গেলে একেবারে গুলমার্গে পৌঁছান যায়। গুলমার্গের সমস্ত জায়গা অক্টোবর মাসের শেষ থেকে তুষার কার্পেটে আবৃত থাকে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদেরা বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে স্কিইং করার জন্য আসেন। এ ছাড়া এখানকার গলফ খেলার মাঠ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

এখানেও যথেষ্ট ভাল ভাল হোটেল আছে। জনপ্রতি ৩০—৬০ টাকা পর্যন্ত লাগে। এ ছাড়া সরকারী পর্যটন কুটীর, সরকারী পর্যটন বাংলো প্রভৃতিতেও থাকা যায়। সব সময় Tourist Officer, Srinagar, Kashmir-কে লেখা উচিত, যাতে আগে থেকে ব্যবস্থাদি ঠিক থাকে। গুমমার্গ থেকে যেতে হয় ১২৫০০ ফুট উচ্চে খিলানমার্গে। এখানে কেবলই বরফ। বরফের উপর স্কীইং অতীব রোমাঞ্চকর এবং আরামপ্রদ। প্রায় সবসময় বৃষ্টি হয়, তাই যেমন ঠাণ্ডা তেমনি কষ্টকর। শীতের প্রয়োজনীয় পোষাক ও বর্ষাতি নেওয়া একান্ত কর্তব্য।

পহলগাঁও

এর প্রাকৃতিক দৃশ্য কেবলমাত্র গুলমার্গের গঙ্গেই তুলনা করা যায়। শ্রীনগর থেকে ৬০ মাইল দূরে ৭২০০ ফুট উচ্চে এর অবস্থান। অমরনাথ যাবার পথে লিডার নদীর তীরে এই শহর অবস্থিত। এখান থেকে চন্দনবাড়ী প্রভৃতি উচ্চ স্থানগুলি দেখা যায়। অমরনাথ গেলে পহলগাঁও হয়ে যেতে হয়। দৈনিক

রাজ্য পরিবহনের বিশেষ আরামপ্রদ বাস শ্রীনগর থেকে পহলগাঁও যাতায়াত করে। ট্যাক্সিও ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া যায়।

গুলমার্গের মত এখানেও অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর হোটেল আছে! কলধ্বনি মুখর লিডার নদীর কূলে হোটেল থেকে জ্যোৎস্না রাতে পহলগাঁও-এর দৃশ্য নয়ন বিমুগ্ধকর। এখানেও পর্যটন কুটীর আছে। স্থান সংরক্ষণ শ্রীনগর থেকে করাই ভাল।

থাকা এবং খাবার ব্যবস্থাও আছে।

সোনমার্গ

সোনার ক্ষেত বা সোনমার্গ শ্রীনগর থেকে ৫০ মাইল দূরে ৮৭৫০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। দৈনিক বাস সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় শ্রীনগর ফিরে আসে। এখানে হিমবাহ এবং বরফের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। ফার ও পাইনের সংস্থান এবং বর্ণ-বৈচিত্র অতীব মনোমুগ্ধকর।

কোকরনাগ

অচবল থেকে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত কোকরনাগ ভৃঙ্গী ভ্যালীতে অবস্থিত। মাছের জন্য এই ভ্যালী প্রসিদ্ধ। নিয়মিত দৈনিক বাসপথে কোকরনাথ—শ্রীনগর, অনন্তনাগ ও পহলগাঁওএর সঙ্গে যুক্ত।

থাকবার স্থান ঃ—

কাশ্মীরে থাকবার প্রধান আনর্যণ হাউসবোট। অর্থাৎ জলের ওপর ভাসমান পুরো নৌকোটি—খাবার ঘর. বসবার ঘর, শোবার ঘর, বাথরুম প্রভৃতি নিয়ে তৈরী। হাউসবোট প্রধানতঃ ডাল লেকেই থাকে এবং এখানকার বোটের ভাড়া শ্রেণী অনুযায়ী বেশ বনেদী। তবে গৃহস্থ পোশাকী হাউসবোট আছে শ্রীনগর শহরের মধ্যেই ঝিলম নদীর উপর। এগুলো ডালের মত অভিজাত না হলেও একেবারে অ-কুলীনও নয়। অবশ্য ঝিলমে ২।৩টি স্পেশাল ক্লাস হাউসবোটও আছে।

এছাড়া আছে অসংখ্য হোটেল। শ্রীনগরের হোটেলগুলি বেশ ভাল এবং জন প্রতি দৈনিক ২০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ে। হাউসবোটে থাকতে গেলে জন প্রতি ৩০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ে। হাউসবোটের মালিকের

সঙ্গে একটু দরদাম করে নিলে ছাপান রেটের থেকে অনেক কমে থাকা যেতে পারে।

কাশ্মীর যাবার প্রকৃষ্ট সময় এপ্রিল—নভেম্বর। দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখবার জন্য সরকারী বাস আছে। এছাড়াও অনেকগুলি প্রাইভেট বাস কোম্পানী আছে, যারা বিশেষ আরামপ্রদ বাস চালায়। সেগুলি প্রতিদিন সকালে ছেড়ে সন্ধ্যায় শ্রীনগর ফিরে আসে। এর মধ্যে কাশ্মীর মোটর ড্রাইভার্স এ্যাসোসিয়েশন, কাশ্মীর ভ্যালী ট্রান্সপোর্ট, ডায়মণ্ড মোটর সার্ভিস, ভারত মোটর কোম্পানী প্রভৃতি অন্যতম।

॥ হিমাচল প্রদেশ ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

হিমাচল প্রদেশে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে যা পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুলু, কাংড়া, চম্বা,মানালী, সিমলা ও ডালহৌসির মত সুন্দর পার্বত্য প্রদেশ সত্যিই বিরল। তাই প্রতি বছর বহু পর্যটক বিভিন্ন দেশ থেকে ছুটে আসেন রূপবতী হিমাচলে।

কুলু ঃ—

অনেকে বলেন কাশ্মীর ভূস্বর্গ, কিন্তু আবার অনেকের মতে কুলু-মানালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনাই নেই। যাইহোক হিমালয়ের এই অঞ্চল পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। শুধু তাই নয়, ফুলে ফলে পাহাড়ে নদীতে প্রকৃতি কুলু-মানালীকে অকৃপণ হাতে সাজিয়েছেন। কুলুর সোনালী আপেল জগদ্বিখ্যাত। তাছাড়া মন্দিরের জায়গা এই কুলু। দিকে দিকে অসংখ্য মন্দির ছড়িয়ে আছে এর পথে প্রান্তরে।

কুলু উপত্যকা প্রায় ৫০ মাইল লম্বা ও ১ মাইল চওড়া ও উচ্চতা ৪০০০ ফুট। হিমালয়ের পাদদেশে এই উপত্যকার দৃশ্য অতীব মনোরম। কুলু শহরটি সুন্দরভাবে সাজান গোছান। সরকারী অফিস এবং বাসের বিশ্রামস্থল দেওদার গাছে শোভিত ঢোলপুর ময়দানে। এর উপরেই টুরিস্ট বাংলোটির দৃশ্য সুন্দর। কুলুর প্রসিদ্ধ উৎসব 'দশেরা' প্রতি বছর দুর্গাপূজার বিজয়ার দিন শুরু হয়। দশেরা উৎসবের দৃশ্য অবর্ণনীয়। এত বিচিত্র বর্ণের শোভা ও সমারোহ এখানকার আর কোন উৎসবে দেখা যায় না। বিভিন্ন গ্রাম থেকে শোভাযাত্রা সহকারে দেবতাদের নিয়ে আসা হয়। যাঁরা নিয়ে আসেন তাঁরা স্থানীয় ঝলমলে পোশাকে সজ্জিত থাকেন। নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকে। যখন সমস্ত দর্শক একত্রিত হন এবং 'দশেরা' উৎসব শুরু হয়, তখন মনে হয় প্রকৃতিও যেন তাঁদের আনন্দের অংশীদার হয়েছে। সমগ্র উপত্যকা এক গভীর উন্মাদনায় মেতে ওঠে। রাত্রে একটি উন্মুক্ত মঞ্চে বিভিন্ন পাহাড়ী

লোকশিল্পীর দল নৃত্য গীতাদি করেন। পার্বত্য পরিবেশে নর্তক নর্তকীর নৃত্য অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে।

যানবাহন ঃ—

কুলু যাবার সব থেকে সহজতম পথ—চণ্ডীগড় থেকে উড়োজাহাজে কুলু যাওয়া। সপ্তাহে দুদিন, এপ্রিল—জুন এবং সেপ্টেম্বর—অক্টোবর মাসে এই উড়োজাহাজ যাতায়াত করে এবং ভাড়াও (যাতায়াত) মাত্র ৭০ টাকা। তবে যাঁরা পথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান তাঁদের পক্ষে বাসে বা ট্যাক্সি করে যাওয়াই শ্রেয়। কুলু যাবার অনেকগুলি রাস্তা আছে—(১) হাওড়া থেকে দিল্লী গিয়ে, সেখান থেকে কাশ্মীর মেল অথবা শ্রীনগর এক্সপ্রেসে পাঠানকোট পর্যন্ত যাওয়া যায়। তারপর ছোট ট্রেনে যোগীন্দরনগর পর্যন্ত যাওয়া যায়। ওখান থেকে কুলু বাসে যেতে হয়। পাঠানকোট থেকে সরাসরি বাসেও কুলু যাওয়া যায়। কুলু রোড ট্রান্সপোর্টের বাস নিয়মিত পাঠানকোট ও কুলুর মধ্যে যাতায়াত করে। মাদ্রাজ ও বোম্বে থেকে দিল্লী হয়ে পাঠানকোট যাওয়া যায়। (২) হাওড়া-কালকা মেলে চণ্ডীগড় যাওয়া যায়। বোম্বে ও মাদ্রাজ থেকে অনুরূপভাবে চণ্ডীগড় পৌঁছান যায়। এখান থেকে হিমাচল সরকার ও পাঞ্জাব সরকারের বাস দৈনিক চণ্ডীগড় ও কুলুর মধ্যে যাতায়াত করে। (৩) হাওড়া কালকা মেলে কালকাতে নেমে ছোট ছোট ট্রেন ধরে সিমলা যাওয়া যায়। সিমলা থেকে হিমাচল রাজ্য পরিবহনের বাস দৈনিক কুলু যাতায়াত করে। (৪) শিয়ালদা থেকে, শিয়ালদা-পাঠানকোট এক্সপ্রেস সরাসরি পাঠানকোট পৌঁছান যায়। সেখান থেকে বাসে কুলু যাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

কাতরাইন ও নগর

কাতরাইন কুলু থেকে ১২ মাইল মাত্র। অপরূপা বিপাশা নদী সর্বদা পাশে পাশে চলে। এখানে মধুমক্ষিকার চাষ হয় এবং ট্রাউট মাছ পালন করা হয়। নগর, কাতরাইন থেকে ৩½ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে কুলু রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখনও এখানে কাঠের গুঁড়ির তৈরী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এ ছাড়া 'রোয়েরিকের' নামের সঙ্গেও নগর জড়িত। রাশিয়ান শিল্পী রোয়েরিক এই সুদুর্গম পার্বত্য-লীলাভূমিকে তাঁর শিল্প-সৃষ্টির

ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেন। তাঁর সৃষ্ট শিল্প নিদর্শনগুলি নগরের এস্টেট হলে রক্ষিত আছে। নগরের প্রাকৃতিক শোভা অবর্ণনীয়।

মণিকরন

মণিকরন কুলু থেকে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। বাস রাস্তা আছে। কুলু থেকে নিয়মিত বাস যায়। কিন্তু শেষ ২ ফার্লং হেঁটে যেতে হয়। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবন প্রসিদ্ধ। তাছাড়া পিন পার্বতী গিরিপথ ও পুলগা গিরিপথের মধ্য দিয়ে হাঁটা অতীব মনোরম।

থাকবার স্থান ঃ—

হিমালয়ের সর্বত্রই থাকবার খাবার মনোরম আয়োজন। হিমাচল সরকার প্রায় প্রতিটি পর্যটক-আকর্ষণকারী স্থানেই পর্যটন বাংলোর ব্যবস্থা করেছেন। এখানে বিছানা ও আসবাব সহ ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া প্রায় সর্বত্র ঘর পিছু (বাথরুম সহ) দুজনের ২০ টাকার মধ্যে। খাবার জন্য আলাদা চার্জ লাগে। কুলুতেও পর্যটন বিভাগের ডাকবাংলো আছে। পূর্তবিভাগের বিশ্রামাগারও আছে। এই দুই জায়গার জন্যই টুরিস্ট অফিসার, কুলু, এইচ, পি-কে লিখতে হয়। আগে থেকে স্থান সংরক্ষণ করে যাওয়াই উচিত। এছাড়া ট্রাভেলার্স লজ-এও থাকবার জায়গা আছে। দুজনের জন্য খরচ লাগে ১০ টাকা। ম্যানেজারের নিকট লিখতে হয়। এছাড়া অ্যালুমিনিয়ম হাট, লগহাট, পূর্ত-বিভাগের বিশ্রামাগার প্রভৃতিতে থাকবার জায়গা আছে। সর্বক্ষেত্রেই টুরিস্ট অফিসার, কুলুর নিকট স্থান সংরক্ষণ করা উচিত। কাতরাইন, নগর, মণিকরনে থাকতে হলেও টুরিস্ট অফিসার, টুরিস্ট ব্যুরো, কুলু, এইচ, পি-কে লিখতে হয়। অনেক আগে থেকে চিঠিতে যোগাযোগ না করলে স্থান পাওয়া দুষ্কর।

মানালী ঃ—

মানালী যাবার দুটি সময়। এপ্রিল—জুন এবং সেপ্টেম্বর—নভেম্বর। উচ্চতায় ৬০০০ ফুট। হিমালয়ের তুষারমৌলীর পাদদেশে অবস্থিত বলে স্বভাবতই এখানে ঠাণ্ডা বেশী। বৃষ্টি হলে এ ঠাণ্ডা আরও বাড়ে। কুলু উপত্যকার বৈশিষ্ট্য এখানেও আছে। এখানে পাইন অরণ্য এবং আপেলের বাগান দেখা যায়। সোনাল ও লাল এই দু'রকম আপেল পাওয়া যায়। এছাড়া এপ্রিকট, পীচ, চেরী প্রভৃতি ফলও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কুলু

মানালীর দৃশ্য এত মনোরম হবার কারণ বিপাশা নদী এই উপত্যকাকে সবুজ করে রেখেছে। এছাড়া বর্ষণের ফলে প্রতিটি পর্বতে দেবদারু, পাইন প্রভৃতি গাছের সমারোহ। তাই সবুজের দৃশ্য সব সময় দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

মানালীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের তুলনা নেই। অবসর বিশ্রামের এক সুন্দর জায়গা। শহরের ব্যস্ততা নেই, নেই গাড়ী ঘোড়ার তীব্র উচ্চকিত আর্তনাদ। আছে শুধু প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তুষারমৌলী হিমালয় এবং শ্যামকান্তিময় অরণ্যকে অনুভব করা। যে কোন হোটেল বা থাকবার জায়গা থেকেই চিরতুষার হিমালয়ের দৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে যদি শরৎ-পূর্ণিমার সময় হয় তবে আর কথা নেই। এক মোহিনী মায়ায় চন্দ্রকিরণ সমগ্র উপত্যকাকে ছেয়ে ফেলে। বিপাশা নদী নূপুরের ধ্বনি তুলে উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে চলে নিরবধিকাল।

যানবাহন ঃ—

মানালী কুলু থেকে ২৪ মাইল। কুলু থেকে নিয়মিত মাণ্ডি-কুলু রোড ট্রান্সপোর্টের বাস আছে। এছাড়া সরাসরি পাঠানকোট, মাণ্ডি, সিমলা, চণ্ডীগড়-এর সঙ্গে মানালীর বাস যোগাযোগ আছে কুলু হয়ে। এখানেও কুলুর মত ট্রেন ও বাসের সব ক'টি পথ দিয়েই আসা আয়। কারণ কুলু হয়েই মানালী আসতে হয়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

রাহালা

বিখ্যাত রোটাং গিরিপথের পাদদেশে অবস্থিত এই স্থানটির উচ্চতা ৮৫০০ ফুট। এপ্রিল—জুন ও সেপ্টেম্বর—নভেম্বরে মানালী থেকে বাস পাওয়া যায়। এখানে একটি জলপ্রপাত আছে।

রোটাং গিরিপথ

মানালী থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই গিরিপথ। উচ্চতা ১৩৪০০ ফুট। ঠাণ্ডা এখানে অত্যধিক। যথেষ্ট পরিমাণে গরম কাপড় সঙ্গে এবং অঙ্গে রাখা প্রয়োজন। এপ্রিল—জুন ও সেপ্টেম্বর—নমেম্বরে এখানে বাস যায়। মাণ্ডি-কুলু রোড ট্রান্সপোর্টের বাস ছাড়াও হিমাচল সরকারের বিশেষ আরামপ্রদ বাস যাতায়াত করে। এখানে ঈগলু ধরণের একটা আস্তানা আছে। তার

ভেতর পাহাড়ী মেয়ে বা পুরুষ যাত্রীদের চা বা কফি বানিয়ে দেয়। এখানে যেতে হলে খাবার সঙ্গে রাখা প্রয়োজন। এখান থেকে চিরতুষার হিমালয়ের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। রোটাং হয়ে বাস কেলাং পর্যন্ত যায়। তারপর চীনের সীমানা, তাই এই রাস্তাটি আমাদের প্রতিরক্ষার জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

হিড়িম্বা মন্দির

মহাভারত কথিত হিড়িম্বা রাক্ষসীর বাসস্থান ছিল এখানে। চারিদিকে দেবদারু গাছের সমারোহ। গভীর জঙ্গলে এই মন্দির অবস্থিত। এর দূরত্ব মানালী থেকে ৩ মাইল। পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বিপাশা নদীর তীর দিয়ে এই রাস্তা। চারিদিকের দৃশ্য এত সুন্দর যে মনেই হয় না এত কষ্টসাধ্য এই পার্বত্য পথ পার হয়ে চলেছি।

বশিষ্ঠ আশ্রম

বিপাশা নদীর পারে এই বশিষ্ঠ আশ্রম। কথিত আছে এখানে ঋষি বশিষ্ঠ তপস্যা করেছিলেন। এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবন আছে। পুরুষ ও মহিলাদের স্নানের সুবিধার জন্য আলাদা আলাদা স্নানঘর নির্মিত হয়েছে। মানালী থেকে এর দূরত্ব মাত্র ২ মাইল।

থাকবার স্থান ঃ—

মানালীতে সরকারী বাংলো ছাড়াও টুরিস্ট লজ, এ্যালুমিনিয়াম হাট, লগহাট প্রভৃতিতে থাকা যায়। অনুমতি নিতে হয়—Tourist Officer, Manali, H. P.-র কাছ থেকে।

ধরমশালা ঃ—

ধরমশালা কাংড়া জেলার সদর দপ্তর। এই স্থান থেকে কাংড়া উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুবিধা আছে। এর শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি বিশেষ আকর্ষণীয়। ধরমশালার উচ্চতা ৪১০০ ফুট।

যানবাহন ঃ—

ধরমশালায় যাবার জন্য পাঠানকোট থেকে সরাসরি বাস আছে। তাছাড়া পাঠানকোট-যোগীন্দরনগর ছোট রেলে কাংড়া নিকটস্থ রেল স্টেশন। এখান থেকে ধরমশালা ১৬ মাইল। কিন্তু পাঠানকোট হয়ে বাসে আসাই সুবিধা।

ধরমশালা থেকে পাঠানকোটের দূরত্ব ৫৬ মাইল। ধরমশালা বাসপথে চণ্ডীগড়, ডালহৌসি, সিমলা, বৈজনাথ, পালামপুর, কুলু মানালি, মাণ্ডি, কাংড়া, জ্বালামুখী, প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। রাস্তা ভাল, দৃশ্য সুন্দর। কিন্তু মাণ্ডি-কুলু রোড ট্রান্সপোর্টের বাসগুলি সবসময় আশানুরূপ নয়। সরকারী আরামপ্রদ বাসের প্রবর্তন হওয়া উচিত।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

পালামপুর ঃ—

ধরমশালা থেকে ৩২ মাইল দূরে সুন্দর এই সেনানিবাসটি দেখার মত। এখানে চা বাগান আগে। আবহাওয়া অতি সুন্দর। ততোধিক সুন্দর এখানের পর্যটন বাংলোটি। দুজনের থাকার জন্য ১২ টাকা লাগে। ধরমশালা থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

কাংড়া

১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি বজ্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। নিয়মিত বাস আছে ধরমশালা থেকে। এই মন্দিরের গঠনরীতিটি সুন্দর। তাছাড়া এখান থেকে ১২ মাইল পায়ে চলা পথে পড়ে বিখ্যাত কাংড়া দুর্গটি। হাজার বছর আগে কাংড়া রাজাদের তৈরী এই দুর্গ। এর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান।

জ্বালামুখী

ধরমশালা থেকে প্রায় ৩৭ মাইল দূরে অবস্থিত এই শহর জ্বালামুখী যোগীন্দরনগর রেলপথের একটি স্টেশন। তবে বাসে যাওয়াই সুবিধা। এটি সতীর ৫২ পীঠের একটি। এখানকার মন্দিরের অনির্বাণ শিখা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই এই মন্দিরটি দেখতে আসেন। সম্রাট আকবর, রাজা রণজিৎ সিং, রাজা সংসারচাঁদ প্রভৃতি এই মন্দির দেখতে এসেছিলেন। মন্দিরটি কিন্তু আকারে বিশেষ বড় নয়। এখানে এপ্রিল মাসে মেলা বসে।

বৈজনাথ

ধরমশালা থেকে এর দূরত্ব ৪২ মাইল। ধরমশালা-মাণ্ডি প্রধান সড়কের

উপর বৈজনাথ অবস্থিত। বৈজনাথে দুটি মন্দির আছে যা ২০০০ বছরের পুরানো বলে অনুমান করা হয়। ধরমশালা থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

যোগীন্দরনগর

ধরমধালা থেকে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি হিমালয়ের জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্য প্রসিদ্ধ। তাছাড়া হিমালয়ের কোলে এর প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। পাঠানকোট থেকে ছোট রেলে যোগীন্দরনগরে আসা যায়। পথের দুধারের দৃশ্য ভোলবার নয়। এছাড়া বাসে ধরমশালা থেকে যোগীন্দরনগর আসা যায়। নিয়মিত বাস আছে। এখানকার পর্যটন বাংলোটিও অতি সুন্দর।

থাকবার স্থান ঃ—

ধরমশালায় উৎকৃষ্ট হোটেলের খুব অভাব।

গভর্নমেণ্ট টুরিস্ট বাংলো আছে। থাকা খাবার চমৎকার ব্যবস্থা। স্থান সংরক্ষণের জন্য আগে থেকে টুরিস্ট অফিসার, ধরমশালা, হিমাচল প্রদেশকে লিখতে হয়।

ডালহৌসী ঃ—

ইংরাজ আমলের একটি স্বাস্থ্যনিবাস। কিন্তু স্বাধীনতার পর সেনানিবাসে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি ইংরাজরা সিমলার অনুকরণে নির্মাণ করেছিল। পাইন ও দেবদারু শোভিত, হিমালয়ের তুষার-দৃশ্যে উজ্জ্বল, কোলাহলহীন এই শৈল শহরটি ছুটি উপভোগের পক্ষে আদর্শস্থানীয়।

যানবাহন ঃ—

পাঠানকোট থেকে ডালহৌসীর দূরত্ব ৫০ মাইল। সুন্দর চম্বা উপত্যকার মধ্য দিয়ে এই রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে। পাঠানকোট এবং জলন্ধর থেকে দৈনিক বাস আছে যা ডালহৌসী যাতায়াত করে। ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। অমৃতসর থেকেও পাঠানকোট হয়ে ডালহৌসী যাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

শহরের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় জীপে অথবা পদব্রজে যাওয়া যায়। এর মধ্যে জলগ্রী ঘাট, পুঞ্জ পুল্লা, সাতধারা, সুভাষ বাওলি প্রসিদ্ধ।

থাকবার স্থান ঃ—

ডালহৌসিতে কয়েকটি সুন্দর হোটেল আছে। থাকবার জন্য জনপ্রতি দৈনিক ১২ থেকে ২০ টাকার মত লাগে। ডালহৌসী ক্লাবেও থাকবার জায়গা আছে। পূর্তবিভাগের বিশ্রামাগার আছে। পর্যটন বাংলো, পর্যটন গৃহ প্রভৃতিতেও থাকা যায়। এগুলির জন্য টুরিস্ট অফিসার, ডালহৌসীর নিকট লিখতে হয়।

কশৌলি ঃ—

কালকা-সিমলা রুটের একটি স্টেশন। এই স্থানের হিমালয়-দৃশ্য অতীব মনোরম। এখানে জলাতংক রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল আছে এবং কলেরা প্রভৃতি মহামারীর প্রতিষেধক তৈরী হয়।

যানবাহন ঃ—

হাওড়া থেকে দিল্লী হয়ে কালকা পর্যন্ত রেল রাস্তা আছে। তারপর কালকা থেকে সিমলার ছোট গাড়ীতে করে এখানে যাওয়া যায়। তাছাড়া কালকা থেকে বাসও এখানে যায়। এখানে নিকটতম রেল স্টেশনটি হল ধরমপুর। নিয়মিত বাস ধরমপুর, কালকা, চণ্ডীগড়, সিমলা ও মানালীর মধ্যে যাতায়াত করে। ধরমপুর থেকে কশৌলির দূরত্ব মাত্র ৪ মাইল।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ

কেন্দ্রীয় গবেষণা ভবন

শহর থেকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত, সাপের ও কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ঔষধ তৈরী হয়। এছাড়া গিলবার্ট পাহাড়, মাংকি পয়েন্ট প্রভৃতি কয়েকটি জায়গা থেকে পর্বত উপত্যকার দৃশ্য দেখা যায়।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে কয়েকটি হোটেল আছে। দৈনিক জনপ্রতি ২৫ থেকে ৪৫ টাকা পর্যন্ত লাগে থাকা এবং খাবার জন্য। এছাড়া পূর্তবিভাগের বিশ্রামালয় আছে। Executive Engineer, P. W. D., Kasauli Sub Division, H. P-কে লিখতে হয়। এছাড়া ডাকবাংলো আছে। Tourist Officer, Kasauli-কে লিখতে হয়। অনেক বেসরকারী গৃহ ও ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যায়।

সিমলা ঃ—

সিমলা ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ পার্বত্য শহর। পরিষ্কার, ছিমছাম, সাজানো শহর এই সিমলা। এককালে এর গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। শুধুমাত্র পাঞ্জাবের গ্রীষ্মাবাসই ছিল না, ভারতের সরকারের গ্রীষ্মাবাসও ছিল এই শৈল শহরটি। সুতরাং কৌলিন্যের দিক থেকে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। স্বাধীনতার পরও এর গুরুত্ব আদৌ না কমে বেড়ে গেছে। এটা হিমাচলের গ্রীষ্মবাস, পাঞ্জাবের গ্রীষ্মবাস ও ভারত সরকারের গ্রীষ্মাবাস। তবে আগের মত প্রতি বছর লোকলস্কর সহ সমগ্র পার্লামেণ্ট সিমলায় যায় না। এমন কি রাষ্ট্রপতি ভবনটিও শিক্ষার অনুরাগী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান উচ্চতর গবেষণার জন্য দান করে গিয়েছেন।

যানবাহন ঃ—

কলকাতা থেকে সরাসরি কালকা মেল দিল্লী হয়ে কালকা যায়। এখন থেকে সিমলা ৫৬ মাইল। কালকা থেকে সিমলা ছোট গাড়ি আছে। পথে তুশোর উপর টানেল পড়ে, যার মধ্য দিয়ে গাড়ীতে যাওয়া অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এছাড়া নিয়মিত হিমাচল রাজ্য পরিবহনের বাস কালকা থেকে সিমলার মধ্যে যাতায়াত করে। এখানে বেড়ানোর পক্ষে এপ্রিল—জুন এবং সেপ্টেম্বর—নভেম্বর প্রকৃষ্ট সময়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

সামার হিল

সিমলার এই শহরতলির দূরত্ব ৩ মাইল। হেঁটে বেড়াবার পক্ষে আদর্শ স্থান। গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতে খুবই আরাম লাগে।

জাকু হিল

রিজ এবং চার্চের পাশের রাস্তা দিয়ে এই পাহাড়ে ওঠা যায়। সিমলার সব থেকে উঁচু পাহাড় এটি। এখান থেকে সিমলা শহরটি সুন্দর দেখায়। এখানে একটি হনুমান মন্দির আছে। ১ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত।

প্রসপেক্ট হিল

শহর থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। চড়ুইভাতির জন্য একটি আদর্শ স্থান। এখান থেকে চারদিকের দৃশ্য অতি মনোরম।

তারাদেবী

২ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর এই মন্দিরটির অবস্থিতি। স্কাউট এর কেন্দ্রীয় দপ্তর।

তপ্তপানী

৩২ মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থানে একটি উষ্ণ প্রস্রবন আছে। নিয়মিত বাস চলাচল করে।

কুফরী

শীতকালে বরফের উপর স্কী খেলার আদর্শ জায়গা। সিমলা থেকে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। নিয়মিত বাস যায়।

নারকাণ্ডা

সিমলার সব থেকে জনপ্রিয় পর্যটন স্থান। এখান থেকে চিরতুষার হিমালয়ের দৃশ্য মনোরম। এটি ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার

বর্ষার পর বিচিত্র ফুলের সমারোহ হয় এখানে। নিয়মিত বাস সার্ভিস আছে।

রাষ্ট্রপতি ভবন

শহরের মধ্যে অবস্থিত। বর্তমানে উচ্চ গবেষণার জন্য এই বাড়ীটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাতের সিমলা

ছোট সিমলার দিকে নেমে গিয়ে একটি স্থান আছে, যেখান থেকে রাতে সিমলা শহরের দিকে তাকালে মনে হবে আকাশে অগণিত নক্ষত্র জলজল করে জলছে।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে একাধিক উন্নত ধরনের ভাল ভাল হোটেল আছে। জন প্রতি দৈনিক ৩০ থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত থাকা এবং খাবার জন্য লাগে। হিমাচল সরকারী পর্যটন বাংলোতেও থাকা যায়। Tourist officer, Tourist Dept. Simla-র কাছ থেকে পূর্বে স্থান সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া

Y.W.C.A. এবং Y.M.C.Aতেও থাকার জায়গা আছে। সরাসরি ম্যানেজারকে লিখতে হয়। অনেকগুলি ধর্মশালাও আছে। সিমলার কালীবাড়ীতেও দিল্লীর মত থাকবার ব্যবস্থা আছে, থাকবার ঘর আছে কিন্তু বাথরুম ঘর-সংলগ্ন নয়। এখানে বাঙালী-খাবার পাওয়া যায়। প্রতিটি মিল ৩ টাকার মত লাগে। চা জলখাবারও পাওয়া যায়।

চণ্ডীগড় :—

চণ্ডীগড় প্রাচীন শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এটি চণ্ডীদেবীর পীঠস্থান। ১৯৪৭-এ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নতুন রাজধানী গঠনের উদ্দেশ্যে নতুন জায়গার অন্বেষণ হয়। সব থেকে উপযুক্ত বিবেচনা করে চণ্ডীগড়কে নির্বাচন করা হয়। ফরাসী স্থপতি লা করবুসিয়ের কয়েকজন ইংরেজ এবং কয়েকজন ভারতীয় স্থপতির সহযোগিতায় নির্মাণ করেন বর্তমানের আধুনিক চণ্ডীগড় শহরটি। এটি হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবের রাজধানী।

যানবাহন :—

দিল্লী-কালকা রুটে চণ্ডীগড় একটি বড় স্টেশন। কলকাতা থেকে সরাসরি কালকা মেলে চণ্ডীগড় যাওয়া যায়। বোম্বাই মাদ্রাজ থেকে দিল্লী এবং আম্বালা জংশন হয়ে চণ্ডীগড় যাওয়া যায়। এছাড়া চণ্ডীগড় নিয়মিত বাসপথে মানালী, কুলু, সিমলা, দিল্লী, নাঙ্গাল, অমৃতসর, ধরমশালা এবং পাঠানকোটের সঙ্গে যুক্ত। দিল্লী এবং চণ্ডীগড়ের মধ্যে নিয়মিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষ আরামপ্রদ বাসও যাতায়াত করে। শহরে ট্যাক্সি, স্কুটার, এবং রিক্সাও পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

শহরের রাস্তাঘাট দেখবার মত। প্রায় প্রতি রাস্তাই প্রশস্ত এবং পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল। বেসরকারী বাড়ী ও কেরানীদের কোয়ার্টারগুলি এক বিশেষ রীতিতে তৈরী। শহরটি ঘুরে দেখবার মত।

ন্যায়ালয় ভবন

এই ভবনটি বৃহৎ ; উচ্চ এবং আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। ন্যায়াধীশের ঘর অতি মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত।

শুখনা হ্রদ

চণ্ডীগড় শহরের আসল দৃশ্য এই লেক। বিকালে অফিস ফেরৎ জনসাধারণ এখানে উন্মুক্ত হ্রদটির ধারে বিশ্রাম ও ভ্রমণ করে ক্লান্তি দূর করেন। তাছাড়া এখানে সুইমিং পুল থাকায় সন্ধ্যার পর এর দৃশ্য মনোরম।

মহাকরণ ও বিধানসভা ভবন

এই দুটি ভবনই আধুনিক স্থাপত্যে এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম ও সেরা। রৌদ্র প্রতিরোধ করার জন্য এক বিশেষ রীতিতে গঠিত এই ভবনদ্বয়। সূর্যাতপ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই গ্রহণ করা হয়েছে।

গোলাপ বাগ

আর্ট গ্যালারীর উল্টোদিকে গোলাপ বাগটি এশিয়ার বৃহত্তম বাগান। কয়েক মাইল আয়তন বিশিষ্ট এই বাগানে পৃথিবীর প্রায় সব রকমের গোলাপ ফুলই দেখা যায়। বিভিন্ন বর্ণের ফুল দেখার জন্য শীতকালই প্রকৃষ্ট সময়। এই বাগানটি চণ্ডীগড়ের অবশ্য দর্শনীয় স্থান।

বিশ্ববিদ্যালয় ভবন

এই ভবনটিরও গঠনশৈলী নূতন ও বৃহৎ। আধুনিক স্থাপত্য রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে কতকগুলি ভাল ভাল হোটেল আছে যেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরও পাওয়া যায়। জনপ্রতি দৈনিক ৭০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত লাগে। সাধারণ হোটেলও কয়েকটি আছে, যেখানে জনপ্রতি ২০ থেকে ৪০ টাকা লাগে। এ ছাড়া অন্যান্য অনেকগুলি থাকবার জায়গা আছে। (১) পাঞ্জাব সরকারের গেস্ট হাউস। ম্যানেজার-এর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয় (২) এম, এল, এ, হোস্টেলে (পুরাতন) থাকতে হলে, Caretaker, M. L. A. Hostel (old) Sec. 4, Chandigarh-এর অনুমতি নিতে হয়। (৩) এম, এল, এ, হোস্টেলে (নূতন)—Reception officer, M.L.A. Hostel (New) Sec. 3. Chandigarh-এর কাছে আবেদন করতে হয়। (৪) ইন্দিরা হলিডে হোম। এখানে ২৫ জনের থাকার জন্য ব্যবস্থা আছে। পরিবার সহ থাকার অসুবিধা। Caretaker,

India Holiday Home, Sec. 24. Chandigarhকে লিখতে হয়। (৫) পঞ্চায়েত ভবনে থাকতে হলে ম্যানেজারের কাছে লিখতে হয়। সেক্টর ১৮, চণ্ডীগড়। এছাড়া থাকার জন্য বেসরকারী গৃহও ভাড়া পাওয়া যায়। এরজন্য পর্যটন দপ্তর, বাসস্ট্যাণ্ড, সেক্টর ১৭, চণ্ডীগড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ ঃ—

ভাকরা এবং নাঙ্গাল ছুটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও জলসংরক্ষণ স্থান। শতদ্রু নদীতে বাঁধ দিয়ে এই জল সঞ্চয় করা হয় এবং সময় মত টারবাইনের মধ্য দিয়ে ছেড়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

যানবাহন ঃ—

এই বাঁধে যাবার নিকটস্থ রেল স্টেশন হল নাঙ্গাল। দিল্লী থেকে দৈনিক নাঙ্গাল এক্সপ্রেসে এখানে যাওয়া যায়। তবে ট্রেনে যাওয়ার থেকে বাসে যাওয়াই সুবিধাজনক। নাঙ্গাল বাসপথে দিল্লী, জলন্ধর, অমৃতসর, পাতিয়ালা, আম্বালা, চণ্ডীগড়, পাঠানকোট প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। দৈনিক ৮টি বাস ভাকরা এবং নাঙ্গালের মধ্যে চলাচল করে। এছাড়া ভাকরা শাসকগোষ্ঠীর ৩টি কনডাক্টেড ট্যুর আছে। দৈনিক ১০টা, ১টা ও ৪টার সময় বাস ছাড়ে। জনপ্রতি ২ টাকা ভাড়া। ট্যুরিস্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

নাঙ্গাল বাঁধ

৯৫ ফুট উচ্চ ও ১০০০ ফুট লম্বা এই বাঁধটি এশিয়ার বিস্ময়। এর জলধারা গাঙ্গুওয়াল ও কোটলায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপন্ন করে।

ভাকরা বাঁধ

ভাকরা, নাঙ্গাল থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে। নিয়মিত বাস ও ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। ভাকরা যাবার পথে ভাকরা ম্যানেজমেণ্ট বোর্ড-এর জনসংযোগ অফিসারের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিতে হয়। ভাকরা বাঁধটি বিশ্বের উচ্চতম বাঁধ। উচ্চতায় ৭৫০ ফুট। বিপুল আকারের 'ভি'এর মত কংক্রিকেট বাঁধটি রিশ্বের বিস্ময়। গুরুগোবিন্দের নামানুসারে এর নাম রাখা হয়েছে

'গোবিন্দসাগর'। ভাকরা ও নাঙ্গালের জলবিদ্যুৎ পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ হরিয়ানা, রাজস্থান ও দিল্লীকে বিদ্যুৎ তরঙ্গায়িত করছে।

থাকবার স্থান ঃ—

দু-একটি হোটেল আছে। দৈনিক জনপ্রতি ১০ টাকা খরচ লাগে দুটি গেস্ট হাউস আছে। একটি উত্তর-পূর্বে ও অপরটি পশ্চিমে। থাকবার জন্য Executive Engineer, Nangal Township, Nangal'কে লিখতে হয়। টুরিস্ট বাংলো পাওয়া যায়। অনুমতি নিতে হয়, টুরিস্ট অফিসার, টুরিস্ট ব্যুরো, নাঙ্গাল। এছাড়া ধর্মশালা ও অন্যান্য গেস্ট হাউস আছে।

॥ পাঞ্জাব ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

পঞ্চনদের মনোরম দেশ এই পাঞ্জাব। ভারতের বহু উত্থান পতনের ইতিহাসের সঙ্গে পাঞ্জাবের ইতিহাস জড়িত। শক, হূণ, পাঠান, মোগল, সকল দলই এই পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে এসে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই পঞ্চনদের তীরেই ঋকবেদের সৃষ্টি। শিখ গুরুগণ ও মহারাজা রণজিৎ সিংএর বাসস্থান এই পাঞ্জাব। এর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও মনোরম। বর্তমানের পাঞ্জাব 'সবুজ বিপ্লবের' পীঠস্থান। বারবার খণ্ডিত হয়েও বর্তমানে যে অংশ অবশিষ্ট আছে তার মূল্য ভারতবর্ষে কম নয়। ভারতের প্রতিরক্ষায় ও কৃষিবিপ্লবে পাঞ্জাব সর্বাগ্রে!

অমৃতসর :—

পাঞ্জাবের বর্তমান রাজধানী চণ্ডীগড়, বা হিমাচল প্রদেশেরও রাজধানী। (চণ্ডীগড় বর্ণনা আগে দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর অমৃতসর বা অমৃতের সরোবর। এখানকার স্বর্ণমন্দির শিখদের অন্যতম পীঠস্থান।

যানবাহন :—

দিল্লী থেকে অমৃতসর সরাসরি রেল যোগাযোগ আছে। বোম্বাই থেকে ফ্রন্টিয়ার মেল, পাঞ্জাব এক্সপ্রেস প্রভৃতি সরাসরি গাড়ী আছে। মাদ্রাজ থেকে দিল্লী হয়ে অমৃতসর যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে অমৃতসর মেলে সরাসরি অমৃতসর পৌঁছান যায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেস-এ দিল্লী হয়ে অমৃতসর যাওয়া যায়। অমৃতসর উত্তর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন। এছাড়া দূরপাল্লার বাসেও সরাসরি অমৃতসর যাওয়া যায়। পাঠানকোট, আম্বালা, জম্মু, ফিরোজপুর, চণ্ডীগড়, জলন্ধর, দিল্লী প্রভৃতির সঙ্গে অমৃতসরের সরাসরি দ্রুতগতিসম্পন্ন বাস যোগাযোগ আছে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

স্বর্ণ মন্দির

চতুর্থ শিখ গুরু রামদাস ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি পুকুর খনন করেন, তাই জায়গাটির নাম হয় রামদাসপুর। পঞ্চম শিখ গুরু এখানে একটি মন্দিল নির্মাণ করেন। গুরু অর্জুন পুকুরের জল পবিত্র করে সেটির নামানুসারে শহরের নামকরণ করেন অমৃতসর। কিন্তু এই মন্দিরটি মুসলমান অত্যাচারী আহমদ শাহ আব্‌দালীর আঘাতে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংস হয়। পরে মহারাজা রণজিৎ সিং বর্তমানের মন্দিরটি শ্বেত পাথরে নির্মাণ করে গম্বুজটি সোনার পাতে মুড়ে দেন। তাই এর নাম স্বর্ণ মন্দির। দেওয়ালীর সময় এই মন্দিরের আলোকসজ্জা ও আতসবাজীর সমারোহ সমগ্র শহরকে আলোড়িত করে।

গোবিন্দগড়

রেলপথের উল্টোদিকে গোবিন্দগড় দুর্গটি শিখদের নির্মিত প্রথম দুর্গ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং এই দুর্গ টি দখল করে তাঁর ধনসম্পদ রাখতেন।

রামবাগ উদ্যান

নগরের ভেতরে এই উদ্যানটি বিচিত্র বর্ণের ফুলের সমারোহে পূর্ণ। রণজিৎ সিং-এর আদেশে রামবাগ উদ্যান তৈরী হয়। এখানে তাঁর সর্দারগণ ও ব্রাহ্মণ সেনাপতির বিশ্রামশালা ছিল।

দুর্গিয়ানা মন্দির

শহরের একপাশে স্বর্ণমন্দিরের মত আর একটি মন্দির আছে, তার নাম দুর্গিয়ানা মন্দির। দেওয়ালীর সময় এখানে আলোকসজ্জা ও আতসবাজীর আয়োজন হয়ে থাকে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

এই স্থানটি প্রত্যেক ভারতবাসীরই পরিচিত। ১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ার ও তাঁর সেনাদল এই স্থানে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করে, এতে প্রায় ১৫০০ লোক প্রাণ হারায়। এই উদ্যানটির চারপাশ উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রবেশ ও বহির্গমের পথ একটিই। ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। ১৯১৯-এর সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এখানে

বহু স্ত্রী-পুরুষ সমবেত হয়েছিল। ডায়ার এই স্থানের প্রবেশ পথটি বন্ধ করে দেন, ফলে যারা ভেতরে ছিল তারা কেউই বাইরে যেতে পারে নি। কোন সাবধান-বাণী উচ্চারণ করার মত ভদ্রজ্ঞানও এই ব্রিটিশ সেনার ছিল না। ফলে নিরস্ত্র জনসাধারণ তাদের শিকারের বলি হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে সমগ্র বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে উঁচু দেওয়াল ভেঙে দিয়ে এখানে একটি সুন্দর শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে।

॥ দিল্লী ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ভারতের রাজধানী দিল্লীর ইতিহাস দীর্ঘদিনের। মহাভারতের যুগে পাণ্ডবদের রাজধানী ছিম ইন্দ্রপ্রস্থ। এরপর আর্য ভারতের উত্থান পতন এখান থেকেই শুরু হয়। একাদশ শতাব্দীতে এক রাজপুত সেনাপতি দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিম দিককে তাঁর রাজ্যের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কী সুলতানের প্রথম পদধ্বনি শোনা যায় দিল্লীর বুকে। ইংরাজ আগমনের আগে পর্যন্ত মুসলমান একাধিপত্য চলতে থাকে এই দিল্লীতেই। তারপর ইংরাজদের যুগ। অবশেষে ইংরাজদের হাত থেকে রাজত্ব গিয়ে বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পীঠস্থান ভারতবর্ষের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়েছে দিল্লী।

যানবাহন ঃ—

দিল্লী ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় জায়গার সঙ্গে সরাসরি রেলপথে যুক্ত। কলকাতা থেকে ৭।৮টি গাড়ী দৈনিক দিল্লী যায়। এর মধ্যে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী থেকে শুরু করে ভারতের দ্রুততম গাড়ী রাজধানী এক্সপ্রেস পর্যন্ত আছে। বোম্বাই, বেনারস, মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি প্রায় বড় বড় শহরের সঙ্গেই দিল্লীর সরাসরি যোগাযোগ আছে। এছাড়া বাসে দিল্লীর সঙ্গে বহু জায়গারই যোগাযোগ আছে। অমৃতসর, জয়পুর, আগ্রা, হরিদ্বার, মুসৌরী, নৈনিতাল, চণ্ডীগড়, আম্বালা প্রভৃতি শহরের সঙ্গে দৈনিক বাস যোগাযোগ আছে। শহরে অটো-রিক্সা, টাঙ্গা, বাস প্রভৃতি বিভিন্ন যানবাহনও আছে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

লালকেল্লা

মোগল যুগের স্থাপত্যের বিশেষ নিদর্শন এই লালকেল্লা। শাজাহান এই দুর্গের নির্মাতা। জুম্মা মসজিদ ও লালকেল্লার চারদিকে সম্রাট শাজাহান

শাজাহানাবাদ শহরের পরিকল্পনা করেছিলেন, যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল বর্তমানের পুরানো দিল্লী। দুর্গের অভ্যন্তরে দুটি সভাগৃহ আছে। একটি ব্যক্তিগত সভাগৃহ অর্থাৎ দেওয়ানী খাস আর অন্যটি জনসাধারনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, তার নাম দেওয়ানী আম। দুটিরই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখবার মত, শ্বেতপাথরের তৈরী সূক্ষ্ম জালের কারুকার্য অবর্ণনীয়। 'রংমহল' আর একটি ভবন, যেটি ছিল মহিষীদের ব্যক্তিগত গৃহ। এছাড়া রাজকীয় হারেম যা আজও বিস্ময়কর। কারিগরী বিদ্যার চরম নিদর্শন এই হারেম, কারণ বর্তমানের মত শীততাপ নিয়ন্ত্রণের এক ধরনের ব্যবস্থা ছিল এখানে। মোতি মসজিদ একটি উপাসনালয়, যেটির অবস্থান দুর্গের মধ্যেই। সম্রাট অউরঙ্গজেব এই শ্বেতপাথরের মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। শীশমহল বা আয়নাঘর ছিল দুর্গের মধ্যেই, যার মধ্যে ছিল একটি যাদুঘর যেখানে অংকিত চিত্র বা স্মরণীয় জিনিসপত্র রাখা হত।

জুম্মা মসজিদ

লালকেল্লা থেকে চাঁদনীচকের দিকে যেতে পড়ে এই বৃহৎ মসজিদ। বিশ্বের সর্ববৃহত এই মসজিদটি লাল পাথর ও মার্বেল পাথরের তৈরী। এর উঠোনটি এত বড় যে ১০০০ লোক একসঙ্গে উপাসনা করতে পারে।

চাঁদনীচক

সম্রাট শাজাহানের শোভাযাত্রা যাবার জন্য লালকেল্লা থেকে এই প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে বিরাট বিরাট বাড়ী এই রাস্তার ধারে ধারে তৈরী হয়েছে। ভাল কাপড় রূপো কেনা-বেচার স্থান এই চাঁদনীচক।

কুতুব মিনার

১২০০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান কুতুবুদ্দিন এই মিনারের নির্মাণ শুরু করেন। দাস বংশের স্থাপয়িতা এই সুলতানের ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর জামাই ইলতুতমাস ভারতের উচ্চতম এই মিনার সম্পূর্ণ করেন। পৃথ্বিরাজের নিজস্ব শহর রায় পিথোরা কুতুবের আশেপাশেই ছিল। কুতুব যাবার পথের দুধারে এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কুতুবের পাশেই একটি লৌহস্তম্ভ দেখা যায়, যার নির্মাণ কাল চতুর্থ শতক। আজ পর্যন্ত এতে মরচে পড়েনি।

মেহেরৌলি

কুতুবে যাবার আগে মেহেরৌলি অবস্থিত। এখানে সম্রাট আকবরের

পালিত ভ্রাতা আদম খাঁর সমাধি আছে। এর আশেপাশে বর্তমানে সরকারী বাড়ী, অফিস প্রভৃতি দ্রুত তৈরী হচ্ছে।

তুঘলকাবাদ

কুতুব থেকে ৫ মাইল দূরে তুঘলকাবাদ শহর অবস্থিত ছিল। তুঘলকদের রাজধানী ছিল এই স্থানে। এখনও গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধিস্থল দেখবার মত। এর গঠনশৈল অতীব মনোরম। এখানে তুঘলকাবাদের পুরানো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

হুমায়ূনের সমাধি

হুমায়ূনের সমাধির উপর একটি বৃহৎ উদ্যান ও সমাধি ভবন নির্মিত হয়েছে। এই সমাধি মন্দিরটি অনেকের মতে তাজমহলের পূর্বসূরী। দিল্লী থেকে ট্রেনে আগ্রা যাবার সময় এই সমাধিটি অতীব সুন্দর দেখায়।

পুরানো কেল্লা

পুরানো কেল্লার নিকট প্রাচীন মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ বর্তমান ছিল। পুরাতত্ত্ববিদরা খননকার্যের দ্বারা এর যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। পুরানো কিল্লা হুমায়ূনের সময় নির্মিত হয়। পরে শেরশাহ এর অনেক সংস্কার করেছিলেন। শেরশাহের মসজিদ আছে এখানে, এর দক্ষিণে শের মহল ভবনের সিঁড়ি থেকে হুমায়ূন পড়ে যান এবং তিনদিন পরে মারা যান।

নতুন দিল্লী বর্তমান শহরের রূপ পরিগ্রহ করে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পর। সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি বর্তমান রাইসিনা গ্রামের পাশে শহর গঠন করবার নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী বেকার এবং লুটিয়েমস নামক দুই স্থপতির উপর ভার পড়ে শহরের পরিকল্পনার। এই পরিকল্পনার মূর্ত প্রকাশ বর্তমানের রাজধানী দিল্লী শহর।

রাষ্ট্রপতি ভবন

লুটিয়েমস্ নির্মাণ করেছিলেন বড়লাটের বাসোপাযোগী এই বিরাট ভবন। বর্তমানে এটি ভারতের রাষ্ট্রপতির বাসস্থান। এই ভবনের পিছনে একটি মোগল উদ্যান আছে। এটি শীতের শেষে অতি মনোহর রূপ ধারণ করে। ফুলের কার্পেট এবং ফোয়ারাগুলি দর্শকের আনন্দ দেয়। এর কাছেই দুটি সুদৃশ্য ভবন দু'পাশে দণ্ডায়মান। একটি মহাকরণ ভবন। তার পাশেই আছে

গোলাকার পার্লামেন্ট ভবন, যার মধ্যে রাজ্যসভা ও লোকসভার অধিবেশন হয়। এ সবগুলির কৃতিত্ব স্থপতি বেকারের।

ইণ্ডিয়া গেট

মহাকরণ ভবনের দিকে পিছন করে পূর্বদিকে তাকালেই দেখা যায় একটি বৃহৎ তোরণ, এর নাম ইণ্ডিয়া গেট। একটি খাল কেটে মহাকরণ ভবন থেকে তোরণ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। এখানে নৌকা চড়ার ব্যবস্থা আছে। আলোকোজ্জ্বল এই তোরণটি রাত্রে ভারি সুন্দর দেখায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত বীর সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই তোরণটি নির্মিত হয়েছে।

রাজঘাট

ফিরোজশাহ কোটলা মাঠ ও লালকেল্লার মধ্যবর্তী স্থানে যমুনার উপর অবস্থিত এই ঘাটে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে দাহ করা হয়েছিল। এই রাজঘাটের নিকটে গান্ধী স্মারক সংগ্রহশালাটিতে গান্ধীর ব্যক্তিগত ব্যবহৃত বহু জিনিস রাখা আছে! এছাড়া ফটোতে গান্ধীর জীবন-সাধনাকে ধরে রাখা হয়েছে।

শান্তিবন

রাজঘাটের পাশেই শান্তিবন, যেখানে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে দাহ করা হয়েছিল। নেহেরুর ব্যক্তিগত সংগ্রহ তিনমূর্তিমার্গ নামক গৃহে রক্ষিত।

বিজয়ঘাট

এখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে দাহ কর হয়েছিল।

থাকবার স্থান ঃ—

পুরাতন এবং নূতন দিল্লীতে থাকবার যথেষ্ট ভাল ভাল হোটেল আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলও আছে ডজনখানেক। এসব হোটেলের খরচ স্বভাবতই বেশী। তবে মধ্যবিত্ত আয়ের লোকদের জন্যও প্রচুর হোটেল আছে, যেখানে দৈনিক থাকা খাবার জন্য ২০—৪০ টাকা পড়ে। এছাড়া ধর্মশালা এবং অন্যান্য আশ্রয়স্থলও আছে। যেমন বিড়লা ধর্মশালা, জৈন ধর্মশালা, কালীবাড়ী প্রভৃতি।

॥ রাজস্থান ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

শৈশব থেকে আমরা রাজপুত বীর সৈনিকদের শৌর্যবীর্যের কথা শুনে আসছি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এদের বীরত্বের স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। এই রাজপুতদের বাসস্থানই বর্তমানে রাজস্থান, পুরাতন রাজপুতনা। এটি ভারতের অতি বৃহৎ রাজ্য। ২২টি প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য ও আজমীর রাজ্য নিয়ে গঠিত রাজস্থান। আরাবল্লী পর্বত রাজস্থানকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত মরুভূমি, উল্টো দিকে আছে পাহাড় পর্বত। গভীর অরণ্য, নদনদী ও উর্বরা মালভূমি এসবই রাজস্থানের সম্পদ।

জয়পুর :—

রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর লাল ও গোলাপী পাথরে তৈরী নগর। মহারাজ জয়সিংহ এই শহরটি তৈরী করান। এই জ্যোতির্বিদ মহারাজের নামানুযায়ী শহরের নাম হয় জয়পুর। তাঁর সময় রাজধানী ছিল অম্বর-এ। তিনিই অম্বর থেকে রাজধানীকে শাসনের সুবিধার জন্য সমতলে নিয়ে আসেন। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে রুক্ষ পর্বতরাজী। দক্ষিণে সমতল ভূমি ও শহর। শহরটি চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল, এবং ৮টি প্রবেশ পথ ছিল। এছাড়া শহরের দুধারে জাফরি দেওয়া জানালাগুলি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যানবাহন :—

জয়পুর যেতে হলে আগ্রা অথবা দিল্লী হয়ে ট্রেনপথে যাওয়া যায়। তুফান এক্সপ্রেসে আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে নেমে মীটারগেজ গাড়ী ধরে জয়পুর যাওয়া যায়। অথবা যে কোন গাড়ীতে দিল্লী গিয়ে, দিল্লী থেকে আহমদাবাদ মেল অথবা জনতা এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে জয়পুর যাওয়া যায়। দিল্লী ও আগ্রা থেকে ট্রেনে জয়পুর যেতে ৮ ঘণ্টার মত সময় লাগে। বোম্বাই, মাদ্রাজ থেকেও আগ্রায় বা দিল্লীতে গাড়ী বদল করে যাওয়া যায়। সড়কপথে জয়পুর

ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যুক্ত। দিল্লী থেকে দৈনিক এক্সপ্রেস বাস যাতায়াত করে, যাতে ৬ ঘণ্টায় জয়পুর পৌঁছান যায়। এছাড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসও নিয়মিত যাতায়াত করে। আগ্রা, আলওয়াল, আজমীড়, ভরতপুর, যোধপুর, কোটা প্রভৃতি স্থান দৈনিক বাস চালু আছে। শহরে ঘোরার জন্য ট্যাক্সি, টাংগা, বাস, অটো-রিক্সা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এছাড়া পর্যটন বিভাগ জয়পুর রেল স্টেশন থেকে দুটি কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করেন। জন প্রতি খরচ পাঁচ টাকা।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

অম্বর

অম্বর ছিল প্রাচীন কাছাওয়াগণের রাজধানী। জয়পুর শহর থেকে ৭ মাইল দূরে জয়পুর-দিল্লী সড়কের উপর অম্বর অবস্থিত। অযোধ্যার রাজা অম্বরিষের নাম থেকে অম্বর নামটির উৎপত্তি। অম্বর প্রাসাদটি রাজপুত স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। রাজা মানসিংহ এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রাসাদটি খুবই সুরক্ষিত। আগের যুগের কলাকৌশল অনুযায়ী নিম্নদিকে একটি খিলান দেওয়া প্রকাণ্ড দরজা। সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে সিংহপোল দরজা পেরিয়ে দেওয়ানী আমে যেতে হয়। সেখান থেকে রাজপ্রাসাদের শুরু। এই দেওয়ানী আম বা সাধারণের সভার অভিযোগ সোনার ঘরটি মহারাজা জয়সিংহ নির্মাণ করান। এই গৃহটির ছাদ ধূসর বর্ণের মর্মর প্রস্তর ও বেলে পাথরের সারি সারি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। গনেশ-পোল-এর ভিতর দিয়ে আনন্দ মহলে যাওয়া যায়। এর ভিতরে একটি সুশোভিত উদ্যান, যার চারপাশে রাজকীয় আবাস গৃহ। যশমন্দির, শীশমহল প্রভৃতির দেওয়াল ও ছাদে অতি নিপুণ মোজায়েক ও কাঁচের কাজ আছে। জয়সিংহ শীশমহলটি তৈরী করান। সুখ মন্দিরের দরজায় হাতির দাঁতের মত ও চন্দন কাঠের কাজ রয়েছে? সোহাগ মন্দিরে আছে মর্মর প্রস্তরের জালির কাজ। প্রাসাদের মধ্যে যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরটি এখনও বিদ্যমান। এখানকার পূজারী বাঙালী হিন্দু। মন্দিরটি খুবই জাগ্রত বলে কথিত। দরজাটি রোপ্যমণ্ডিত।

এছাড়া যেখানে পাহাড় শেষ হয়ে এসেছে সেখানে প্রচুর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। তার মধ্যে জগৎ শিরোমণির বৈষ্ণব মন্দিরটি অপূর্ব।

নগর প্রসাদ

নগর প্রাসাদটি চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে দেয়ে ঘেরা। পূর্ব দিকে শিরে-কি-দেউড়ী এবং দক্ষিণ দিকে ত্রিপোলিয়া দরজা প্রাসাদের প্রবেশ পথ। প্রবেশের পর পাওয়া যায় মুবারক মহল, যার বাইরেটা মর্মর প্রস্তরের নির্মিত। এখানে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস আছে। বর্তমানে দেওয়ানী আম জয়পুরের মহারাজার সংগৃহীত মূল্যবাদ চিত্র ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে প্রধান আকর্ষণ আবুল ফজল অনূদিত পারস্য ভাষার মহাভারত।

প্রাসাদাভ্যন্তরে চন্দ্রমহল প্রাসাদটি নয়ন বিমোহন। মার্বেল পাথরের নির্মিত এই সাততলা বাড়ীটি রাজাদের গৌরবের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর কক্ষগুলি বহু নক্সায় ও চিত্রে শোভিত। দেওয়াল ও ছাদ কাঁচ দিয়ে মোড়া। প্রাসাদের সব থেকে উচ্চে মুকুট মন্দির। এখান থেকে শহরের সৌন্দর্য অত্যন্ত সুন্দর। অস্ত্রাগারটিও প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহশালা।

হাওয়া মহল

পঞ্চতল বিশিষ্ট এই হাওয়া প্রসাদটি প্রতাপ সিংহ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণ করেন। ঝোলানো গবাক্ষ, জালির কাজ, বক্ররেখা বিশিষ্ট ছাদ ও গম্বুজ-এর স্থাপত্যকর্ম অদ্ভুত ও বিচিত্র।

যন্ত্র বা জন্তরমন্তর

মহারাজা জয়সিংহ ভারতে পাঁচটি মানমন্দির নির্মাণ করান। তিনি নিজে জ্যোতির্বিদ হওয়ায় তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হয়েছিল। জয়পুরের মান-মন্দিরটি সর্ববৃহৎ এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংরক্ষিত। মন্দিরের প্রচুর প্রস্তর নির্মিত যন্ত্রাংশ আছে, যা থেকে দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ, স্থির তারকা, স্থানীয় সময়, সূর্যের গতিপথ, গ্রহণ প্রভৃতি নির্ণয় করা যেত। একটি বড় সূর্য-ঘড়িও বর্তমান ছিল।

গাইটোর

নাহারগড় দুর্গের পাদদেশে শহরের বাইরে অবস্থিত জয়পুর মহারাজদের সমাধিক্ষেত্র। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সৌধ আছে।

যাদুঘর

রামনিবাস উদ্যানে জয়পুরের যাদুঘর। মর্মর প্রস্তর ও বেলেপাথরে নির্মিত যাদুঘর ভবনটি স্থাপত্য ও শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। অনেক প্রাচীন জিনিস এখানে রক্ষিত আছে।

গলতা

গলতার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত সূর্যদেবের মন্দির থেকে শহরের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়।

থাকবার স্থান ঃ—

জয়পুরে অনেক ভাল ভাল হোটেল আছে। জন প্রতি দৈনিক ৩০ থেকে ৫০ টাকা খরচ পড়ে থাকা এবং খাবার জন্য। এছাড়া আরও অনেক থাকার জায়গা আছে। (১) রিটায়ারিং রুমে থাকতে হলে স্টেশন মাষ্টার মশাই-এর কাছে আবেদন করতে হয়। অগ্রিম বুকিং করা যায় না। (২) পর্যটন বাংলো (দ্বিতীয় শ্রেণী)—(Tourist Bungalow, 2nd class) এখানে সস্তায় থাকা খাবার ব্যবস্থা করা যায়। অনুমতির জন্য পর্যটন অফিসার (Tourist officer), জয়পুরকে লিখুন। (৩) এখানে অনেকগুলি ধর্মশালা আছে। (৪) যুব ছাত্রাবাস—এখানে খুব সস্তায় থাকা যায়, তবে মেয়েদের নিয়ে থাকবার ব্যবস্থা নেই। ম্যানেজার, যুব ছাত্রাবাস, বি-৫ নিউ কলোনী, জয়পুরের কাছে আবেদন করতে হয়।

আজমীড় ঃ—

রাজস্থানের মধ্যে আজমীড় ইতিহাস, ধর্ম ও স্থাপত্যের দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখ্য। তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে আজমীড় শহরটি অবস্থিত। চারদিক ঘিরে আছে তারাগড় দুর্গ। এই দুর্গটি চৌহানদের নির্মিত এবং অতীত যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী।

যানবাহন ঃ—

দিল্লী থেকে আহমদাবাদ রেলপথে আজমীড় একটি জংশন স্টেশন। সুতরাং কলকাতা থেকে জয়পুর যাওয়া এবং আজমীড় যাওয়া একই উপায়ে করা যায়। এছাড়া বাসপথেও আজমীড় শহর—জয়পুর, কোটা, আগ্রা,

যোধপুর, পুষ্কর প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। শহরে ঘোরার জন্য টাংগা ও বাস আছে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

দরগা খাজা সাহেব

শহরের মধ্যেই অবস্থিত এই প্রসিদ্ধ দরগাটি কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের বিশ্বাস এখানে যা মানত করা যায় তা পূর্ণ হয়। এখানে খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির সমাধি আছে। দুটি মসজিদ, একটি মহফিলখানা এবং একটি বিরাট দরজা আছে। ঢোকবার মুখে একটি বেলেপাথরে নির্মিত মসজিদ আছে, যেটি আকবর নির্মাণ করেছিলেন।

আড়াই দিন কা ঝোঁপড়া

তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই স্থানটি অতি সূক্ষ্ম ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ। হিন্দু স্থাপত্যের চরম নিদর্শন। কিংবদন্তি আছে, এখানে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় তৈরী হচ্ছিল কিন্তু মোহম্মদ ঘোরী আদেশ দেন যে, প্রার্থনা-ভবন নির্মাণ করতে হবে আড়াই দিনের মধ্যে, যার জন্য এর নাম আড়াই দিনের কুটীর। অপর কিংবদন্তী যে, এর নামকরণ বেশী দিনের নয়। এখানে ফকিরগণ আড়াই দিনের জন্য সমবেত হতেন উরস্ উৎসবে, তাই এর এইরূপ নামকরণ।

ম্যাগাজিন

১৫৭১-৭২ সালে আকবর শহরের মধ্যে এই দুর্গটি তৈরী করেছিলেন নিজের বাসস্থানের জন্য। তিনি প্রায়ই আজমীড় আসতেন মইনুদ্দিন চিস্তিতে প্রার্থনা করতে। এই দুর্গটির অন্যতম ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণ স্যার টমাস্ রো এইখানেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে রাজা জেমসের দূতরূপে পরিচয়পত্র দেন। প্রধান ভবনটি বর্তমানে যাদুঘরে রূপান্তরিত হয়েছে।

আনাসাগর হ্রদ

পৃথ্বীরাজের পিতামহ আনাজি এই হ্রদটি ১১৩৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুই পাহাড়ের মাঝে বাঁধ দিয়ে নির্মাণ করেন। মোগল সম্রাটদের এই স্থানটির উপর দৃষ্টি পড়ে। প্রথমে জাহাঙ্গীর দৌলতবাগ উদ্যান এখানে নির্মাণ করেন, পরে

শাজাহান নদীর ধারে ১২৪০ ফুট দীর্ঘ একটি মর্মর প্রাচীর ও শ্বেতমর্মর প্রস্তরে ৫টি চন্দ্রাতপ নির্মাণ করে স্থানটির সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেন।

পুষ্কর তীর্থ

আজমীড়ের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান পুষ্কর। হ্রদটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। ব্রহ্মা তপস্যা করবার জন্য একটি স্থান খুঁজছিলেন। এখান দিয়ে যাবার সময় হাতের তিনটি পদ্মফুল পড়ে যায় এবং তার থেকে তিনটি ফোয়ারার সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা প্রথম স্থানটিকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের স্থান হিসেবে বিবেচনা করেন এবং নাম দেন পুষ্কর। কার্তিক পূর্ণিমায় এখানে বৃহৎ মেলা হয়। এই পুষ্কর হ্রদের উপরে অবস্থিত সাবিত্রী পাহাড় হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

থাকবার স্থান :—

এখানে থাকবার ভাল হোটেল নেই। মধ্যম শ্রেণীর কয়েকটি হোটেল আছে, যেখানে জন প্রতি দৈনিক ১৫ থেকে ৪০ টাকা লাগে। এছাড়া আরও থাকবার স্থান আছে। (১) একাধিক ধর্মশালাতে থাকা যেতে পারে। (২) পর্যটন বাংলো আছে। পর্যটন অফিসারের কাছে সংরক্ষণের জন্য লিখতে হয়। (৩) P. W. D. Duk Bunglow আছে, তার জন্য Executive Engineer, Ajmir-এর কাছে লিখতে হয়।

আলওয়ার :—

আলওয়ার দিল্লী-জয়পুরের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। এখানকার অরণ্যভূমি শিকারের খুবই উপযোগী। দিল্লী থেকে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পাহাড়ের উপর নগর প্রাসাদটি কতকগুলি ভবনের সমষ্টি। একপাশে পাহাড় ও অপর পাশে শহরের মধ্যবর্তী স্থানে সাগর হ্রদটি অতি মনোরম। এই প্রাসাদে যাদুঘর অবস্থিত। এই যাদুঘরটিতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও চিত্রের একটি মূল্যবান সংগ্রহ আছে। প্রায় ৭০০০-এর মত পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৮০ ফুট লম্বা সচিত্র ভাগবতের পাণ্ডুলিপি এবং লালরঙের অক্ষরে আরবী ও পারসিক ভাষায় অনূদিত কোরাণ অন্যতম। শেখ সাদীর গুলিস্থান-এর একটি নকল এখানে আছে।

যানবাহন ঃ—

দিল্লী থেকে জয়পুর রুটে ৯৮ মাইল দূরে অবস্থিত আলওয়ার। দিল্লী-আহমদাবাদ রুটে আলওয়ার একটি বড় রেল স্টেশন। কলকাতা থেকে দিল্লী হয়ে অথবা আগ্রা হয়ে সহজেই আলওয়ারে আসা যায়। বোম্বে থেকে আহমদাবাদ হয়েও এখানে আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে আগ্রায় গাড়ী বদল করে এখানে আসা যায়। এছাড়া বাসপথে আলওয়ার—ভরতপুর, আগ্রা, দিল্লী ও জয়পুরের সঙ্গে যুক্ত।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

প্রাসাদ নগর

(এর বর্ণনা উপরেই দেওয়া হয়েছে।)

যাদুঘর

পাণ্ডুলিপি ও চিত্রের মূল্যবান সংগ্রহ ছাড়াও এখানে মোগল সম্রাটদের—আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, দারাশিকোহ, নাদির শাহ ও আউরঙ্গজেবের তরবারি আছে।

পিলানী

এখানে বিড়লাদের নির্মিত বৃহৎ ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষার কলেজ আছে। আলওয়ার থেকে বাস পাওয়া যায় পিলানী যাওয়ার।

সিলিশেড়

আলওয়ার-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত এই হ্রদটি অতি মনোরম। এটি একটি কৃত্রিম হ্রদ। পাহাড়ের গায়ে ৪ বর্গমাইল বাঁধ দিয়ে এই হ্রদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তীরভূমি ঘন অরণ্যে পরিবৃত। হ্রদের তীরে একটি সুন্দর প্রাসাদ আছে, যেটি বর্তমানে হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে মোটর লঞ্চ পাওয়া যায় ঘুরে বেড়ানোর জন্য, কিন্তু সাঁতার কাটা যায় না, কারণ এই হ্রদের জলে প্রচুর পরিমাণে কুমীর বর্তমান।

নারায়ণজী

প্রায় ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবন আছে।

সরিষকা বন্যজন্তু সংরক্ষিত উদ্যান

আলওয়ার থেকে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত এই উদ্যানটি বাঘ, চিতাবাঘ, নীলগাই, অনেক রকমের হরিণ, ময়াল সাপ প্রভৃতিতে পূর্ণ। এখানে ছবি তুলতে হলে ক্যামেরা পিছু ২৫ টাকা ফি দিতে হয় এবং গেম ওয়ার্ডেন ইন-চার্জের কাজ থেকে অনুমতি নিতে হয়।

থাকবার স্থান ঃ—

আলওয়ারে মাঝারি ধরনের কয়েকটি হোটেল আছে। ভাল থাকবার জায়গা শহরের মধ্যে সার্কিট হাউস। এখানে জনপ্রতি দৈনিক ২০ থেকে ৩০ টাকা লাগে। এছাড়া সিলিশেড়ে একটি ভাল হোটেল আছে। স্টেশন সংলগ্ন পি. ডব্লু. ডি-র বোট হাউসেও থাকা যায়। Executive Engineer, (Bridge & Rod) Alwar, Rajasthan-এর নিকট অনুমতি পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে অনেকগুলি ধর্মশালাও আছে।

ভরতপুর ঃ—

এটি একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। ভরতপুর দেশীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল ভরতপুর শহর। এইস্থান ঐতিহাসিক দুর্গ ও পক্ষী আশ্রয়স্থলের জন্য বিখ্যাত। মহারাজা সূরজমল ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরের পত্তন করেন।

যানবাহন ঃ—

ভরতপুর, দিল্লী-বোম্বাই রুটের একটি বড় স্টেশন। আগ্রা থেকে ৩২ মাইল, মথুরা থেকে ৩২ মাইল, দিল্লী থেকে ১১৫ মাইল ও জয়পুর থেকে ১১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কলকাতা থেকে আগ্রা ছাউনিতে গাড়ী বদল করে অতি সহজেই ভরতপুর আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে অনুরূপভাবে ভরতপুর আসা যায়। বোম্বাই থেকে সরাসরি ভরতপুর ট্রেন আছে, যেগুলি দিল্লী ও বোম্বাইয়ের মধ্যে যাতায়াত করে। এছাড়া নিয়মিত বাস চলাচল করে ভরতপুর, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, মথুরা প্রভৃতির মধ্যে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

দুর্গ

ভরতপুরের প্রধান আকর্ষণ এখানকার দুর্গটি। এই দুর্গের ২টি প্রবেশ পথ

ও ৮টি বুরুজ আছে। এককালে অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ছিল এই দুর্গ। এর মধ্যে কিশোরী মহল, খাসমহল, জবাহল, বুরুজ ও খাস কোঠী দেখবার মত।

কেওলাদেও ঘনা

রাজস্থানের সব থেকে প্রসিদ্ধ পক্ষী-আবাসস্থল কেওলাদেঁও ঘনা। এটি শহর থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। শুধু পক্ষীই নয়, এখানের বনে ভারতীয় কৃষ্ণ মৃগ, ভল্লুক, চিতাবাঘ, নীলগাই প্রভৃতি জন্তুও পাওয়া যায়। বুনো হাঁস শিকারের স্বর্গ ভরতপুর। শীতের প্রাক্কালে সুদূর সাইবেরিয়া, আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া থেকে রাজহাঁস, পেলিক্যান প্রভৃতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। শীতের শেষে এরা আবার নিজের আলয়ে ফিরে যায়। এটি শীতের আশ্রয়-স্থান ছাড়াও যাযাবর ও স্থায়ী পাখিদের প্রজনন কেন্দ্রও বটে।

যানবাহন :—

ভরতপুরে খুব ভাল হোটেল নেই। কেবলমাত্র ঘনা পশু আশ্রয়স্থলে একটি ভাল হোটেল আছে। তবে সাধারণ হোটেল ও ধর্মশালায় থাকা যায়। এছাড়া ডাকবাংলো আছে, এখানে থাকবার অনুমতি ম্যানেজারের কাছ থেকে নিতে হয়।

চিতোর গড :—

মেবারের রাণাদের বাসস্থান চিতোর গড়। ইতিহাসে রাজপুতদের শৌর্য বীর্যের কাহিনী প্রতিটি ভারতবাসী শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে। পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যু বরণ করাও যে শ্রেয়, এই বীর-ধর্মে রাজপুতরা ছিল বিশ্বাসী। অপরের কাছে নিজের সম্মান নষ্ট করার চেয়েও জহরব্রতে প্রাণত্যাগই কাম্য ছিল রাজপুত রমণীদের। রাণাপ্রতাপ, কুম্ভ, সংগ্রাম সিংহের শৌর্যের কথা কে না জানে। পদ্মিনী উপাখ্যান ইতিহাসের প্রতিটি পাঠকের কাছে সুবিদিত।

যানবাহন :—

চিতোর গড় আজমীড় থেকে সরাসরি ট্রেনে যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে দিল্লী অথবা আগ্রায় গাড়ী বদল করে আজমীড় এবং আজমীড়ে গাড়ী বদল করে চিতোর গড় পৌছান যায়। বোম্বাই থেকে উদয়পুর, রতলম ও

আজমীড় হয়ে চিতোর গড় আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে আগ্রায় গাড়ী বদল করে আসা যায়। এছাড়া চিতোর গড় বাসে সরাসরি উদয়পুর ও ভিলবাড়ার সঙ্গে যুক্ত। ভিলবাড়াতে বাস বদল করে আজমীড়, কোটা ও বুন্দি যাওয়া যায়। উদয়পুর থেকে চিতোর গড় ৭২ মাইল।

চিতোর দুর্গ

চতুর্দিকের সমতল ভূমি থেকে ৫০০ ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত এই দুর্গ যেন রাজপুত শৌর্যের প্রতীক। এই পাহাড়টি প্রস্থে ½ মাইল ও দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩½ মাইল। দুর্গের প্রাকারে কামান দাগার জন্য প্রচুর ছিদ্র আছে। প্রাচীর অতি মজবুত ও শক্তিশালী। এই দুর্গের মধ্যে নবম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত বহু মন্দির, প্রাসাদ ও জলাশয়ের চিহ্ন রয়েছে। দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথ রামপোল কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ পাথরের নির্মিত বিপুল আকারের একটি দরজা। এই দরজার সূক্ষ্ম ভাস্কর্য ও কারুকার্য দেখার মত।

কীর্তিস্তম্ভ

জৈনধর্মালম্বী এক বনিক এই জৈন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম তীর্থংকর আদিনাথের নামে এই স্তম্ভটি উৎসর্গীকৃত। এই স্তম্ভটি পঞ্চতল বিশিষ্ট এবং বাইরে মনোরম কারুকার্যে অলংকৃত।

জয়স্তম্ভ

১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণা কুম্ভ মহম্মদ খিলজীকে যুদ্ধে পরাজিত করে এই জয়স্তম্ভটি নির্মাণ করেন। এটি তল বিশিষ্ট এবং উপরের ২টি তলের কারুকার্যগুলি অসাধারণ সুন্দর।

রাণা কুম্ভের প্রাসাদ

মহারাজ কুম্ভের এই প্রাসাদটি স্থাপত্য শিল্পের এক অদ্ভুত নিদর্শন। এই প্রাসাদটি রাজপুত গঠন-শিল্পের এক পরিচ্ছন্ন রূপ।

পদ্মিনী প্রাসাদ

রাজা রতন সিংহের মহিনী পদ্মীনীর এই প্রাসাদ। তিনি অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। তাঁর প্রাসাদটি জলাশয়ের তীরে অবস্থিত। কথিত আছে এই জলাশয়ের মধ্যে নির্মিত আর একটি প্রাসাদে তিনি বাস করতেন, যেখানে তাঁকে প্রথম একটি আয়নার মধ্যে আলাউদ্দিন দেখেন।

দুর্গে অবস্থিত কয়েকটি মন্দির

দুর্গমধ্যে সাত বিশ দেওয়া (২৭টি মন্দির) ও শ্রীনগর চৌরী নামে মন্দিরগুলি জৈনদের। জটাশংকরের শিব মন্দির ও বৈষ্ণব মন্দির কুম্ভ শ্যাম এখানে অবস্থিত। এখানে আর একটি ছোট মন্দির আছে, যেটি মীরাবাঈ-এর মন্দির নামে চলিত।

থাকবার স্থান ঃ—

চিতোর গড়ে খুব ভাল হোটের নেই। তবে মধ্যম শ্রেণীর কয়েকটি হোটেল আছে যেখানে জন প্রতি দৈনিক ১০ থেকে ২০ টাকা থাকা ও খাওয়ার জন্য লাগে। এছাড়া পর্যটন বিশ্রামাগার আছে ; ম্যানেজারের কাছে অনুমতি নেওয়া যায়। সেচ বিভাগের বাংলো ও পূর্ত বিভাগের ডাকবাংলোতেও থাকবার খাবার ব্যবস্থা আছে। কালেক্টর, চিতোর গড়-এর কাছে লিখে সংরক্ষণ করতে হয়। কয়েকটি ধর্মশালাও আছে যেখানে থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে।

উদয়পুর ঃ—

সূর্যোদয়ের দেশ উদয়পুর ছবির মত সুন্দর শহর। একদিকে আরাবল্লী পাহাড় শ্রেণী অন্যদিকে রাজপ্রাসাদ, হ্রদ নিয়ে আধুনিক শহরের পত্তন। ভারী মনোরম দৃশ্য।

যানবাহন ঃ—

চিতোর গড় থেকে উদয়পুর সরাসরি রেলপথে যুক্ত। এছাড়া জয়পুর-আহমদাবাদ সেকসনের মারোয়াড় স্টেশনটিও উদয়পুরের সঙ্গে যুক্ত। উদয়পুর থেকে হিম্মৎনগর হয়ে আহমদাবাদ যাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

পিচোলা হ্রদ

চতুর্দশ শতকের শেষভাগে নির্মিত এই কৃত্রিম হ্রদটি অতি মনোরম। ৪ বর্গ-মাইল লম্বা এই হ্রদটির তীরে বহু স্নানের ঘাট, মন্দির ও প্রাসাদ আছে।

রাজপ্রাসাদ

পিচালো হ্রদের সমান্তরাল পাহাড়ের চূড়ায় নির্মিত এই রাজপ্রাসাদ। মহারাজার প্রাসাদটি রাজস্থানের মধ্যে বৃহত্তম প্রাসাদ। এটি গ্রানাইট ও মর্মর প্রস্তরে নির্মিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে মোতি মহল, বড়ি মহল, মানিক মহল,

চিত্রশালা প্রভৃতি মহলগুলি দর্শনীয়। এখানের মোজায়েক এবং রঙীন টালির কাজ দেখবার মত। রঙীন টালি ও কাঁচের টুকরো দিয়ে নির্মিত ময়ূর এবং অন্যান্য দৃশ্য চমৎকার।

জগদীশ মন্দির

মহারাজা জগৎ সিং ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই মন্দির। অনেকগুলি প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়।

জগনিবাস প্রাসাদ

এই প্রাসাদটির পটভূমি একে রূপমণ্ডিত করেছে। উঁচু পাহার বিরাট হ্রদ আর এর মধ্যবর্তীস্থানে রাজপ্রাসাদ তার সমস্ত শৌর্য, বীর্য, ও মহিমায় দেদীপ্যমান। আজ কোন দেশীয় রাজ্য নেই, কিন্তু এককালে এঁরা যে কত বড় সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন এগুলি দেখলে তা বোঝা যায়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ এটি নির্মাণ করান। পরবর্তী শাসনকর্তারা অনেক সংযোজন করেন। এই প্রাসাদের মধ্যে বর্তমানে একটি বিলাসবহুল হোটেল নির্মিত হয়েছে বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য। এটির নাম লেক প্যালেস হোটেল। স্বভাবতই এখানকার দর্শনী সাধারণের ক্ষমতার বাইরে। এই প্রাসাদে বহু ঘর, উঠোন, ঝরণা, উদ্যান ও স্নানের জায়গা আছে। প্রাসাদের মধ্যে চন্দ্রপ্রকাশ মহল, বড়ামহল, খাসমহল, সজ্জন নিবাস ও দিলারাম মহল প্রভৃতি মহলগুলি মনোমুগ্ধকর।

জগমন্দির

জগমন্দির আর একটি দ্বীপ প্রাসাদ, হ্রদের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এই প্রাসাদটির সঙ্গে মোগল সম্রাটদের অনেক স্মৃতি বিজড়িত। শাজাহান, পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই প্রাসাদে আশ্রয় নেন। প্রধান ভবনটি গোলাকার গম্বুজের আকারের, তিনতল বিশিষ্ট। প্রাসাদটির ভিতরের দিক হলদে রঙের বেলেপাথরে নির্মিত এবং বাইরের দিকটা শ্বেতপাথরে মোড়া।

ফতেহ্ সাগর

মহারাজা ফতে সিং-এর তৈরী ফতেহ্ সাগর আর একটি কৃত্রিম হ্রদ। এটি

পিচোলা হ্রদের সঙ্গে খাল দ্বারা যুক্ত। এই হ্রদটি ১½ মাইল লম্বা ও ১ মাইল চওড়া এবং হ্রদটির চারদিকে সমান্তরালভাবে পীচের সুন্দর রাস্তা আছে।

সহেলিওঁ-কি-বাড়ী

ফতেহ্ সাগর বাঁধের নীচেই হল সম্মানীয়া সঙ্গিনীগণের উদ্যান। দিল্লীর সম্রাট, মহারাণা সংগ্রাম সিংহকে এটি তৈরী করিয়ে দেন। এই উদ্যানটিতে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর পুকুর ও তার উপর ভাল পাথরের নির্মিত ছত্রী আছে। এর পাশে আছে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ঝরণা।

একলিঙ্গজী ও নাথদ্বার মন্দির

উদয়পুর থেকে কয়েকটি ভাল ভাল জায়গায় যাওয়া যায়। ১৪ মাইল দূরে একলিঙ্গজীর মন্দির অবস্থিত। ইনি মেবারের হারমাণাদের কুল দেবতা। এখান থেকে ১৬ মাইল দূরে নাথদ্বার মন্দির অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের এই মন্দিরে প্রতি বছর শত শত তীর্থযাত্রী এসে থাকেন।

বুন্দি ঃ—

বন্দির অবস্থান ছবির মত সুন্দর এক গিরিবর্ত্মে। এটি চৌহান রাজাদের বাসস্থান। রাও দেওয়া এটি ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেন। এই শহরটির চতুর্দিক পাহাড়ে ঘেরা।

যানবাহন ঃ—

নিকটস্থ রেল স্টেশন কোটা, কোটা, দিল্লী-বোম্বাই রুটে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন। বুন্দি এখান থেকে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। নিয়মিত বাস বুন্দি ও কোটার মধ্যে চলাচল করে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

বুন্দি

শহরটি দেখবার মত। এটি একটি সুন্দর সাজান শহর। চারদিকে প্রাচীর ঘেরা। শহরটির নূতনত্ব হল প্রধান রাস্তাটি পাথর দিয়ে বাঁধান। দোকানগুলি ৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত। শহরের ওপরে হারা রাজগণের প্রাসাদ পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। এই রাজপ্রাসাদ গঠনশৈলীতে রাজস্থানের সব চাইতে আকর্ষণীয় ও দর্শনীয়।

থাকবার স্থান :—

এখানে থাকার কোন ভাল হোটেল নেই। সার্কিট হাউসে থাকা যায়। শুধু থাকার জন্য ডবল বেডে ৫০ টাকা লাগে। এ ছাড়া রণজিৎ নিবাসে থাকা যায়। এর অনুমতির জন্য লিখুন—ব্যক্তিগত সহায়ক, বুন্দির মহারাজা (Personal Assistant, Maharaj of Bundi). পূর্তবিভাগের ডাকবাংলো আছে। লিখুন—সরকারী বাস্তুকার, পূর্তবিভাগ, পুল ও সড়ক, বুন্দি (Asst. Engineer, Bridge & Road, P. W. D. Bundi)। এছাড়া কয়েকটি ধর্মশালা আছে।

কোটা :—

রাজপুত রীতি অনুযায়ী চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত শহর কোটা। একদিন এর শৌর্য বীর্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

যানবাহন :—

কোটা দিল্লী থেকে সরাসরি ট্রেনে যাওয়া যায়। জয়পুর থেকে সওয়াই মাধোপুর হয়ে কোটা যাওয়া যায়। দূরত্ব ১৪৯ মাইল। কলকাতা থেকে কোটা যেতে হলে আগ্রা অথবা দিল্লী হয়ে যাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকে সরাসরি কোটা গাড়ী আছে। বোম্বাই থেকে দিল্লীর পথটাও কোটার উপর দিয়ে। এছাড়া নিয়মিত বাস কোটাকে জয়পুর, যোধপুর, আজমীড়, বুন্দি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

কোটা

শহরটি দেখার মত। চারদিকে বিরাট প্রাচীর বেষ্টিত শহরের অভ্যন্তরে প্রাচীন প্রাসাদটি দর্শনীয়। এখানে একটি যাদুঘর আছে, যেখানে কয়েক হাজার পাণ্ডুলিপির মূল্যবান সংগ্রহ আছে। ½ মাইল দূরে চম্বল নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কোটাতে আছে সুন্দর একটি হ্রদ ও উদ্যান।

থাকবার স্থান :—

খানে থাকবার কয়েকটি ভাল হোটেল আছে। মধ্য আয়ের লোকেদের

থাকবার মত হোটেলও আছে। সার্কিট হাউসে থাকা যায়। এছাড়া এখানে অনেকগুলি ধর্মশালাও আছে।

আবু পর্বত :—

আবু পর্বত রাজস্থানে একমাত্র পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। এটি ভারতের অন্যতম সুন্দর পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। এটির উচ্চতা ৪০০০ ফুট এবং একটি বিচ্ছিন্ন মালভূমির উপর অবস্থিত। আবু নানারকম অদ্ভুত আকারের গ্রানাইট পাথর ও সবুজ বনানীতে ঘেরা। আর আবুর অন্যতম প্রসিদ্ধি জৈনদের তীর্থস্থানরূপে। এখানকার ৫টি দিলওয়ারা মন্দির জগৎ বিখ্যাত। মধ্যযুগের ভারতীয় ভাস্কর্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন এই মন্দির।

যানবাহন :—

আবু রোড, দিল্লী-আহমদাবাদ রুটের একটি প্রধান স্টেশন। কলকাতা থেকে দিল্লী অথবা আগ্রায় গাড়ী বদল করে আসা যায়। বোম্বাই থেকে আহমদাবাদ অথবা আগ্রায় গাড়ী বদল করেও আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে আসতে হলে আগ্রায় গাড়ী বদল করতে হয়। আবু রোড স্টেশন থেকে আবু পর্বত ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে নিয়মিত বাস চলাচল করে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

নাক্কি হ্রদ

দিলওয়ারা মন্দিরের নিকট এই কৃত্রিম হ্রদটি অবস্থিত। এতে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। পাশেই আছে 'ভেক পাহাড়'। এই পাহাড়টির আকৃতি এমনই যে দেখলে মনে হয় একটি ভেক জলে লাফিয়ে পড়বার জন্য অপেক্ষা করছে। কথিত আছে দেবতারা এই হ্রদটি নখ দিয়ে তৈরী করেছেন, তাই এই নাম। এখানে বেড়াবার জন্য নৌকা ও শিকারা পাওয়া যায়।

দিলওয়ারা মন্দির

আবুর প্রধান আকর্ষণ এই দিলওয়ারা মন্দির। ৫টি দিলওয়ারা মন্দিরের মধ্যে কেবলমাত্র তেজপাল ও বিমল বাসাহি মন্দির দুটি-ই বিখ্যাত। এখানে স্থাপত্যশিল্প পূর্ণতা লাভ করেছে। বিমল বাসাহি মন্দিরটি সম্পূর্ণ শ্বেতপাথরে নির্মিত। এর বাইরের দিক অত্যন্ত মামুলি কিন্তু ভিতরের দিক অলংকরণ ও ভাস্কর্যে অসাধারণ। জৈন্য মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

রবার্ট স্পার

এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য অতি মনোরম। রুক্ষ কঠোর প্রস্তর পরিপূর্ণ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই স্থানের দুপাশে আছে গভীর খাদ। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম

আবু থেকে বাস ৫ মাইল দূরে অচলগড়ের বিখ্যাত শিবমন্দিরটিতে ইচ্ছা করলে পাওয়া যায়।

থাকবার স্থান :—

এখানে অনেকগুলি ভাল ভাল হোটেল আছে। মধ্যবিত্তদের জন্যও অনেক হোটেল আছে, যেখানে জন প্রতি দৈনিক ১৫ থেকে ৩০ টাকা লাগে থাকা খাবার জন্য। এ ছাড়া :—

(১) গুজরাট ও রাজস্থান সরকারের সার্কিট হাউস আছে।

(২) পর্যটন বাংলোতেও থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে।

(৩) রাজস্থান সরকারী বাস সংস্থার অবসর গৃহ আছে, সেখানেও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

(৪) সরকারী কটেজ ভাড়া পাওয়া যায়।

(৫) বহু ধর্মশালা আছে, থাকবার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

বিকানীর :—

ভারতের প্রসিদ্ধ মরুভূমি থর-এর মধ্যে অবস্থিত বিকানীর। অনেকের মতে যখন সরস্বতী নদী এখান দিয়ে বয়ে যেত, তখন এর চারপাশে সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের কলা ও শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বিকানীর।

যানবাহন :—

দিল্লী থেকে বিকানীর সরাসরি রেলপথে যুক্ত, দূরত্ব ২৮৭ মাথল। কলকাতা থেকে দিল্লী গিয়ে সেখান থেকে মীটারগেজের বিকানীর মেল ধরে পরের দিন বিকানীর পৌঁছান যায়। বোম্বে ও মাদ্রাজ থেকেও দিল্লীতে গাড়ী বদল করে বিকানীর যাওয়া যায়। এ ছাড়া বাস দৈনিক বিকানীরকে সুজনগড়, জয়শলমীর, আজমীড়-এর সঙ্গে যুক্ত করেছে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

দুর্গ

প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান হল দুর্গ। আকবরের সেনাপতি রাজা রায় সিং ষোড়শ শতকের শেষে বিকানীর দুর্গ নির্মাণ করেন। পরবর্তী রাজারা অনেক পরিবর্ধন করেছেন। চতুষ্কোণ এই দুর্গটি বেশ বড়, এতে ৩৭টি গম্বুজ আছে আর আছে এক দৃঢ় প্রাকার। মধ্যযুগের রণনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরী। এই প্রাকারের পরে ৩০ ফুট চওড়া পরিখা আছে। দুর্গে দুটি প্রবেশ পথ। দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ আছে। ছত্তর মহল, করণ মহল, সূর্য নিবাস (দরবারগৃহ), চন্দ্র মহল, শীশমহল, ফুল মহল ইত্যাদি প্রধান।

গাজ্‌নের প্রাসাদ

এটি শহর থেকে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। বাসে যাওয়া যায়। একটি হ্রদের তীরে এই জায়গাটি অবস্থিত। রাজাদের শিকারের স্থান ছিল।

কর্‌ণীজীর মন্দির

শহর থেকে ১৬ মাইল দূরে করণীজীর মন্দির। ভবিষ্যদ্বক্তা দেবীতে পরিগণিত এই করণীজী।

ছত্রীগুলি

বিকানীর থেকে ৫ মাইল পূর্বে দেবীকুণ্ডে, বিকানীরের শাসনকর্তাদের স্মৃতিস্তম্ভ (ছত্রীগুলী) রয়েছে।

থাকবার স্থান ঃ—

বিকানীরে খুব ভাল হোটেল নেই। ডাকবাংলোতে থাকা যায়। নির্বাহী বাস্তকার, শহর বিভাগ, পূর্তবিভাগ, বিকানীর-কে (Executive Engineer, City Dept. P. W, D. Bikanir.) ১০ দিন আগে লিখতে হয়।

জয়শলমীর ঃ—

১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাওয়াল জয়শল এই শহরটি নির্মাণ করেন এবং তাঁর নামানুযায়ী এর নামকরণ হয়েছে জয়শলমীর। রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই শহরটি থর মরুভূমি নামে পরিচিত। একসময় এখানে ভাটি রাজপুতদের বাসস্থান ছিল। হলুদ রঙের বালুকাময় প্রান্তরে হলুদ রঙের প্রস্তরে নির্মিত মন্দির প্রাসাদ ও দুর্গ এক মোহময় আবেদন সৃষ্টি করে।

যানবাহন :—

যোধপুর থেকে পোকরান পর্যন্ত রেলপথ আছে। পোকরান থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত জয়শলমীর। পোকরান থেকে নিয়মিত বাস আছে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

জয়শলমীর দুর্গ

প্রত্যেক রাজপুত শহরের প্রাণকেন্দ্র হল তার দুর্গ, এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। শহরে প্রান্তসীমায় সব থেকে উঁচু পাহাড়ের উপর এই দুর্গ অবস্থিত। এটি চিতোর গড়ের পর রাজস্থানের প্রাচীনতম দুর্গ। দুর্গটির উচ্চতা ২৫০ ফুট। দৈর্ঘ্যে ১৫০০ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৭৫০ ফুট। পাহাড়টির মূলদেশ ১৫ ফুট উঁচু পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং যেখানে দুর্গটি অবস্থিত তারও চারিদিকে উঁচু প্রাচীর ঘেরা। প্রাকারের উপরে কামান বসাবার উঁচু জায়গা আগে। দুর্গের ভিতরের জৈন মন্দিরগুলি নৃত্যরত মূর্তি ও দেববিগ্রহ দ্বারা সুসজ্জিত।

জিনভদ্র জ্ঞানভাণ্ডার

জৈন মন্দিরের মধ্যে অন্যতম অংশ হিসাবে এই জ্ঞানভাণ্ডারটি বিদ্যমান। এখানে ভারতের অমূল্য পাণ্ডুলিপি আছে। দীর্ঘতম ও সুচিত্রিত কাঠের আবরণে রক্ষিত তালপত্রের পাণ্ডুলিপিটি ৩৩½ ইঞ্চি লম্বা।

থাকবার স্থান :—

এখানে থাকবার কোন হোটেল নেই। পূর্তবিভাগের একটি ডাকবাংলো ও কয়েকটি ধর্মশালাই একমাত্র ভরসা।

যোধপুর :—

অনেকের মতে যোধপুরের দুর্গটি রাজস্থানের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। বেলেপাথরের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর উপর শহরটি অবস্থিত। রাঠোর রাজপুতগণের প্রধান যোধা রাও ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরটির পত্তন করেন এবং তাঁর নামানুসারে নাম হয় যোধপুর।

যানবাহন ঃ—

জয়পুর থেকে যোধপুরের দূরত্ব ১৯২ মাইল। দিল্লী থেকে জয়পুরে গাড়ী বদল করে যোধপুর যাওয়া যায়। আর একটি পথও আছে। জয়পুর থেকে মারওয়াড় জংশনে গাড়ী বদল করেও যোধপুরে যাওয়া যায়। মারওয়াড় থেকে যোধপুরের দূরত্ব ৬৪ মাইল। এছাড়া বাসে যোধপুর ও আবু পর্বতের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। জয়পুর থেকেও বাস যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

বালসমন্দ হ্রদ

যোধপুরের আকর্ষণ শহরের মধ্যে কয়েকটি জলাশয়। শহরের ৩ মাইল দূরে বালসমন্দ হ্রদ। তীরে একটি প্রসাদ এবং চারিদিকে সুসজ্জিত বাগান একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

দুর্গ

শহরের ৪০০ ফুট উচ্চে পাহাড়ের উপর দুর্গটি অবস্থিত। দুর্গটি ২০ ফুট থেকে ১২০ ফুট উঁচু এবং ১২ ফুট থেকে ৭০ ফুট পুরু একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে কোথাও গোল এবং কোথাও চতুষ্কোণ গম্বুজ আছে। ভেতরের আয়তন ১৫০০ ফুট দীর্ঘ ও ৭৫০ ফুট বিস্তৃত। এই জায়গাটি মন্দির, প্রসাদ ও সৈনাবাসে পরিপূর্ণ। শহরের কয়েকটি সুন্দর ভবনের মধ্যে একটির নাম রাজমহল। আর আছে, চমৎকার চূড়া বিশিষ্ট গঙ্গাশ্যাম মন্দির, একশোটি স্তম্ভবিশিষ্ট মহামন্দির। সুন্দর প্রাচীন অট্টালিকা তালহাতি-কা মহল।

মাণ্ডোর

যোধপুর থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত মাণ্ডোর মারওয়াড়ের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানকার বিস্তৃত উদ্যানে যোধপুর-শসেনকর্তাদের স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

॥ গুজরাট ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে আরবসাগর বিধৌত গুজরাট ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। সূতা ও সূতাবস্ত্র বয়নের বেশীর ভাগ মিলই গুজরাটে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের নামাঙ্কিত দ্বারকা, যা হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ তাও এই গুজরাটে অবস্থিত। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী জন্মেছেন এই প্রদেশে। এখানকার একাধিক বড় বড় বন্দর ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক যোগসূত্র রক্ষা করছে। সোমনাথ মন্দিরের ধনদৌলত বহু বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং একাদশ শতকে সুলতান মাহমুদ সাত বার সোমনাথ লুণ্ঠন করেন ও সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে চলে যান।

আহমদাবাদ ঃ—

গুজরাট প্রদেশের রাজধানী এবং একটি শিল্পশহর। বিশেষ করে বয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত আহমদাবাদ। ভারতের বেশীর ভাগ কাপড়ের কলই আহমদাবাদে অবস্থিত। ১৪১১ সালে আহমদ শাহ বর্তমান আহমদাবাদ শহরটি নির্মাণ করেন। কথিত আছে প্রাচীন শহর কর্ণবতী এখানেই অবস্থিত ছিল। সবরমতি নদীর তীরে আহমদাবাদ শহর। মহাত্মা গান্ধী ১৫ বছর এখানে ছিলেন। সবরমতি আশ্রম থেকেই তিনি প্রথম লবন সত্যাগ্রহ করেছিলেন।

থাকবার স্থান ঃ—

বোম্বাই থেকে আহমদাবাদ সরাসরি রেল লাইন আছে। কলকাতা থেকে দিল্লীতে গাড়ী বদল করে জয়পুর, আজমীঢ় হয়ে আহমদাবাদ পৌঁছান যায়। এ ছাড়া বোম্বাই মেলে (নাগপুর হয়ে) ভিরমগ্রাম-এর বগীতেও আহমাবাদ যাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই হয়েও আহমদাবাদ যাওয়া যায়। এ ছাড়া নিয়মিত বাস আবু পর্বত, বোম্বাই প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানগুলিকে আহমদাবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

হাতিসিং মন্দির

হাতিসিং শাহ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি মর্মর প্রস্তরে তৈরী। মন্দিরটির চারপাশে আরও ৫৬টি মন্দির আছে। দিল্লী গেটের বাইরে মন্দিরটি অবস্থিত।

জুম্মা মসজিদ

পশ্চিম ভারতের অন্যতম এই মসজিদ ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এর স্থাপত্য-শিল্প বিশেষ প্রশংসনীয়। স্তম্ভ, খিলান, মিনারগুলির কারুকার্য ও গঠনশৈলী অতীব মনোরম।

ভদ্র দুর্গ

এই দুর্গে রাজপ্রাসাদ ও রাজউদ্যান ছিল। এটি সম্ভবতঃ আহমদশাহ ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন। মারাঠা শাসনের সময় এখানে ভদ্রকালী মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এখানে একটি ঘড়িঘর আছে।

এটিরা

আহমদাবাদ বয়নশিল্প উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বয়নশিল্প সম্বন্ধে উন্নততর গবেষণা হয় এবং রসায়নাগারটি আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত।

যাদুঘর

যাদুঘরটি চণ্ডীগড় শহর নির্মাণের স্থপতি লে করবুসিয়েরের পরিকল্পনায় নির্মিত। এটি ৬৪টি স্তম্ভের উপর অবস্থিত।

আজম খাঁয়ের প্রাসাদ

মোগল রাজ্যপাল আজম খাঁ এটি নির্মাণ করেন ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজের বাসগৃহের জন্য। বর্তমানে এখানে অনেক সরকারী দপ্তর আছে। প্রধান তোরণটি মোগল শিল্পের নিদর্শন।

সিদ্দি সৈদ মসজিদ

আহমদ শাহের ভৃত্যদের জন্য এই মসজিদটি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েজিল। এই মসজিদের জানালাগুলিতে সুন্দর সুন্দর তালগাছ ও লতাপাতা অঙ্কিত।

কাংকারিয়া হ্রদ

আহমদ খানের দৌহিত্র এটি নির্মাণ করেন। ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই হ্রদটিকে বনভোজনের স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল। হ্রদের উপর একটি ঝুলন্ত পুল এর সৌন্দর্য অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। পূর্বদিকে ধাপে-ধাপে বাগান হ্রদের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এখানে বোটে করে হ্রদে ঘুরে বেড়ান যায়। একটি শিশু-উদ্যান ও চিড়িয়াখানা আছে। সন্ধ্যার পর আলোকমালায় শোভিত হয়ে অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে।

তিনদরজা

শহরের অভ্যন্তরে অবস্থিত এই তোরণটির উচ্চতা ৩৭ ফুট। এর স্থাপত্য দেখার মত।

ঝুলতা মিনার

এটি গোমতীপুরের রাজপুত বিবির মসজিদ। এই মিনারটির বিশেষত্ব, এটি খিলানের থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে এবং অত্যন্ত অল্প জোরেই এটিকে আন্দোলিত করা যায়। এটি পৃথিবীর স্থাপত্যশিল্পের একটি আশ্চর্য কৌশল। ইংরাজরা এর একটি মিনারকে ভেঙে কি করে ঝুলছে জানবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ভাঙা মিনার সহ অন্যান্য মিনারগুলি এখনও বর্তমান।

দরিয়া খাঁয়ের গম্বুজ

এই গম্বুজটি একটি দর্শনীয় বস্তু। কোন রকম সিমেণ্ট বা লোহার ব্যবহার ছাড়াই এটি সামান্য ইট, চুণ, বালি ও জলের মিশ্রণে নির্মিত। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই গম্বুজটি গুজরাটের সবচেয়ে বড় গম্বুজ।

আদালজ ভাভ

এটি একটি কূয়া, যার মধ্যে সিঁড়ির মাধ্যমে নামা যায়। শুধু তাই নয়, সিঁড়ি দিয়ে নামার পর মাটির নীচে দর-দালান কূয়ার চারিদিকে বিস্তৃত। এছাড়া খোদাই করা স্তম্ভ, খিলান ও ব্রাকেটগুলো দেখবার মত। গুজরাট ছাড়া এরূপ কুয়া আর কোথাও নেই। আহমদাবাদের ১২ মাইল দূরে অবস্থিত এই কূয়া ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

সবরমতি

সবরমতি আশ্রম বা 'হরিজন আশ্রম' মহাত্মা গান্ধী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন

করেন। তাঁর দীর্ঘ আহমদাবাদ বাসকালে তিনি এই আশ্রম নির্মাণ করেন। এর বিশেষত্ব, আশ্রমে থাকা এবং খাবার খরচ নিজেরাই রোজগার করা। হৃদয়কুঞ্জ, যেখানে গান্ধীজী বাস করতেন, সেখানে বর্তমানে একটি সংগ্রহশালা করা হয়েছে। এখানে আর্ট গ্যালারীতে গান্ধীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অংকন করে রাখা হয়েছে এবং সংগ্রহশালায় গান্ধীজীর ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিসপত্র রাখা আছে। এই সেই স্থান যেখান থেকে গান্ধীজী ডাণ্ডী অভিযান শুরু করেছিলেন।

এই সমস্ত জায়গায় দেখবার জন্য গুজরাট সরকারের বাস আছে। দুবেলাই কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে।

থাকবার স্থান ঃ—

আহমদাবাদে অনেক ভাল ভাল হোটেল আছে। মধ্যম আয়ের লোকদের জন্যও অনেক ভারতীয় মানের হোটেল আছে। সেখানে দৈনিক জন প্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা খরচ পড়ে। এ ছাড়া সার্কিট হাউসে থাকতে হলে, কলেকটর, আহমদাবাদ-এর অনুমতি নিতে হয়। অনেকগুলি ভাল ধর্মশালায়ও থাকা যায়।

রাজকোট :—

কাথিয়াবাড় রাজ্যের ২০২টি দেশীয় রাজ্য নিয়ে ১৯৪৭-এর পর সৌরাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাজকোট সৌরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। কিন্তু বর্তমানে গুজরাট রাজ্য তৈরী হওয়াতে গুজরাটের রাজকোট ডিভিসানের প্রধান শাসনতান্ত্রিক স্থান রাজকোট। রাজকোট বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর নামের সঙ্গে জড়িত। মহাত্মাজীর শৈশবকাল কাটে তাঁর বাবার কাছে, আর তাঁর বাবা ছিলেন রাজকোটের দেওয়ান।

যানবাহন ঃ—

আহমদাবাদ থেকে ভিরমগাম স্টেশনে এসে গাড়ী বদল করতে হয়। এখান থেকে মীটারগেজ গাড়ীতে রাজকোট যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে বোম্বাই মেলে (যেটি নাগপুর হয়ে যায়) সরাসরি ভিরমগাম পর্যন্ত যাওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর একটি শয়নযান আছে, এটি প্রত্যহ কলকাতা ও ভিরমগামের মধ্যে যাতায়াত করে। বোম্বাই থেকেও আহমদাবাদ হয়ে ভিরমগামে গাড়ী বদল করে রাজকোট যাওয়া যায়।

এছাড়া দৈনিক রাজ্য পরিবহন-এর বাস ভেরাবল, জুনাগড়, জামনগর ও ভাবনগরের মধ্যে যাতায়াত করে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

হাজি বাঁধ

এখানে জল সংরক্ষণ করে শহরে জল সরবরাহ করা হয়।

লালপরী ও রণদেরদা হ্রদ

রাজকোট থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতি রবিবার বাস যাতায়াত করে। সপ্তাহ শেষের ছুটি কাটাবার পক্ষে একটি আদর্শ স্থান।

গান্ধীজীর বাড়ী

গান্ধীজীর বাসস্থানটি বর্তমানে বালমন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে একটি নার্সারী বিদ্যালয় আছে।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে অনেকগুলি মধ্য শ্রেণীর হোটেল আছে। গুজরাটে হোটেল চার্জ তুলনামূলকভাবে কম। জন প্রতি দৈনিক ২০ থেকে ৪০ টাকার মধ্যে থাকা ও খাবার জায়গা পাওয়া যায়। এ ছাড়া ধর্মশালাও আছে।

পোরবন্দর ঃ—

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা সুদামার নামানুযায়ী এই জায়গার নাম ছিল সুদামপুরী। গীতাতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এটি একটি সুন্দর সমুদ্র বন্দর। আরব সাগরের তীরে এই বন্দরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। মহাত্মা গান্ধী এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যানবাহন ঃ—

রাজকোট থেকে জেটলসর হয়ে পোরবন্দরে যাওয়া যায়। রাজকোট থেকে দৈনিক ট্রেন চলাচল করে। আহমদাবাদ থেকে ২৯৬ মাইল এবং বোম্বাই থেকে ৫৮৮ মাইল দূরে অবস্থিত পোরবন্দর। রাজ্য পরিবহন দৈনিক রাজকোট, সোমনাথ ও জুনাগড়ের মধ্যে বাস চালায়। এছাড়া বোম্বাই ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ সপ্তাহে একদিন বোম্বাই থেকে পোরবন্দর যায়। বর্ষাকালে এই পথ বন্ধ থাকে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

সুদামা মন্দির

কৃষ্ণের বাল্যসখা সুদামার মন্দির।

পোরবন্দর বেলাভূমি

আরবসাগরের এই বেলাভূমি উইলিংডন ম্যারীনা নামেও পরিচিত। এখান থেকে আরবসাগরের দৃশ্য অতি সুন্দর।

গান্ধীভবন

এই গৃহে মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কীর্তি মন্দির

এই নূতন মন্দিরটি গান্ধীর নাম এবং কীর্তিকে অমর করে রাখার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। ৭৯ ফুট দীর্ঘ এর শিখরদেশ মনে করিয়ে দেয় মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের বয়সকে। ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন বলে ৭৯টি বাতি এখনও এখানে জলে। প্রদেশদ্বারের চারিদিকের মার্বেল প্রস্তর ফলকে গান্ধীজীর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা সকল লেখা আছে। নীচের তলায় ২৮টি স্তম্ভে তাঁর বাণী উৎকীর্ণ আছে। এই মন্দিরের স্থাপত্যকর্ম হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পারসিক প্রভৃতি সকল উপাসনা স্থান থেকে নেওয়া।

বিলেশ্বর মন্দির

বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত মহাদেবের এই মন্দিরটিও আলাউদ্দিনের দৃষ্টির আড়ালে যায় নি। আলাউদ্দিন এই মন্দিরটিকে আংশিকভাবে ধ্বংস করেছিলেন।

মাধবপুর মন্দির

কথিত আছে, এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ হয়েছিল। এটি পোরবন্দর থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

থাকবার স্থান ঃ—

পোরবন্দরে অনেকগুলি হোটেল আছে। খরচ খুব বেশী নয়। ২০ থেকে ৪০ টাকার মধ্যে দৈনিক থাকার এবং খাবার জন্য হোটেল পাওয়া যায়। এছাড়া (১) ভোজেশ্বর অতিথিশালায় থাকার ব্যবস্থা আছে। স্থান সংরক্ষণের

জন্য সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, পূর্তবিভাগ, পোরবন্দরকে লিখুন। (২) পোরবন্দর ভিলা অতিথিশালা—এখানে থাকা এবং খাবার ভাল বন্দোবস্ত আছে। ম্যানেজারের কাছে লিখুন। (৩) ধর্মশালাতেও থাকার ব্যবস্থা আছে।

জুনাগড় :—

দেশীয় রাজ্যটি জুনাগড় ও রাজকোটের মত সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানের গুজরাট রাজ্য যখন সৃষ্টি হয় তখন গুজরাটের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এটি জুনাগড় বিভাগের প্রশাসন অধিকারিক কেন্দ্র। কিন্তু জুনাগড়ের প্রাচীন ইতিহাসও আছে। অশোকের সময়ের গিরনার পাহাড়ে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তা এখানেই। এটির সময় খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ বৎসর। এরপর এর ইতিহাস পাওয়া যায় খ্রীষ্টিয় নবম শতকে। রাজপুতদের একটি দল উপরকোটে পাহাড়ঘেরা শহর নির্মাণ করেন। জুনাগড় ছিল তাঁদের রাজধানী। বর্তমান শহরটি উপরকোটের বিস্তৃত অংশ। পঞ্চদশ শতকে মুসলমান রাজপুতদের স্থান অধিকার করে এবং জুনাগড়ে সুলতানদের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এঁরা ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল।

যানবাহন :—

জুনাগড় পশ্চিম রেলওয়ের রাজকোট-ভেরাবল সেক্সনে অবস্থিত। বোম্বাই থেকে ভেরাবলে গাড়ী বদল করে এখানে আসা যায়। কলকাতা থেকে ভেরাবলে গাড়ী বদল করেও এখানে আসা যায়। দিল্লী থেকে আহমদাবাদ ও ভিরমগামে গাড়ী বদল করতে হয়। মাদ্রাজ থেকে বোম্বে হয়ে এখানে আসা যায়। রাজ্য পরিবহন দৈনিক রাজকোট, ভেরাবল ও জুনাগড়ের মধ্যে বাস চালান

দ্রষ্টব্য স্থান :—

অশোকের শিলালিপি

অশোকের শিলালিপিটি গিরনার পাহাড়ে যাবার পথে অবস্থিত। তিনজন ভিন্ন ভিন্ন রাজা পৃথক পৃথক ভাষায় এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করে করে গেছেন।

গিরনার পাহাড় ও মন্দির

০০০ ফুট উচ্চে গিরনার পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই জৈন মন্দিরটির দৃশ্য

অতি সুন্দর। এখানে ৫টি মন্দির আছে, এর মধ্যে সব থেকে বড় মন্দির নেমিনাথ তৈরী হয় খ্রীষ্টীয় ১২ শতকে। মাউন্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দিরের সঙ্গে গিয়ানের তফাৎ হল, এখানে বিশেষ কোন স্থাপত্যের নিদর্শন নেই। এখানে ৮০০টি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে পাওয়া যায় অম্বমাতার মন্দির। এই মন্দিরের পাদদেশ পর্যন্ত বাস এবং ট্যাংগা আছে। উপরে উঠতে অক্ষমদের জন্য চেয়ার এবং ডাণ্ডির বন্দোবস্ত আছে।

নরসি মেহতার সমাধিস্থান

'সুদাম চরিত'এর লেখক পরম বৈষ্ণব কবি নরসি মেহতার সমাধি আছে এখানে। এঁর ভজনগান গুজরাটে খুবই প্রসিদ্ধ।

উপরকোট

শহরের মধ্যে অবস্থিত উপরকোট রাজপুত রাজাদের সৃষ্ট দুর্গ এবং প্রাসাদ। বিরাট প্রাচীর দিয়ে দুর্গটি সুরক্ষিত। এই দুর্গের মধ্যে বৌদ্ধদের কয়েকটি গুহা আছে। এছাড়া দুটি কূপ এবং রাজপ্রাসাদ আছে।

মকবারা

এটি জুনাগড়ের নবাবদের সমাধিক্ষেত্র।

থাকবার স্থান ঃ—

(১) সরকারী গেস্ট হাউব, (২) পি. ডব্লু. ডি. রেস্ট হাউস, (৩) ডাক-বাংলো। থাকবার জন্য লিখতে হয়—Executive Engineer, P. W. D. Junagadh, Gujrat. এছাড়া অনেকগুলি ধর্মশালাও আছে।

ভাবনগর ঃ—

প্রায় ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতরা ভাবনগরে এসে রাজ্য স্থাপন করেন। সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনোরম।

যানবাহন ঃ—

ভিরমগাম থেকে সুরেন্দ্রনগর হয়ে রেল লাইনটি ভাবনগর পর্যন্ত গেছে। বোম্বে থেকে ভিরমগামে গাড়ী বদল করে এখানে আসা যায়। দূরত্ব ৪৭৩ মাইল। এছাড়া সরকারী পরিবহন আহমদাবাদ, রাজকোট ও ভাবনগরের মধ্যে বাস চালান।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

গান্ধীস্মৃতি

এই গৃহে গান্ধীজীর জীবনী জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। এই সংগ্রহশালাটি গান্ধীর স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত। নীচের তলায় সংগ্রহশালা এবং দ্বিতীয় তলে গান্ধীর প্রচুর ফটোগ্রাফ রাখা আছে।

গৌরীশংকর হ্রদ

শহরের বাইরে চড়ুইভাতি করার একটি সুন্দর স্থান।

তখতেশ্বর মন্দির

পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই মন্দিরের বিশেষ আকর্ষণ হল, এখান থেকে শহরের দৃশ্য অতি মনোরম। ক্যাম্বে উপসাগরের দৃশ্যও সুন্দর।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে মাঝারি ধরনের অনেকগুলি হোটেল আছে, যেখানে দৈনিক জন প্রতি ২০ থেকে ৪০ টাকা থাকা ও খাবার জন্য লাগে। এছাড়া সরকারী অতিথিশালাতেও থাকবার এবং খাবার ব্যবস্থা আছে। সংরক্ষণের জন্য নির্বাহী বাস্তকার, পূর্তবিভাগ, ভাবনগরকে লিখতে হয়। (Executive Engineer. P. W. D., Bhabnagar, Gujarat.)

জামনগর ঃ—

১৯৪৭-এর পর এই দেশীয় রাজ্যটি কাথিওয়াড়-এর অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু গুজরাট রাজ্য সৃষ্টি হলে এর সঙ্গে মিলে যায়। বর্তমানে জামনগর একটি জেলা সদর। রাজপুতদের একটি সম্প্রদায় জামনগরের প্রতিষ্ঠা করেন ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪৭ পর্যন্ত এঁদের বংশধরেরাই এখানে রাজত্ব করেছিলেন।

যানবাহন ঃ—

রাজকোট থেকে সরাসরি রেলপথ আছে জামনগর পর্যন্ত। জামনগর, ভিরমগাম-ওখা সেকসনের একটি রেলস্টেশন। কলকাতা থেকে ভিরমগাম-এ গাড়ী বদল করে সহজেই জামনগর আসা যায়। বোম্বাই থেকেও আহমদাবাদ ও ভিরমগাম হয়ে জামনগর আসা যায়। মাদ্রাজ থেকেও অনুরূপভাবে বোম্বাই

হয়ে এবং দিল্লী থেকে আহমদাবাদ, ভিরমগাম হয়ে এখানে আসা যায়। এছাড়া রাজ্য পরিবহন সংস্থা রাজকোট এবং জামনগরের মধ্যে বাস চালান। এছাড়া দ্বারকা জামনগরের মধ্যেও বাস চালু আছে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

জামনগরের রাজপ্রাসাদটি দেখতে খুবই সুন্দর। শহরের মধ্যে একটি হ্রদ আছে, সেখানে একটি যাদুঘরও আছে। পুরানো কেল্লার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র যেখানে রক্ষিত হয় তার নাম লাগোটা কোঠা। এছাড়া এখানে সূর্যরশ্মি দিয়ে চিকিৎসা করবার কেন্দ্র আছে যা ভারতের আর কোথাও নেই।

থাকবার স্থান :—

এখানে কয়েকটি মাঝারি ধরনের হোটেল আছে, যেখানে থাকা এবং খাবার জন্য জন প্রতি দৈনিক ২০ থেকে ৪০ টাকা খরচ পড়ে। এছাড়া অনেক ভাল ধর্মশালা আছে, যেখানে থাকবার ভাল ব্যবস্থা আছে। লাল বাংলো বা সরকারী অতিথিশালাতেও থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা করা যায়। এর সংরক্ষণের জন্য নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্তবিভাগ, জামনগর-এর (Executive Engineer P. W. D., Jamnagar, Gujrat.) নিকট আবেদন করতে হয়।

দ্বারকা :—

দ্বারকা হিন্দুদের সপ্ত তীর্থের অন্যতম তীর্থ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ছেড়ে দ্বারকাতে এসে তাঁর বিবিধ কর্ম শুরু করেন।

যানবাহন :—

জামনগর থেকে মাত্র ৮৭ মাইল দূরে দ্বারকা, ভিরমগাম-ওখা শাখায় অবস্থিত। বোম্বাই থেকে ভিরমগাম হয়ে দ্বারকা যাওয়া যায়। কলকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লী থেকে অনুরূপভাবে দ্বারকা যাওয়া যায়। এছাড়া রাজ্য পরিবহন ও প্রাইভেট কোম্পানী দ্বারকা, ওখা, রাজকোট ও জামনগরের মধ্যে বাস চালান। বোম্বে ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী বর্ষাকাল ছাড়া সপ্তাহে একটি করে জাহাজ চালান, যেটি ওখা পর্যন্ত যায়। ওখা থেকে দ্বারকা মাত্র ১৯ মাইল।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

দ্বারকানাথের মন্দির

গোমতি নদীর ধারে দ্বারকানাথের এই মন্দিরটির প্রসিদ্ধি আছে। কথিত

আছে শ্রীকৃষ্ণের নাতিরা এটি নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নামে মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত। হিন্দু ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক এই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

রুক্মিণী মন্দির

শহর থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত এই মন্দির। এটি কৃষ্ণ সহচরী রুক্মিণীর নামে উৎসর্গীকৃত।

স্কটস সিট

এখান থেকে আরবসাগরের তীরভূমির দৃশ্য অতি মনোরম।

থাকবার স্থান ঃ—

দ্বারকাতে কয়েকটি সাধারণ হোটেল আছে, যেখানে দৈনিক জন প্রতি ২০ থেকে ৩৫ টাকা থাকা ও খাবার জন্য লাগে। তবে এখানে ধর্মশালাতেই থাকবার বেশী সুবিধা। প্রায় ২০টির ওপর ধর্মশালা আছে, সেখানে অতি সহজেই থাকা যায়। এ ছাড়া জেলা পরিষদ বাংলোতে (District Board, Bungalow) থাকার জায়গা আছে। সংরক্ষণের জন্য প্রেসিডেন্ট-এর নিকট লিখতে হয়। পূর্তবিভাগের বিশ্রামালয় আছে। নির্বাহী-বাস্তুকার, পূর্তবিভাগ ওখা-র নিকট আবেদন করতে হয়। (Executive Engineer, P. W. D., Okha, Dwarka, Gujarat.)

পালিতানা ঃ—

গোহেল রাজপুতদের বাসস্থান ছিল। কিন্তু এই স্থান জৈন মন্দিরের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৮৬৩টি মন্দির দিয়ে তৈরী এই স্থান। এটি শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের উপর অবস্থিত, যার উচ্চতা ২০০০ ফুট। জৈন পর্বত-মন্দিরের মধ্যে শত্রুঞ্জয় পর্বত-মন্দির পার্বত্য পরিবেশের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর।

যানবাহন ঃ—

পালিতানা পশ্চিম রেলের একটি স্টেশন। ভাবনগর থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৩১ মাইল। কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ ও দিল্লী থেকে আহমদাবাদ এবং ভিরমগামে গাড়ী বদল করে এখানে আসা যায়। এছাড়া ভাবনগর ও পালিতানার মধ্য নিয়মিত বাস চলাচল করে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

মন্দির

প্রায় ৮৬৩টি মন্দির নিয়ে গঠিত পালিতানা। রেল স্টেশন থেকে ২ মাইল

দূরে শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই মন্দির জৈনদের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে উঠতে হয়। প্রায় ২½ মাইল হেঁটে উঠতে হয়। যাঁরা হাঁটতে পারেন না তাঁদের জন্য ডোলী এবং ডাণ্ডীর ব্যবস্থা আছে। আদিশ্বর মন্দিরটি সব থেকে সুন্দর। দেবতার প্রচুর পরিমাণে হীরা জহরত এখানে সঞ্চিত আছে। এটি দেখার সময় বিকাল ৪টা। মন্দির এবং হীরা জহরতের ছবি তুলতে গেলে মুনিমজীর অনুমতি নিতে হয়।

হাওয়া মহল

এটি পালিতানা মহারাজাদের বাসগৃহ। এটি দেখবার অনুমতি পাওয়া যায়। লিখতে হয়, পালিতানা মহারাজার ব্যক্তিগত উপদেষ্টার কাছে।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে কয়েকটি সাধারণ হোটেল আছে। তবে ধর্মশালাতেই থাকা শ্রেয়। কম করেও ৫০টি ধর্মশালা আছে। দুটি সরকারী আবাসস্থল আছে, কিন্তু খাবার ব্যবস্থা নেই। এর অনুমতির জন্য সহকারী বাস্তুকার, পূর্তবিভাগ, পালিতানাকে লিখতে হয়।

সোমনাথ ঃ—

প্রভাস তীর্থ বা সোমনাথ তীর্থ সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত। এটি হিন্দু ও জৈনদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই মন্দিরটি সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা এই মন্দিরটি ৭ বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পুরাতন মন্দিরের স্থলে একটি নতুন শিব মন্দির নির্মিত হয়েছে। পুরাতন মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পের ধ্বংসাবশেষ যাদুঘরে রাখা আছে। মন্দিরের কাছেই একটি ফাঁকা জায়গা আছে। কথিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে দেহত্যাগ করেছিলেন। পুরাণ অনুযায়ী 'সোম' (চন্দ্র)-কে দক্ষ ধ্বংস করেছিলেন। এর ফলে দিন দিন চন্দ্র তার জ্যোতি ও গৌরব হারাতে থাকেন। চন্দ্র এ অবস্থায় অনেকদিন তপস্যা করেন, কিন্তু কোন ফললাভ হয়নি। তখন দক্ষ তাঁকে যুক্তি দিলেন যে, সরস্বতী নদী যেখানে সাগরে পড়েছে সেখানে স্নান করে শিবের উপাসনা করলে ফললাভ হবে। এই কথায় কাজ হল এবং এই স্থানে চন্দ্র আবার তার পুরানো জ্যোতি ফিরে পান। তাই এই তীর্থের নাম প্রভাস পাটন বা সোমনাথ পাটন।

যানবাহন ঃ—

ভিরমগাম থেকে রাজকোট, জুনাগড় হয়ে ভেরাবল স্টেশন। এখন থেকে সোমনাথ বাসে যাওয়া যায়। বোম্বাই, দিল্লী, কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে রাজকোট হয়ে ভেরাবল যাওয়া যায়। সোমনাথ থেকে পোরবন্দর বাস পাওয়া যায়, যা ভেরাবল হয়ে যায়। ভেরাবল ও জুনাগড়ের মধ্যেও বাস চলাচল করে। এছাড়া বোম্বে থেকে ষ্টিমারে ভেরাবল আসা যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

ভলকা তীর্থ

কথিত আছে যখন শ্রীকৃষ্ণ একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করছিলেন তখন হঠাৎ একটি তীর এসে তাঁর প্রাণনাশ করে। ভেরাবল ও প্রভাসের মধ্যে এই ভলকা তীর্থ অবস্থিত।

সোমনাথ মন্দির

এটি পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের উপর নির্মিত। এটিতে শিবলিঙ্গ আছে। প্রাচীন মন্দিরের লিঙ্গটি সম্পূর্ণ সোনার তৈরী ছিল। সুলতান মাহমুদ সেটি গজনীতে নিয়ে চলে যায়। এই মন্দিরে আরতির সময়ের দৃশ্য খুবই সুন্দর।

জুনাগড় ফটক

এই ফটক দিয়ে হাজার হাজার সৈন্যসহ গজনীর সুলতান মাহমুদ এখানে আসে এবং রাজপুত যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সোমনাথ লুণ্ঠন করে।

থাকবার স্থান ঃ—

দু-একটি সাধারণ হোটেল আছে। জন প্রতি ২০ থেকে ৪০ টাকা খরচ লাগে। কয়েকটি ধর্মশালা আছে, যেখানে থাকবার সুব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া রাজেন্দ্র ভবন অতিথিশালা ও পূর্ত বিভাগের অতিথিশালাও আছে। এখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে। সংরক্ষণের জন্য সহকারী বাস্তুকার, পূর্তবিভাগ, ভেরাবল-এর কাছে লিখতে হয়।

গির-সংরক্ষিত বন ঃ—

গুজরাটের এই জায়গাটি সারা ভারতের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র এই বনেই সিংহ পাওয়া যায়। সিংহ শিকার একেবারে

নিষিদ্ধ। প্রায় ৩০০টি সিংহ এখানে আছে। এছাড়া অন্যান্য হিংস্র জন্তুও এখানে আছে।

যানবাহন ঃ—

'শাসন-গিরি,' খিজাদিয়া-ভেরাবল সেকসনের একটি স্টেশন। ভেরাবল থেকে ১৫ মাইল, কেশোধ থেকে ৫৪ মাইল এবং জুনাগড় থেকে ৪৫ মাইল এর দূরত্ব। বোম্বে, দিল্লী, কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে আহমদাবাদ, ভিরমগাম, রাজকোট হয়ে ভেরাবল যাবার পথে গির অবস্থিত।

থাকবার স্থান ঃ—

গিরে পর্যটকদের প্রচণ্ড ভীড় হয়। তাই বেশ কিছু আগে মহকুমা বন-অফিসারকে লিখতে হয়। থাকবার জায়গাও বনবিভাগের বাংলোতে। সিংহ দেখবার ব্যবস্থাও বনবিভাগ করেন। তাই যথেষ্ট আগে না লিখলে গিয়ে হতাশ হতে পারেন। সিংহ দেখবার সবচেয়ে ভাল সময় গ্রীষ্মকাল, অর্থাৎ মার্চ থেকে মে মাস। এই সময় সিংহগুলি জল খাবার জন্য জলাশয়ে ঘন ঘন আসে। দেখার প্রকৃষ্ট সময় খুব ভোরে অথবা সন্ধ্যার দিকে। ২০ জনের সিংহ দেখার জন্য খরচ লাগে প্রায় ১৫০ টাকা। একজন হলেও ঐ একই টাকা খরচ লাগে।

বরোদা ঃ—

পাবাগড় পাহাড়ের উপর যেখান থেকে বিশ্বামিত্র নদী বেরিয়েছে সেখানে মুনি বিশ্বামিত্র একবার তপস্যা করেছিলেন। তাঁর নাম থেকে নদীর নাম হয়েছে বিশ্বামিত্র। এই নদীর তীরে বর্তমানের বরোদা শহর। বরোদা প্রাচীনকাল থেকে বহুবার হাত বদল হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এসেছে ক্ষত্রপ, সোলাংকি, গলজি, দিল্লীর স্থলতানগণ এবং রাজপুতরাজ গায়কোয়াড়। বর্তমান শহরের সাজসজ্জা করেছিলেন তৃতীয় সওয়াজীরাও। প্রভূত পরিমাণ অর্থব্যয় করেছিলেন তিন রাজধানীটিকে গড়ে তোলার জন্য। বর্তমানে ইহা গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত।

যানবাহন ঃ—

বরোদা, বোম্বে-দিল্লী ও বোম্বে-আহমদাবাদের সংযোগস্থল। পশ্চিম

রেলওয়ের একটি বড় জংশন স্টেশন। দিল্লী থেকে ৬২০ মাইল, বোম্বাই থেকে ২৪৫ মাইল এবং আহমদাবাদ থেকে ৬২ মাইল এর দূরত্ব। কলকাতা থেকে বোম্বে মেলে (নাগপুর হয়ে) ভিরমগামের বগীতে সরাসরি বরোদা যাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকে বোম্বে হয়ে বরোদা যাওয়া যায়। এছাড়া বোম্বে ও আহমদাবাদ থেকে সরাসরি বাস পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

ন্যায় মন্দির

স্বরসাগর হ্রদের পাশে নির্মিত এই ন্যায় মন্দিরটির বরোদার মহারাজার ন্যায়-বিচারের স্থান। বরোদা যখন দেশীয় রাজ্য ছিল তখন সমস্ত স্থানের আদালত এখানে বসত। মহারাজ তারপর বিচার করতেন। বর্তমানে বরোদা একটি জেলা। আদালতগুলি এখনও এই গৃহেই বর্তমান। এই প্রাসাদটির বহির্ভাগ এবং উচ্চ কামান দাগার স্থানটি অত্যন্ত সুন্দর।

স্বুরসাগর হ্রদ

শহরের অভ্যন্তরে ১০০০ ফুট লম্বা এবং ৬০০ ফুট চওড়া এই হ্রদ। রাত্রিতে আশেপাশের গৃহের এবং রাজপ্রাসাদের আলোর প্রতিফলন দেখার মত।

লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ

মহারাজা বরোদার বাসস্থান এই লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদটি ভারতের বিভিন্ন জায়গার দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটির গঠনশৈলী ও স্থাপত্য ভাস্কর্য মনোমুগ্ধকর। এছাড়া এই প্রাসাদে মহারাজাদের সংগৃহীত শিল্পকলা, চিত্র ও স্থাপত্যের নিদর্শন বিশেষভাবে দর্শনীয়। সাধারণের নিকট এই রাজপ্রাসাদ উন্মুক্ত, তবে দেখবার আগে রাজার সেক্রেটারীর অনুমতি নিতে হয়।

কীর্তি মন্দির

এই ভবনে গায়কোয়াড় পরিবারের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। বিভিন্ন পাথরের সংমিশ্রণে এই ভবনটি তৈরী। বিখ্যাত চিত্রকর নন্দলাল বসু এই ভবনটির দেওয়াল চিত্রিত করেছিলেন।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে একাধিক ভাল ভাল হোটেল আছে। থাকা এবং খাবার জন্য জন প্রতি দৈনিক ২০ থেকে ৪০ টাকার মত লাগে। এছাড়া—

(১) সার্কিট হাউসে থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে, কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীদের জন্য। সংরক্ষণের জন্য কালেক্টর, বরোদার কাছে আবেদন করতে হয়।

(২) মিউনিসিপ্যাল বিশ্রামাগারেও থাকা খাবার ব্যবস্থা আছে। মুখ্য মিউনিসিপ্যাল অফিসারকে লিখতে হয়।

(৩) বেশ কয়েকটি ধর্মশালাও আছে, সেখানে থাকা এবং খাবার ভালো বন্দোবস্ত আছে।

॥ মহারাষ্ট্র ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

একদিকে বিন্ধ্য পর্বত আর অন্যদিকে আরব সাগর-এর মধ্যে অবস্থিত মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রের নাম বিরাট এক রাষ্ট্রের ভাবনা এনে দেয় মনে। সত্যই তাই, বীর মারাঠাদের শৌর্য বীর্যের সঙ্গে জড়িত এই মহারাষ্ট্রের ইতিহাস। এই রাজ্যের দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে এর কাহিনী উপকাহিনী। এর দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ মনে করিয়া দেয় এর বিগত দিনের কথা। মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাতের সূচনা করেন মহারাজা শিবাজী, যাঁর আক্রমণে শঙ্কিত হয়ে ওঠে অউরঙ্গজেবের সুবিশাল সাম্রাজ্য। পার্বত্য মুষিকের সঙ্গে যুদ্ধে এত বড় মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। তারপর শুরু হয় মারাঠাদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য এবং ইংরাজদের যুদ্ধ, যার শেষ পরিণতি ইংরাজদের ভারত সাম্রাজ্য। উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ; দক্ষিণে মহীশূর ; পশ্চিমে আরব সাগর ও পূর্বে অন্ধ্র এবং মধ্যপ্রদেশ—এই চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত মহারাষ্ট্র রাজ্যটি।

বোম্বাই ঃ—

একদিকে পশ্চিমঘাট পর্বত এবং অপর দিকে আরব সাগরের নির্মল বাতাস বোম্বাই-এর আবহাওয়াকে অত্যন্ত সুখস্পর্শ করে তুলেছে। তবে এখানে শীত একেবারে থাকে না বললেই চলে। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম বিশ্বজনীন শহর বোম্বাই। বিভিন্ন জাতির জনসাধারণের বসবাস এখানে। পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম শহর হিসাবে বোম্বাইয়ের স্বীকৃতি আছে। এ ছাড়া যেহেতু বোম্বাই একটি বড় বন্দর, তাই এর সঙ্গে পশ্চিম বিশ্বের যোগাযোগ খুবই সহজতর। এক সময় বাণিজ্যব্যপদেশে পারস্য থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা আর ফিরে না গিয়ে এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। এমন কি পার্শীদের একটি আলাদা অঞ্চলই আছে এখানে। এছাড়া বোম্বাই ব্যবসা কেন্দ্র ও শিল্পনগরী হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

যানবাহন ঃ—

বোম্বে রেলপথে সরাসরি কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও আহমদাবাদের সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা থেকে ৪টি গাড়ী আছে সরাসরি বোম্বাই যাবার। দুটি নাগপুর হয়ে যায় এবং বাকি দুটি এলাহাবাদ হ'য়ে যায়। বর্তমানে গীতাঞ্জলী এক্সপ্রেস হয়েছে। মাদ্রাজ থেকে অনেকগুলি এবং দিল্লী থেকেও অনেকগুলি গাড়ী আছে। এর মধ্যে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ীও আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের অন্যতম দ্রুততম গাড়ী বোম্বাই এবং দিল্লীর মধ্যে যাতায়াত করছে। এর নাম রাজধানী এক্সপ্রেস। ট্রেন পথে পুনা, বেলগাম, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি বড় বড় সব জায়গার সঙ্গেই বোম্বে যুক্ত। এছাড়া সপ্তাহান্তিক ষ্টীমার চলাচল করে বোম্বে ও সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে। বোম্বে ও গোয়ার মধ্যেও ষ্টীমার যাতায়াত করে। বাস পথে বোম্বে—পুনা, বেলগাম, অউরঙ্গাবাদ, নাগপুর আহমদাবাদ, স্বরাট্, বরোদা, আবু পাহাড় প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে নিয়মিত যুক্ত। শহর ঘোরার জন্য পাওয়া যায় ট্যাক্সি, বাস, অটো রিক্সা প্রভৃতি।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া

ভারতের প্রবেশদ্বার। আরব সাগর বিধৌত এই গেটটি দর্শনীয় স্থান। বিদেশ থেকে যাঁরা জাহাজে করে ভারতে আসেন, তাঁদের এখান দিয়ে আসতে হয়। আরোহীদের বিশ্রামের জন্য এখানে লোহার রেলিং দেওয়া একটি গুমটি ছিল। কিন্তু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে যখন পঞ্চম জর্জ ও রাণী ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁদের সম্বর্ধনার জন্য এখানে একটি সুন্দর চত্বর নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে এখানে স্থায়ীভাবে এই মিনারটি তৈরী করা হয়েছে। এর স্থাপত্যের পরিকল্পনা এক ইংরাজ স্থপতির, কিন্তু তিনি হিন্দু ও মুসলমানী স্থাপত্যের সংমিশ্রণে এটির পরিকল্পনা করেন। এর পাশেই মহারাষ্ট্রের জনক মহারাজা শিবাজির একটি অশ্বারোহী প্রতিমূর্তি আছে।

জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্ট মিউজিয়াম গৃহে আর্ট গ্যালারী অবস্থিত। সমসাময়িক ফটো এবং চিত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা এখানে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পোতাশ্রয় (হারবার)

বোম্বাই আরব সাগরের কূলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে স্বভাবতই বন্দর

গড়ে উঠেছে। বন্দরের প্রয়োজনেই এখানে সৃষ্টি হয়েছে পোতাশ্রয়। শুধু জাহাজের বিশ্রামস্থলই নয়, হাজার হাজার মণ মাল বহনকারী পণ্যবাহী জাহাজগুলি এখানে মাল খালাসের জন্য রয়েছে। ভীষণ ব্যস্ত এই বন্দর বছরে প্রায় ৪০০০ জাহাজের মাল খালাস ও ভর্তি করে। ব্যালার্ড পিয়ারে যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণের ডক আছে। আলেকজান্দ্রা ডকে জাহাজ আগমন ও বহির্গমনের ব্যবস্থা আছে। এই বন্দরটি এমনই ব্যস্ত বন্দর যে প্রায়শই অনেকগুলি জাহাজকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয় এখানে। এ ছাড়া সাগরে ভ্রমণ উপভোগের জন্য ছোট ছোট নৌকা এবং লঞ্চ পাওয়া যায়।

যাদুঘর

বোম্বাইয়ের যাদুঘরটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন পঞ্চম জর্জ। তখনকার নাম অনুযায়ী যাদুঘরটির নাম ছিল প্রিন্স অব ওয়েলস যাদুঘর। স্যার রতন টাটার সংগৃহীত বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য রাজপুত ও মোগল অঙ্কনরীতির চিত্রগুলি এখানে স্থান লাভ করেছে। এছাড়া ফারসী, ইতালীয়, বৃটিশ, ডাচ প্রভৃতি দেশের একাধিক নামী চিত্রকরের চিত্র এখানে রক্ষিত আছে। প্রাচ্যকলার নিদর্শন এখানে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

ফ্লোরা ফাউন্টেন

বোম্বে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই ঝরণাটি বিশেষ উপভোগ্য। বাণিজ্যিক এলাকার বৃহৎ বৃহৎ ঘরবাড়ীর মধ্যে এর দৃশ্য অতি মনোরম। প্রায় দেড় মাইলের মধ্যে শহরের বিশেষ বিশেষ ভবনগুলি নির্মিত। মহাকরণ ভবন, বিশ্ববিদ্যালয়, মুখ্য বিচারালয় প্রভৃতি এখানে অবস্থিত।

চৌপাট্টী

অলকেশ্বর মন্দিরের নীচ দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে সেটি চৌপাট্টীতে এসে মিশেছে। একপাশে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাগুলি অতি মনোরমভাবে সাজান আর একদিকে সাগরের বেলাভূমি। সন্ধ্যায় এর দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। এখানে বল্লভভাই প্যাটেল ও বালগংগাধর তিলকের প্রস্তরমূর্তি আছে। সন্ধ্যায় মুক্তবায়ু সেবনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু চা জলখাবার খাওয়া এখানকার একটা রেওয়াজ।

ঝুলন্ত বাগান

চৌপাট্টীর রাস্তার ধারে মালাবার পাহাড়ের উপরে উঠলে প্রথমে পড়ে

কমলা নেহেরু পার্ক। এটি একটি বেড়াবার উপযুক্ত স্থান। আর একটু উপরে উঠে গেলে পাওয়া যায় ফিরোজ শাহ মেহতা উদ্যান বা ঝুলন্ত উদ্যান। ঝুলন্ত উদ্যান নামকরণের সার্থকতা সম্ভবতঃ পাহাড়ের ধাপে ধাপে এটি তৈরী বলে। এর থেকে, বোম্বে শহরের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

অলকেশ্বর মন্দির

একাদশ শতকে নির্মিত বালুকার দ্বারা তৈরী শিবমূর্তি আছে। এখানে একটি পুষ্করিণী ও অনেকগুলি ছোট ছোট গৃহ এবং মন্দির ছড়ান আছে। এর সামনের রাস্তা দিয়ে গেলে রাজভবন যাওয়া যায়।

তারাপোরওয়ালা মীনপোষ

ভারত মহাসাগরের অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মাছ রাখা হয়েছে এখানে পর্যটকদের মন ভরানোর জন্য। এখানে গবেষণারও ব্যবস্থা আছে। মেরিন ড্রাইভের পাশে এই মীনপোষ অতি মনোরম।

মেরিন ড্রাইভ

মাত্র ৩০ বছর আগে সাগর থেকে পাওয়া এই জায়গাটি আজকের বিস্ময়। একদিকে সাগরের নীল জলের স্রোত, আর অন্যদিকে একই ধরনের সুন্দর সুন্দর বাড়ী চোখ দুটিকে গভীরভাবে তৃপ্ত করে। সন্ধ্যায় মেরিন ড্রাইভের ধার ধরে চক্কর লাগানো বিশেষ আনন্দদায়ক।

কানহেরী গুহা

বৃহত্তর বোম্বের মধ্যে অবস্থিত। পশ্চিম রেলপথের বরিভিলি স্টেশন থেকে মাত্র ৫ মাইল। এখানে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নির্মিত ১০৯টি চৈত্য এবং বিহার আছে। কিছু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ এবং এই গুহাগুলি নির্মাণ করেন। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর খাঁজ কেটে নির্মাণ করা হয়েছে সিঁড়ি, যা দিয়ে গুহা থেকে বসবার আসনে যাওয়া যায়। বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত।

কার্লা গুহা

বোম্বাই থেকে ৯০ মাইল দূরে পালমঘাট পাহাড়ের উপর অবস্থিত লোনাভলা স্টেশন। এটি পশ্চিম রেলের বোম্বাই-পুনা রুটে অবস্থিত। এখান থেকে

ট্রেন এবং বাসে করে কার্লা গুহায় যাওয়া যায়। ভারতে অবস্থিত বৌদ্ধ চৈত্যের মধ্যে সম্ভবতঃ এটিই সব থেকে বড়।

এলিফ্যান্টা গুহা

বোম্বাই বন্দর থেকে মোটরবোটে এক ঘণ্টার রাস্তা এলিফ্যান্টা দ্বীপ। এই দ্বীপের পাহাড়ের দিকে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গুহাগুলি। এগুলি অষ্টম শতকের, পাহাড় খুঁদে তৈরী। এখানকার নির্মিত মূর্তিগুলির বেশীর ভাগই প্রমাণ মাপের। কিন্তু আবক্ষ মহেশ মূর্তিটি স্থাপত্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। হস্তি দ্বীপের নামকরণের কারণ হল, এখানে পাহাড়ে খোদিত একটি বৃহৎ হস্তিমূর্তি আছে। এখানে এ্যাপোলো বন্দর থেকে দৈনিক এবং বিশেষ করে ছুটির দিনে একাধিক মোটরবোট যাতায়াত করে। বর্ষাকালে অবশ্য বন্ধ থাকে। এখান থেকে ফেরবার পথে ট্রম্বের আনবিক গবেষণা কেন্দ্রটি সুন্দর দেখায়।

জুহু বীচ

এখানে সাগরের দৃশ্য অতীব মনোরম।

থাকবার স্থান ঃ—

বোম্বাই-এ একাধিক উচ্চমূল্যের হোটেল আছে যা মধ্যবিত্তদের পকেটের উপযোগী নয়। অবশ্য মধ্যবিত্তদের উপযোগী হোটেলও আছে। বেঙ্গলী হোটেল যদিও বাঙালীর নয় তবুও বেশীর ভাগ বাঙালীই এই হোটেলে ওঠেন। এদের খাবার ও থাকার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই। জনপ্রতি দৈনিক ২৫ থেকে ৪০ টাকা লাগে থাকা ও খাবার জন্য। এছাড়া বোম্বেতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকার অনেক ব্যবস্থা আছে। এর জন্য পর্যটন অফিসার, ভারত সরকার, বোম্বেকে লেখা যায়। অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও থাকার ব্যবস্থা আছে। যেমন—ওয়াই, এম, সি, এ ; ওয়াই, ডব্লু, সি, এ প্রভৃতি।

পুনা ঃ—

মহারাষ্ট্র ভারত ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল স্থান। মারাঠা বীর শিবাজীতে যার শুরু, তার শেষ ইংরাজদের ভারত অধিকারে। শিবাজী থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী অধ্যায়ের অনেক স্বনামধন্য ঐতিহাসিক নেতার কর্মকীর্তিতে পুনা ধন্য।

যানবাহন ঃ—

পুনা, বোম্বে-হায়দ্রাবাদ, এবং বোম্বে-মাদ্রাজ মেন রুটে অবস্থিত। বোম্বে থেকে এর দূরত্ব ১১৯ মাইল। বোম্বে থেকে পুনা সমগ্র পথটি বৈদ্যুতিক লাইনে যুক্ত, তাই বোম্বে থেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন গাড়ীও আছে, যাতে অতি সহজেই পুনা পৌঁছান যায়। বোম্বে, অউরঙ্গাবাদ, আহমদনগর প্রভৃতি জায়গা থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

পুনা, সাতারা, পুরন্দর

নামকরা এইসব ঐতিহাসিক স্মৃতি সম্বলিত দুর্গগুলি আজও দর্শকদের দৃষ্টিকে অকের্ষণ করে। সরকারী এবং বেসরকারী বাস এইসব স্থানে যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে থাকে।

খড়গভসলা

এখানে জাতীয় শিল্পকেন্দ্র আছে। পুনা থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপন কেন্দ্র

ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মাণের কেন্দ্রটি এখানে অবস্থিত।

মহাবালেশ্বর

পুনা থেকে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থানটি মনোমুগ্ধকর। পশ্চিমঘাট পর্বতে অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক হ্রদসহ সমগ্র জায়গাটির দৃশ্য অতীব মনোরম। পুনা থেকে নিয়মিত বাস যায়। এখানে থাকার ভাল ভাল হোটেল আছে।

বাজীরাও প্রাসাদ

পেশোয়াদের লীলাক্ষেত্র পুনা। এখানে অনেক উত্থান-পতনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। বাজীরাও-এর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। ইংরাজরা এই প্রাসাদটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দেয়। এর গেটটি এখনও বর্তমান। প্রসিদ্ধ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক চুক্তি ইংরাজদের সঙ্গে এখানেই সংঘটিত হয়েছিল, যার ফলে মারাঠার গৌরব-রবি অস্তমিত হয়েছিল।

কালীবাড়ী

পুনা শহরের সব থেকে উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই কালী-মন্দিরটি

অতি প্রাচীন। অনেকগুলি সিঁড়ি পেরিয়ে তবে এই মন্দিরে পেঁৗছান যায়। কথিত আছে এই কালী-মন্দিরটি শিবাজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং শিবাজী এখানে পূজা করে যুদ্ধযাত্রা করতেন।

কির্কি

পুনা থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থানে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানা আছে। এছাড়া এখানে একটি মিলিটারী ছাউনিও আছে।

অউরঙ্গাবাদ :—

অউরঙ্গজেবের নামের সঙ্গে জড়িত এই শহরটি ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত। এখানে সম্রাট অউরঙ্গজেব ও তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর কবর আছে। তাছাড়া এর কাছেই আছে দৌলতাবাদ দুর্গ যা ভারতের মুসলমান শাসনের একটি অন্যতম স্তম্ভ ছিল। অজন্তা এবং ইলোরাতে গ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ২০০ বছর আগে যে গুহা শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল তাও এই অউরঙ্গাবাদের কাছেই। সুতরাং সবদিক থেকে এই স্থানের গুরুত্ব সমধিক।

যানবাহন :—

মানমদ ও সেকেন্দ্রাবাদ সেক্সনে অউরঙ্গাবাদ একটি বড় স্টেশন। হাওড়া থেকে বোম্বাই মেলে সরাসরি মানমদ পৌঁছান যায়। গাড়ী প্রায় ৪-৩০ মিনিট নাগাদ মানমদ পৌঁছায় এবং সকাল ৭টায় অউরঙ্গবাদের গাড়ী ছাড়ে, যাতে বিকালে অউরঙ্গাবাদ পৌঁছান যায়। রেলপথটি পাহাড়ে ঘেরা মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গার উপর দিয়ে যাওয়ায় এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যন্ত উপভোগ্য। সরাসরি অজন্তা যাবার জন্য জলগাঁও জংশন স্টেশনটিই সবচেয়ে সুবিধাজনক। এখান থেকে অজন্তা মাত্র ৩৭ মাইল এবং নিয়মিত বাস আছে। তাছাড়া ইলোরা, পাইথন, বোম্বে, অজন্তা, পুনা, আহমদনগর প্রভৃতি প্রতিটি বড় বড় স্থানের সঙ্গে অউরঙ্গাবাদ যুক্ত। বোম্বে এবং অউরঙ্গাবাদের মধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস দৈনিক যাতায়াত করে। সন্ধ্যায় ছেড়ে পরের দিন ভোরে পৌঁছায়। এখানে ঘোরবার জন্য ট্যাক্সি, টাংগা এবং সাইকেল রিক্সাও পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

দৌলতাবাদ

শহর থেকে ৮ মাইল দূরে ইলোরার পথে এই দুর্গটি অবস্থিত। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যাদব বংশের রাজা ভালোমা এই দুর্গটি তৈরী করেন। এর আসল নাম ছিল দেবাগিরি। কিন্তু মুসলমান যুগে এর নাম পাল্টে রাখা হয় দৌলতাবাদ। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী দুর্গটি দখল করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে মোহম্মদ তুঘলক এই দুর্গ অধিকার করেন। দৌলতাবাদ তাঁরই দেওয়া নাম। আলাউদ্দিন দক্ষিণ বিজয় সমাপ্ত করে বিজয় গৌরবকে অম্লান রাখার জন্য একটি মিনার তৈরী করেন। এটির নাম চাঁদ মিনার। গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা গেলেই এই মিনারটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একপাশে সুদৃঢ় ও সুউচ্চ পর্বত এবং অপর পাশে গড় বা পরিখায় দ্বারা মজবুত এই দুর্গটি মধ্যযুগের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছিল।

অউরঙ্গাবাদ গুহা

প্রায় ১½ মাইল দূরে অউরঙ্গাবাদ গুহাগুলি অবস্থিত। এখানে বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার আছে। তাছাড়া অনেকগুলি গুহাও আছে।

পানচাক্কী

পাহাড়ের ঝরণা থেকে নলের সাহায্যে জল নিয়ে এসে সেই প্রবাহিত জলে গম ভাঙার চাকী ঘোরান হয় বলে এর নাম পানচাক্কী। শাসনকর্তারা গরীব জনসাধারণের কথা চিন্তা করে এটির ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে কোন খরচ নেই। এখানে অউরঙ্গজেবের ধর্মগুরুর সমাধি আছে।

খুলদাবাদ

ইলোরা যাবার পথে শহর থেকে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত অউরঙ্গজেবের সমাধি। প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত এবং অত্যন্ত সাধারণ একটি সমাধি গৃহ।

বিবি কি মকবারা

এটি অউরঙ্গজেবের প্রথমা পত্নীর সমাধিস্থান। তাজমহলের নকলে এটিকে অউরঙ্গজেব নির্মাণ করান। এটি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম স্মৃতিসৌধ।

এইসব দর্শনীয় স্থানের সঙ্গে মহারাষ্ট্র সরকারের পরিবহণ কনডাকটেড ট্যুর-এর যোগাযোগ আছে। সকালবেলায় অউরঙ্গবাদ স্টেশন থেকে বাস

ছাড়ে এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসে। বাসের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত গাইড থাকেন যিনি দেখাতে সাহায্য করেন।

ইলোরা গুহামন্দির

আউরঙ্গাবাদ থেকে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত ইলোরা। ইলোরার সব থেকে বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এখানকার মন্দিরগুলিতে তিন ধর্মেরই ছাপ আছে। অজন্তার মত গভীর বন নেই এখানে। পাহাড়ের গায়ে গুহা এবং মন্দির নির্মাণ আজও দর্শকদের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এগুলি নির্মিত হয়। হিন্দু গুহাগুলির মধ্যে কৈলাশ মন্দির বা রংমহলটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচুর পরিমাণে ভাস্কর্য আছে এই শিব মন্দিরটিতে। এর কারিগরি শৈলী আজও দর্শক মনে সাড়া জাগায়। জৈন গুহাগুলির মধ্যে 'ইন্দ্র সভা', 'জগন্নাথ সভা' দেখবার মত। কেবলমাত্র ভাস্কর্যই নয়, এই গুহাগুলির মধ্যে দেওয়ালের অঙ্কনরীতিও যথেষ্ট মূল্যবান। সাত আটশো বছর আগের এই চিত্রশিল্পগুলি অধিকাংশই ক্ষয়প্রাপ্ত। নতুন অঙ্কনের চেষ্টাও মধ্যে মধ্যে হয়েছে কিন্তু সেগুলি গুণগত বিচারে এতই নিম্নশ্রেণীর যে হাস্যকর বলে মনে হয়। বৌদ্ধ গুহাগুলির মধ্যে তিনতাল ও বিশ্বকর্মা চৈত্যের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই গুহাগুলির ভাস্কর্য অপরূপ। তিনতাল গুহাগুলি ত্রিতল বিশিষ্ট; সন্ন্যাসীদের থাকার জায়গা, প্রার্থনা ঘর এবং বুদ্ধমূর্তি সমন্বিত।

গ্রীশ্নেশ্বর মন্দির

ইলোরা থেকে ১ মাইল দূরে রাণী অহল্যাবাঈ হোলকার নির্মিত গ্রীশ্নেশ্বর মন্দিরটির গঠনশৈলী অনুপম। ভারতের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গমের মধ্যে একটি এখানে অবস্থিত।

অজন্তা গুহা

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ বছর থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্মিত এই গুহামন্দির দীর্ঘকাল মানব চক্ষুর অগোচরে ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির কিছু সৈনিক শিকারের সময় এটিকে আবিষ্কার করে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি গভীর গিরি-খাতের মধ্যে এটি অবস্থিত। নীচ দিয়ে পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে, উঁচু পাহাড়ের মধ্যে এটি অবস্থিত। এখানে ৩০টি পার্বত্যগুহা নির্মাণ করা হয়েছিল দীর্ঘদিন

ধরে। এই গুহাগুলি এমনভাবে তৈরী যাতে দিনের যে কোন সময়ে এখানে সূর্যালোক পড়তো। এই ঘরগুলির অভ্যন্তর ভাগ এবং খিলানগুলি তৎকালীন যুগের ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। ভিতরের দেওয়ালে প্রভূত পরিমাণে অঙ্কিত চিত্র আছে, যা আজও জীবন্ত এবং এক একটি ছবি দেখলে এখনও মনে হয় কয়েকদিন আগেও যেন শিল্পীর হাতের স্পর্শ পেয়েছে। এই অঙ্কিত চিত্রগুলির বেশীর ভাগই বুদ্ধের জীবনীর সঙ্গে জড়িত। এত দীর্ঘদিন ধরে ছবিগুলি অঙ্কিত হলেও বিভিন্ন সময়ের শিল্পীদের অঙ্কন ও গঠনরীতি একই ধরনের। বুদ্ধের জীবনী ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন লক্ষ্য করা যায়। ১, ২, ১৬ ও ১৭ নম্বর গুহাতে অঙ্কন বেশী। এগুলি বিশেষ প্রাণবন্ত। কতকগুলি বৌদ্ধ চৈত্য, আবার কতকগুলি বৌদ্ধ বিহারের আকারে গঠিত। ৮, ৯, ১০, ১৩, ২৮ ও ৩০ নম্বর গুহাগুলি হীনযানের নিদর্শন, বাকিগুলি পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল, কারণ এগুলিতে মহাযানের নিদর্শন সবচেয়ে বেশী।

।। গোয়া ।।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

গোয়া একদা পর্তুগীজ উপনিবেশ ছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। পশ্চিমঘাট পর্বত এবং আরব সাগর বিধৌত দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম। একদিকে গভীর বনানী অন্যদিকে শস্যক্ষেত্র। একদিকে নদী, হ্রদ অপর দিকে সুনীল সাগর। একদিকে মন্দির, মসজিদ অপর দিকে গীর্জা, এ সবের মাঝে উপলব্ধি করা যায় গোয়ার শান্ত সমাহিত রূপটি। বিশ্বের সাগর সৈকতগুলির মধ্যে অন্যতম গোয়ার সাগর সৈকত যেমন তার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, তেমন আকর্ষণ করেছে দেশী এবং বিদেশী পর্যটকদের। সাগরের ধারে ধারে নারিকেল বীথি মনোমুগ্ধকর। গোয়ার ইতিহাস কিন্তু খুবই প্রাচীন। আমাদের পুরাণ এবং মহাভারতে গোয়ার উল্লেখ আছে। ১১ শতকে এখানে কদম্ব রাজারা রাজত্ব করতেন। তারপর গোয়া পঞ্চদশ শতকে বিজয়নগর রাজ্যের অংশভুক্ত হয়। এর পর চলে যায় বাহমনী সুলতানদের হাতে। পঞ্চদশ শতকের শেষে বিজাপুরের আদিলশাহী রাজাদের হাতে গোয়ার শাসনদণ্ড বিরাজ করে। এর পরের যুগ ইউরোপীয় ব্যবসাদারদের প্রতিযোগিতার যুগ। ডাচ. ইংরাজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে গোয়ার অধিকার নিয়ে। ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক ২০টি জাহাজ এবং ১২০০ সৈন্য নিয়ে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে গোয়া অধিকার করে। তখন থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে বাণিজ্যের অন্যতম একটি বন্দর হয়ে ওঠে গোয়া। এর পর মশলা এবং ধর্মান্তরকরণ এই দুই উদ্দেশ্যে প্রভূত পরিমাণে ব্যবসায়ী এবং ধর্মযাজক গোয়ায় আসতে থাকেন। সব থেকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার। পুরানো গোয়াতে এই মহান মানবের সমাধি অবস্থিত।

যানবাহন —

পুনা-বাঙ্গালোর রেলপথের লোণ্ডা জংশনে গাড়ী বদল করে গোয়া আসা যায়। রাজধানী পানাজী যেতে হলে মারগাঁও রেল স্টেশনে নেমে যেতে হয়।

বর্ষাকাল ছাড়া বছরের সব সময়েই বোম্বাই ও গোয়ার মধ্যে জাহাজ চলাচল করে। জাহাজে আরবসাগর এবং গোয়ার উপকূলের দৃশ্য অতি সুন্দর। নীচের ডেকে ৪০ টাকা এবং উপরের ডেকে ৬৫ টাকার মত ভাড়া লাগে। এ ছাড়া গোয়া ভারতের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে বাসপথে যুক্ত। মহীশূর সরকারী বাস দৈনিক বাঙ্গালোর ও গোয়ার মধ্যে চলাচল করে। দূরত্ব ৪০০ মাইলের মত। মহারাষ্ট্র রাজ্যপরিবহন বোম্বাই ও পুনা থেকে গোয়ায় দৈনিক বাস চালান। দূরত্ব যথাক্রমে ৩৭০ মাইল ও ৩০০ মাইলের মত। এ ছাড়া বেলগাম ও হুবলী থেকে নিয়মিত বাস চলাচল করে। হুবলী থেকে গোয়া প্রায় ১৩০ মাইল ও বেলগাম থেকে প্রায় ১০০ মাইল।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

গ্যাসপার ডায়াস বীচ

পানাজী শহরের মধ্যে অবস্থিত এই সমুদ্র সৈকত অপূর্ব।

কোলবা বীচ

মারগাঁও থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরের এই সমুদ্র বেলাভূমি একবারে সুনীল আরব সাগর, অপরদিকে সবুজ নারিকেল বীথির এক অবর্ণনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। চন্দ্রালোকে এই বিস্তৃত বেলাভূমিতে এলে মনের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

ডোনা পৌলা বীচ

এটিও গ্যাসপার ডায়াসের মত শহর, পানাজীর মধ্যেই অবস্থিত।

কালানগুটে বীচ

পানাজী থেকে নদী পেরিয়ে বোটিমের দিকে গেলে এই বীচ পাওয়া যায়। এর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোমুগ্ধকর।

প্রাচীন গোয়া

আজকে প্রাচীন গোয়ার কোন মূল্যই নেই, কেবলমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ছাড়া। কিন্তু আজকের ঘন জঙ্গল পরিপূর্ণ প্রাচীন গোয়াতেই সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমান শহরের ভিত। ঠিক পুরানো দিল্লীর ক্ষয়িষ্ণুতা ও নতুন দিল্লীর ভরা যৌবনের কথা মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন ও আধুনিক গোয়া। পানাজী থেকে

বেশী দূরে নয় পুরানো গোয়া। ষোড়শ শতাব্দীতে গোয়ায় একবার দুরারোগ্য প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং এতে প্রায় ২ লক্ষ লোক মারা যায়। এরপর থেকেই আস্তে আস্তে পানাজী বা নতুন গোয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

বম জেসাসের রাজবাড়ী

ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত এই প্রাসাদ এখনও কালজয়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর অভ্যন্তরে ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সেণ্ট জেভিয়ার্সের উপাসনা স্থানটি দেখার মত। এর সোনা এবং রূপার নির্মিত ভাস্কর্য দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

সেণ্ট জেভিয়ার্সের কনভেণ্ট

এখানে সেণ্ট জেভিয়ার্সের মৃতদেহ একটি সুন্দর কাঁচের আধারের মধ্যে শায়িত আছে।

এ্যাসিসিতে ফ্রান্সিসের মঠ

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। পর্তুগীজ স্থাপত্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন।

ক্যাথেড্রাল

এই মঠে ১৪টি সুন্দর পূজাবেদী আছে। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মঠটি সেণ্ট ক্যাথারীনের নামে উৎসর্গীকৃত। এখানে মধ্যে মধ্যে ধর্মীয় বিচারসভা বসত।

কাজেটানের কনভেণ্ট

গ্রীসীয় স্থাপত্য অনুযায়ী এই মঠটি নির্মিত। রোমের সেণ্ট পীটারের মঠের অনুকরণে এটি নির্মিত। ভূগর্ভস্থিত সমাধির জন্য এটি প্রসিদ্ধ।

সেণ্ট ক্যাথারীনের মঠ

এটি পর্তুগীজদের নিকট অতি পবিত্র স্থান। এখানেই গোয়ার দখল নিয়ে আলবুকার্ক ও আদিল শাহের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। গোয়ার বিজয় উৎসবকে স্মরণ করার জন্য ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা এটি নির্মাণ করেছিলেন।

সান্তা মণিকা কনভেণ্ট

এটি পুরানো গোয়ার একমাত্র মহিলা মঠ। এখানে ষোড়শ শতকের চিত্রাঙ্কন দেখবার মত। এতে বাইবেলের কথা বর্ণিত আছে।

পানাজী

বর্তমানের রাজধানী এবং গোয়ার প্রধান শহর। এখানের ইডালকো প্রাসাদটি বর্তমানের মহাকরণ ভবন। এটি আদিল শাহ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এক পর্তুগীজ গভর্নর এটিকে বর্তমান রূপে সাজিয়েছেন। এর পাশেই আছে ফেরিয়ার ব্রোঞ্জ মূর্তি। ফেরিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষিত ধর্মগুরু হিসাবেই পরিচিত ছিলেন।

শ্রীশান্ত দুর্গা মন্দির

পোণ্ডা থেকে ২ মাইল দূরে অবস্থিত এই মন্দির। উপকথা অনুযায়ী এখানে শিব এবং বিষ্ণুর মধ্যে যুদ্ধ হয়, তখন এই মন্দিরটি তৈরী হয় শান্তির প্রতীক হিসাবে। মন্দিরের একপাশে শিব এবং অপর পাশে বিষ্ণুর প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে।

শ্রীমংগেশ মন্দির

পানাজী থেকে ১২ মাইল দূরে পোণ্ডাতে শ্রীমংগেশ মন্দিরটি অবস্থিত। এটি ৪০০ বছরের পুরানো। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে এখানে পুণ্যার্থীরা আসেন।

মহাদেব মন্দির

ত্রয়োদশ শতকের হিন্দু স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন।

সপ্ত কোটেশ্বর মন্দির

কদম্ব রাজাদের নির্মিত এই মন্দিরে কদম্ব রাজাদের গৃহদেবতার মূর্তি আছে।

নামাজগা

সম্রাট অউরঙ্গজেবের পুত্র আকবর এটি নির্মাণ করেছিলেন। ভারতীয় দলপতিদের সঙ্গে পর্তুগীজদের ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই মসনদটি নির্মিত হয়েছিল।

বিঃ দ্রঃ—

গোয়ার সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখবার ব্যবস্থা পর্যটন বিভাগ করে। আরামপ্রদ বাসে কনডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। তাতে সমগ্র গোয়া দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। জন প্রতি খরচ পড়ে ২৫ টাকা।

থাকবার স্থান ঃ—

গোয়াতে অনেকগুলি ভাল ভাল হোটেল আছে। গোয়ানীজ রান্না (পর্তুগীজ এবং ভারতীয় সংমিশ্রণ) অতি মুখরোচক। প্রতিটি হোটেলেই এই খাবার পাওয়া যায়। তাছাড়া ছোট ছোট রেষ্টুরেন্ট, বারেও এ খাবার পাওয়া যায়। এই হোটেলগুলিতে জন প্রতি দৈনিক ৪০ থেকে ১০০ টাকা লাগে। মধ্যবিত্তদের জন্যও অনেক হোটেল আছে, যেখানে দৈনিক জন প্রতি খরচ পড়ে ২৫ থেকে ৪০ টাকা। এ ছাড়া সার্কিট হাউস, টুরিস্ট হোস্টেল, টুরিস্ট রেস্ট হাউস প্রভৃতি জায়গায়ও থাকা যায়। এর জন্য পর্যটন দপ্তর, গোয়াকে লিখতে হয়।

॥ মহীশূর ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

মহীশূরের ইতিহাস ভারত ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়। হায়দার আলী এবং টিপু স্থলতানের নাম জানে না এমন ভারতীয় খুব কমই আছেন। এঁদের দেশ মহীশূর। এছাড়া মহীশূরের রাজা স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যের রাজা ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মহীশূর ভারতবর্ষেরই একটি রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। এর একদিকে আরব সাগর, অপর দিকে অন্ধ্র প্রদেশ। উত্তরে মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণে কেরল ও মাদ্রাজ প্রদেশ।

বাঙ্গালোর :—

মহীশূর রাজ্যের রাজধানী বাঙ্গালোর। এখান থেকে মহীশূর ৮৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বর্তমান ভারতে বাঙ্গালোর একটি সমৃদ্ধ শিল্পনগরী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, পার্ক, হোটেল, বাড়ীঘর সব কিছু মিলিয়ে বাঙ্গালোর দক্ষিণের একটি অন্যতম শহর।

যানবাহন :—

মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর সরাসরি গাড়ী আছে। মাদ্রাজ থেকে সকালে ছেড়ে কয়েক ঘণ্টায় বাঙ্গালোর পৌঁছান যায়। বৃন্দাবন এক্সপ্রেস নামক একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন গাড়ী আছে। এটিতেও যাতায়াতের বিশেষ আরামপ্রদ বন্দোবস্ত আছে। এ ছাড়া বোম্বে, পুনা ও হায়দ্রাবাদ থেকেও সরাসরি বাঙ্গালোরে আসা যায়। বাসেও মহীশূর, মাদ্রাজ, উতকামণ্ড প্রভৃতি জায়গার সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

নন্দী হিল

বাঙ্গালোর থেকে ১৮ মাইল দূরে এই পার্বত্য শহরটি অবস্থিত। এর

নীচে এবং পর্বতচূড়ায় ছুটি মন্দির আছে। মনোরম পথের মধ্য দিয়ে বাসে নন্দী পাহাড়ে পৌঁছান যায়। এখানে কয়েকটি পুরানো বাংলো আছে যেখানে থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

লালবাগ

এটি একটি উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বাগান। হায়দার আলী ও টিপু সুলতান এই বাগানের স্রষ্টা। এখানে বাগানের ভিতর কৃত্রিম হ্রদ, পদ্মফুলশোভিত পুকুর, হরিণের আবাসস্থল প্রভৃতি আছে। তাছাড়া রয়েছে দেশীয় ও বিদেশীয় প্রচুর লতাগুল্মের সমাবেশ।

কোলার স্বর্ণখনি

ভারতের একমাত্র স্বর্ণখনিটি এখানেই অবস্থিত। বাঙ্গালোর থেকে ৫০ মাইল দূরে। খনি দেখতে গেলে আগে থেকে সেক্রেটারী, গোল্ড মাইনিং আণ্ডারটেকিং, উরেগাম-এর অনুমতি নিতে হয়।

থাকবার স্থান ঃ—

বাঙ্গালোরে অনেকগুলি ভাল ভাল হোটেল আছে। মধ্যম আর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থাকারও একাধিক হোটেল আছে যেখানে জন প্রতি দৈনিক ১০ থেকে ২০ টাকা লাগে। এছাড়া পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকবার ব্যবস্থা আছে। এর জন্য পর্যটন বিভাগ, মহীশূর সরকারের কাছে আবেদন করতে হয়। কয়েকটি ধর্মশালাও আছে যেখানে থাকবার বেশ ভাল ব্যবস্থা আছে। যুব হোস্টেল এবং ওয়াই, এম, সি, এ-তেও থাকা যায়। যুব হোস্টেলের ঠিকানা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল, কৃষ্ণ রাজেন্দ্র রোড, বাঙ্গালোর। ওয়াই, এম, সি, এ-র ঠিকানা হল—৩১ ইনফ্যানট্রি রোড, বাঙ্গালোর।

মহীশূর ঃ—

রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ শহর মহীশূর। এটির পরবর্তী অধ্যায়ের উন্নতির সঙ্গে মহীশূর-রাজাদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর আগের ইতিহাস হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীতে ভরা। ইংরাজদের ভারতবর্ষে যে কয়েকজনের সঙ্গে রীতিমত পাঞ্জার লড়াই করতে হয়েছে তার মধ্যে হায়দার আলি এবং টিপু সুলতান অন্যতম। এছাড়া শহরটির অন্যতম

আকর্ষণ মহীশূর রাজপ্রাসাদ এবং তার আনুষঙ্গিক প্রাসাদসমূহ। মহীশূরকে দক্ষিণের উদ্যান শহর হিসাবেও অভিহিত করা যায়।

যানবাহন :—

বাঙ্গালোর থেকে মহীশূর সরাসরি রেলপথে যুক্ত, দূরত্ব ৮৬ মাইল। মাদ্রাজ থেকে অতি সহজেই বাঙ্গালোর পেঁছান যায়। বোম্বে থেকে সরাসরি বাঙ্গালোর, হয়ে মহীশূর যাওয়া যায়। এছাড়া রাজ্য পরিবহনের বাস মহীশূরকে বাঙ্গালোর, মাঙ্গালোর, হাসান, উতকামণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

রাজপ্রাসাদ

রাজপ্রাসাদটির গঠনশৈলীতে ভারত-আরবীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। রাজ-প্রাসাদে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না, কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে অতি সুন্দর।

জগনমোহন রাজপ্রাসাদ

এখানে একটি আর্ট গ্যালারী আছে। রাজারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে দুর্লভবস্তু ও চিত্র সংগ্রহ করে এখানে রেখেছেন।

ললিতা মহল

আগে এটি রাজপ্রাসাদ ছিল, কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের অতিথিশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে প্রবেশের অনুমতি—সুপারিনটেণ্ডেন্ট, গেস্ট হাউস, গভর্নমেণ্ট হাউস, মহীশূরের কাছ থেকে নিতে হয়।

চামুণ্ডী পাহাড়

মহীশূর রাজবাড়ীর গৃহদেবতা চামুণ্ডেশ্বরী দেবীর মূর্তি এখানে আছে। এই মন্দিরটির স্থাপত্য ভাস্কর্য অপূর্ব। এখানে মহীশূর-রাজাদের গ্রাম্মাবাস আছে। কিছু নীচে এলে দেখা যায় বিখ্যাত নন্দীকে (ষাঁড়)। এটির উচ্চতা ১৬ ফুট, অত্যন্ত জীবন্ত মনে হয়। কঠিন পাথর কুঁদে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। নন্দীর গলার চেন এবং ঘণ্টার মালার কারিগরি দক্ষতা অপরূপ। এই পাহাড়ের উপর থেকে রাত্রিতে মহীশূর শহরের আলোকসজ্জা মনোরম।

খাদ্য গবেষণা কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যের উন্নতির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার উপর এখানে গবেষণা হয়।

সরকারী চন্দন-তেল কারখানা

মহীশূর রাজ্যে প্রভূত পরিমাণ চন্দন গাছ জন্মায়। তার থেকে তেল তৈরী করে বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী তৈরী হয়। বিশেষতঃ চন্দন-তেল ও চন্দন-সাবান অপূর্ব।

সরকারী রেশম কারখানা

মহীশূরের রেশম-শিল্প খুবই উন্নত। মহীশূর-শাড়ীর চাহিদা শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও এর যথেষ্ট চাহিদা আছে। আগে থেকে অনুমতি নিয়ে চন্দন-তেল ও রেশম কারখানা দেখা যায়।

বৃন্দাবন উদ্যান

মহীশূর থেকে ১২ মাইল দূরে কৃষ্ণরাজ-সাগর বাঁধ অবস্থিত। এখানে কাবেরী নদীতে বাঁধ দিয়ে জল সংগ্রহ এবং সেই জলের দ্বারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই বাঁধের নীচে বিখ্যাত বৃন্দাবন উদ্যান। এখানে ধাপে ধাপে উদ্যানটিকে সাজান হয়েছে ফুলের কেয়ারী এবং ঝরণার দ্বারা। অনেকটা কাশ্মীরের মোগল উদ্যানের মত। এখানে শত শত রঙিন বাতি লাগানো আছে। সন্ধ্যায় যখন এগুলি একসঙ্গে জ্বলে ওঠে তখন এটিকে ঠিক পরীর রাজ্য বা স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। বুধ, শনি ও রবিবার এই আলো প্রজ্জলিত হয়। এছাড়া যে কোন সময় জালানো যায়, তার জন্য খরচ পড়ে ঘণ্টায় ১০০ টাকা।

শ্রীরঙ্গপত্তন

ইতিহাসখ্যাত শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গটি এখানে আছে। কাবেরী নদীর দ্বীপের মধ্যে, মহীশূর থেকে ১০ মাইল দূরে এটি অবস্থিত। এখানে টিপু সুলতানের গ্রাষ্ম-প্রাসাদ আছে। টিপু এবং ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধের বহু দেওয়ালচিত্র এখানে রয়েছে, যার শিল্পগত মূল্য অনেক। গুম্বুজ বা টিপুর সমাধিক্ষেত্রটি অতীব সুন্দর। তাঁর পিতৃপুরুষদেরও সমাধিস্থল এখানেই। রঙ্গনাথের মন্দিরটিও সুদৃশ্য।

সোমনাথপুর

অপ্রচলিত গ্রাম সোমনাথপুর। দূরত্ব মহীশূর থেকে ১২ মাইল এবং শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে ১৫ মাইল। এখানকার চেন্নাকেশব মন্দিরটি হোয়শাল রাজাদের অন্যতম-কীর্তি। হোয়শাল স্থাপত্যশিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই মন্দিরগাত্রে দলবদ্ধ হস্তি, হংসশ্রেণী, আক্রমণকারী ঘোড়ার পাল এবং প্রাচীন জীবজন্তুর চিত্র খোদিত দেখা যায়। এছাড়া আরও দেখা যায় নৃত্যরতা নর্তকী, লতাগুল্মের ডালপালা, গায়কবৃন্দ। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীও এখানে চিত্রিত রয়েছে।

বেলুড় মন্দির

হোয়শাল রাজাদের আরও নিদর্শন দেখা যায় বেলুড় এবং হালেবিড-এর মন্দিরগুলিতে। হাসান থেকে বেলুড়-এর দূরত্ব ২৪ মাইল। মহীশূর থেকে ট্রেনে হাসান যাওয়া যায়। তাছাড়া নিয়মিত বাস পাওয়া যায়। মহীশূর থেকে বেলুড় ও হালেবিড-এ যাবার ব্যবস্থা আছে। বেলুড় মন্দিরের কারুকার্যের মধ্যে বিশাল নৃত্যরতা মদনিকা মূর্তিগুলি আজও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই মদনিকা মূর্তিগুলি নৃত্যরতা, গায়িকা, শিকারী অথবা দর্পণধারিণীরূপে দেখা যায়। এই মন্দিরে হোয়শাল রাজ বিষ্ণুবর্ধন-এর রাজসভার দৃশ্যাবলীও খোদিত আছে। দক্ষিণ ভারত এবং হোয়শাল স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন এই মন্দির।

শ্রাবণ বেলগোলা

বেলুড় থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত শ্রাবণ বেলগোলাতে বৃহৎ জৈন পার্শ্বনাথের প্রস্তরমূর্তি আছে। মূর্তিটি এত বৃহৎ যে কয়েক মাইল দূর থেকে দেখা যায়। মূর্তিটি ৫৭ ফুট উঁচু; একটি পাহাড় খোদাই করে নির্মিত। এত বৃহৎ মূর্তি ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। ১২ বছর অন্তর এখানে 'মহামস্তক অভিষেক' উৎসব পালিত হয়, তখন ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার জৈন এখানে এসে মিলিত হন। এই উঁচু প্রস্তরমূর্তিটিকে দুধ, ঘি, মিষ্টান্ন, ফলমূল প্রভৃতি দিয়ে স্নান করান হয়।

হালেবিড

দ্বার সমুদ্র হোয়শাল রাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমান নাম হালেবিড। এখানের হোয়শালেশ্বর এবং কেদারেশ্বর মন্দির দুটি সম্পূর্ণ হয় নি। মন্দির-

গুলির বাইরের দেওয়ালে দেব-দেবীর বিরাট বিরাট মূর্তি খোদিত আছে। দেখলে বিস্ময় লাগে এই কথা ভেবে যে প্রাচীনকালে স্থপতিরা কি করে ছেনী ও বাটালী দিয়ে এরূপ সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরী করতেন।

দশেরা উৎসব

মহীশূর দেখা অসার্থক এবং অসম্পূর্ণ থেকে যদি দশেরা উৎসব না দেখা হয়। দশেরা উৎসবের অনুষ্ঠান হয় আশ্বিন-কার্তিক মাসে। এটি দশ দিন স্থায়ী হয়। প্রতিদিন রাজ্যপাল 'দরবার' করেন। নাচ, গান প্রভৃতি আনন্দ অনুষ্ঠানের এক বিরাট আয়োজন হয় এখানে। এছাড়া রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য বাড়ীঘর সুন্দর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত হয়। শেষ দিনের উৎসবে রাজ্যপাল একটি সোনার হাওদায় বসেন যার হাতিটি অত্যন্ত সুন্দর-ভাবে সজ্জিত করা হয়; এই সুসজ্জিত হাতিটির সঙ্গে চলে দলে দলে উট, হাতি, ঘোড়া, পাল্কী, রূপোয় সজ্জিত গাড়ী প্রভৃতি। এই শোভাযাত্রার দৃশ্য ভোলার নয়। সন্ধ্যার পর বিশেষ মণ্ডপে চলে আতসবাজীর মেলা। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শকেরা দশেরা উৎসব দেখার জন্য এখানে ভীড় করে আসে। তাই অনেক আগে থেকে থাকবার জায়গা সংগ্রহ করা উচিত।

থাকবার স্থান :—

মহীশূরে অনেকগুলি ভাল ভাল হোটেল আছে এবং সাধারণের থাকার হোটেলও অনেক। এছাড়া মহীশূর সরকারের অতিথিশালায় থাকা খাবার ব্যবস্থা আছে। এখানে আগে থেকে স্থান সংরক্ষণের জন্য লিখতে হয়— সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, গেস্ট হাউস, মহীশূর। অনেকগুলি যুব হোস্টেলও আছে, যেখানে থাকার ব্যবস্থা করা যায়। বেশ কয়েকটি ধর্মশালাও আছে যেখানে থাকার ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে 'নন্দরাজবাহাদুর চট্টি' সব থেকে সুন্দর।

॥ কেরালা ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

কেরালার একদিকে আরব সাগর, অপর দিকে মাদ্রাজ এবং মহীশূর রাজ্য। দক্ষিণ থেকে উত্তর সমগ্র উপকূলভাগ যেন সমুদ্রের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ। দক্ষিণ ভারতের উদ্যান এবং প্রাচ্যের সম্পদাগার কেরালার দৃশ্য অতীব মনোরম। দু'হাজার বছরের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে কেরালার। আর আছে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এখানকার অরণ্য, পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, খাঁড়ি ও নারকেল বীথি দেখবার মত। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ত্রিবাংকুর-কোচিন এই নামে এটি দেশীয় রাজ্য ছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর পর ত্রিবাংকুর-কোচিন এবং মালাবার অঞ্চল নিয়ে গঠিত হল বর্তমানের কেরালা রাজ্য।

ত্রিবান্দ্রম :—

রোমের মত পাহাড়ের ওপরে অতি চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে এই শহরটি তৈরী। এটি বর্তমান কেরালা রাজ্যের রাজধানী। এ ছাড়া শহরের মধ্যে আছে প্রাক্তন শাসনকর্তাদের প্রাসাদসহ দুর্গ, আইনসভা ভবন, বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবন, মহাকরণ প্রভৃতি বড় বড় প্রাসাদ। এখানে একটি কলাশিল্পের বিদ্যালয় আছে। জলজ উদ্ভিদ ও জন্তুর জলাধারটিও দেখবার মত।

যানবাহন :—

ত্রিবান্দম যাবার সহজতম পথ মাদ্রাজ থেকে সরাসরি ট্রেন। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ গিয়ে ত্রিবান্দম যাওয়া যায়। বোম্বে থেকেও অনুরূপভাবে ত্রিবান্দম পৌঁছান যায়। কেরালা রাজ্য পরিবহন সংস্থার বিশেষ আরামপ্রদ দ্রুতগতি বাস ত্রিবান্দম ও কান্নানোর-এর মধ্যে চলাচল করে। দ্রুতগতি-সম্পন্ন বাস আলেপ্পী, কন্যাকুমারিকা, এর্নাকুলাম, আলওয়াই, ত্রিচুর, ঠেকাডি প্রভৃতি জায়গায় নিয়মিত যাতায়াত করে। এ ছাড়া কান্নানোর থেকে মহীশূর

যাবার, কুইলন থেকে তুতিকোরিণ যাবার কোট্টায়াম থেকে মাদুরা যাবার বাস পাওয়া যায়। তামিলনাড়ু রাজ্য পরিবহন ত্রিবান্দম ও কন্যাকুমারিকার মধ্যে বাস চালান। এ ছাড়াও শহর ভ্রমণের জন্য ১˙৫০ টাকায় সারাদিনের মত টিকিট পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

কোবালাম বীচ

১০ মাইল দূরে এই সাগরের বেলাভূমিটি অবস্থিত। এটি পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর বেলাভূমি। ছায়ায় ঘেরা এই বেলাভূমির দৃশ্য অতি মনোরম। এখানকার বেলাভূমিতে সাগরের গর্জন এবং বেশী ঢেউ নেই। সমগ্র পথটি নারকেল বীথি দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে সাগরের বেলাভূমি অপূর্ব।

পদ্মনাভম স্বামী

পদ্মনাভম স্বামীর নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটির নামকরণ থেকেই সম্ভবতঃ ত্রিবান্দম নাম হয়েছে। এটি নাগ অনন্তের নাম থেকে অনন্তপুরম নাম সংগ্রহ করে। মন্দিরটি ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মার্তণ্ড ভার্মার দ্বারা পুনর্নিমিত হয়েছে। মন্দিরের সাততলা গোপুরমের ছবি যখন সামনের জলাশয়ে প্রতিফলিত হয় তখন অপূর্ব দেখায়। এখানে বিশেষ পোশাকে কেবলমাত্র হিন্দুরাই ঢুকতে পারেন।

নেপিয়ার যাদুঘর

বর্ণাঢ্য মিনার আকৃতির এই যাদুঘরটি খুব সুন্দর। এখানে ব্রোঞ্জের সুন্দর সংগ্রহ আছে। যাদুঘরের প্রাঙ্গণে আর্ট গ্যালারী অবস্থিত। এই গ্যালারীটি অতি মূল্যবান কারণ এখানে মাইকেল রোয়েরিক এবং রাজা রবি বর্মার অঙ্কিত সুন্দর সুন্দর চিত্র রয়েছে। এ ছাড়া এখানে প্রাচ্য দেশের বহু চিত্র রক্ষিত আছে।

পদ্মনাভপুরম রাজপ্রাসাদ

কন্যাকুমারিকা যাবার পথে ৩০ মাইল দূরে এই প্রাসাদ। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানেই ত্রিবাংকুরের রাজপরিবার বাস করতেন।

কন্যাকুমারিকা

ত্রিবান্দম থেকে ৫৪ মাইল দূরে অবস্থিত ভারতের দক্ষিণের শেষপ্রান্তে

কন্যাকুমারিকা। এখানে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের মিলন ঘটেছে। এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য ভোলবার নয়। বিবেকানন্দ শিলা এবং বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীতে নির্মিত মন্দিরও এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। এ ছাড়া এখানে একটি গান্ধীস্মারক মন্দির আছে।

কুইলন

ত্রিবান্দম থেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন বাসে ৪৪ মাইল দূরে কুইলম শহর অবস্থিত। আটমুড়ি নদের তীরে নারকেল বীথির দ্বারা মণ্ডিত সমৃদ্ধ বাণিজ্য নগরী হল কুইলম। বহু প্রাচীনকাল থেকে কুইলমের সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম দেশের বাণিজ্য হত। শহরটি ছবির মত এবং সাগরের তীরে অবস্থিত।

ওয়ারকালা

ত্রিবান্দম-কুইলমের মধ্যে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত ওয়ারকালা। এটি হিন্দুদের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান এবং এখানকার জনার্দন মন্দিরটিও বিখ্যাত। এখানে লাল পাথরের পাহাড় ও রোগ নিরাময়কারী প্রস্রবন আছে।

আলেপ্পি

কুইলন থেকে ৫৩ মাইল দূরে আলেপ্পি শহর। বাস ছাড়াও আলেপ্পির সঙ্গে লঞ্চে কুইলমের যোগাযোগ আছে। এটি অনেকের মতে প্রাচ্যের 'ভেনিস', কারণ শহরটির ভিতর দিয়ে বহু খাল এঁকেবেঁকে চলে গেছে। বেম্বানাড় নদ ও জলাভূমিগুলিতে লঞ্চে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। আলেপ্পি থেকে উপকূল ধরে কোচিন পর্যন্ত একটি সুন্দর রাস্তা চলে গেছে।

থাকবার স্থান ঃ—

ত্রিবান্দমে বহু ভাল ভাল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণ হোটেল আছে। মধ্যম শ্রেণীর হোটেলের সংখ্যাও কম নয়। এখানে থাকবার এবং খাবার জন্য দৈনিক জন প্রতি ৩০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত লাগে। এ ছাড়—

(১) থাইকণ্ড রেস্ট হাউসে থাকার জায়গা আছে। সংরক্ষণের জন্য জেলা কালেক্টর, ত্রিবান্দমকে লিখতে হয়।

(২) অনন্ত শয়নম গেস্ট হাউসে কেবল মাত্র হিন্দুদের থাকতে দেওয়া হয়। এখানে থাকার জন্য ম্যানেজার, প্যালেস ট্রাস্ট, ত্রিবান্দম-২কে লিখতে হয়।

(৩) এস. এস. মেমোরিয়াল সত্রম-এও থাকার ব্যবস্থা আছে। সংরক্ষণের

জন্য সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, এস. এস. এম. সত্রম, স্টেশন রোড, ত্রিবান্দ্রমকে লিখতে হয়! এ ছাড়া কয়েকটি ধর্মশালাও আছে।

কোচিন :—

'আরব সাগরের রাণী' কোচিন একটি সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর। ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে কোচিন বোম্বাই-এর পরই উল্লেখযোগ্য! কোচিন বন্দরটি গভীর করার জন্য মাটি কাটার ফলে উইলিংডন দ্বীপটির সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে এর্ণাকুলামের সঙ্গে এবং অপর দিকে কোচিনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য যে সেতু তৈরী হয়েছে তা প্রযুক্তিবিদ্যার একটি সুন্দর নিদর্শন।

যানবাহন :—

মাদ্রাজ থেকে সরাসরি রেলপথে যুক্ত কোচিন। এ ছাড়া কুইলম, কোট্টায়াম, কোয়েম্বাটুর, বাঙ্গালোর, ত্রিবান্দম ও ত্রিচিনোপল্লীর সঙ্গেও যুক্ত। কেরালা রাজ্য পরিবহন দ্রুতগতিসম্পন্ন আরামদায়ক বাস চালান ত্রিবান্দম ও কোচিনের মধ্যে। কোচিন থেকে বাঙ্গালোর-এর মধ্যে বাস সার্ভিস আছে। এই বাস কোয়েম্বাটুর ও মহীশূর হয়ে বাঙ্গালোর যায়। এছাড়া দক্ষিণের প্রায় প্রতিটি শহরের সঙ্গে বাসপথে কোচিন যুক্ত। এ ছাড়া মোটরবোট সার্ভিস আছে কোচিন ও অলেপ্পির মধ্যে। এই পথ কুইলম ও কোট্টায়াম হয়ে যায়। এ ছাড়া স্থানীয় বাস কোচিনের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে কোচিন শহরকে যুক্ত করেছে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

উইলিংডন দ্বীপ

নিয়মিত মোটর বোটে ব্যাক ওয়াটারে এখানে ভ্রমণ এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

ইহুদিদের উপাসনালয়

এখানের বিশেষ আকর্ষণ বিরাট কাগজে লেখা ওল্ড টেস্টামেণ্ট এবং তামার পাত্রে উৎকীর্ণ রবি বর্মার দানপত্র। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই উপাসনালয়টি নির্মিত হয়।

মাত্তান চেরী

প্রাচীনকালে বিশ্বের দূরদেশগুলির সঙ্গে কোচিনের বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। চীনদেশ এখানে একটি বাণিজ্য উপনিবেশ গঠন করে এবং মাছ ধরার জন্য বিশেষ জাল নির্মাণ করে। কেরালার জেলেরা এখনও এই ধরনের জাল ব্যবহার করেন।

সেণ্ট ফ্রান্সিস গীর্জা

কোচিন দুর্গের নিকট এই প্রটেস্টাণ্ট গীর্জাটি প্রথমে পর্তুগীজরা তৈরী করেছিলেন। সম্ভবতঃ এটিই ভারতে প্রথম ইউরোপীয় গীর্জা। ভাস্কোডা-গামাকে এখানে সমাহিত করা হয়।

ওলন্দাজ প্রাসাদ

পর্তুগীজরা এই প্রাসাদ নির্মান করে কোচিনের রাজাকে উপঢৌকন দেন। এই প্রাসাদের কেন্দ্রীয় ভবনে কোচিন-রাজাদের অভিষেক হয়।

কালাডি

এর্নাকুলাম থেকে ৬২ মাইল দূরে অবস্থিত কালাডি জগৎগুরু শংকরাচার্যের জন্মস্থান। পেরিয়ার নদীর তীরে কালাডি শহরটি অবস্থিত।

থাকবার স্থান ঃ—

কোচিনের সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন শহরের যোগসূত্র থাকায় এখানে অনেকগুলি ভাল ভাল হোটেল আছে। এখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকায় জায়গাও আছে। মধ্যম শ্রেণীর কয়েকটি হোটেলও এখানে আছে, যেখানে থাকার এবং খাবার জন্য জন দৈনিক ২৫ থেকে ৪৫ টাকা পর্যন্ত লাগে। এছাড়া—

(১) রিটায়ারিং রুমে (রাজ্য পথ পরিবহন) থাকার ব্যবস্থা আছে। সংরক্ষণের জন্য জেলা পরিবহন অফিসার, রাজ্য পরিবহন, এর্নাকুলামকে লিখতে হয়।

(২) ট্যুরিস্ট বাংলোতেও থাকার জায়গা আছে। অনুমতির জন্য ম্যানেজার সরকারী অতিথিশালা, এর্নাকুলামকে লিখুন।

(৩) কর্পোরেশন পর্যটন বাংলোতে থাকা যায়। সংরক্ষণের দায়িত্ব স্টুয়ার্ড ইনচার্জ-এর।

(৪) ওয়াই, এম, সি, এ-তেও থাকবার জায়গা আছে।

(৫) ওয়াই, ডব্লু, সি, এ-তেও থাকার জায়গা আছে। দু'জায়গার জন্যই ম্যানেজার, চিত্তুর রোড, কোচিন ১১-কে লিখুন।

(৬) পি, ডব্লু, ডি, পর্যটন বাংলোতে থাকা যায়। সংরক্ষণের অধিকারী—ম্যানেজার, সরকারী অতিথিশালা, এর্নাকুলাম।

পেরিয়ার বন্যজন্তু আশ্রয়স্থল (ঠেকাডি) ঃ—

এখানে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা হয়। কেরালার পূর্বদিকের পাহাড় ঘন বনে পরিপূর্ণ। পেরিয়ার বন্যপশুর বিচরণভূমিটি ঠেকাডিকে অবস্থিত। ঠেকাডি এর্নাকুলাম থেকে ১৩৫ মাইল দূর। ত্রিবান্দম থেকে ১৬০ মাইল। এই রাস্তাটি চা ও রবার বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়ায় এর দৃশ্য অতীব মনোরম।

যানবাহন ঃ—

কোয়াট্টাম ও ঠেকাডির মধ্যে একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন বাস দৈনিক যাতায়াত করে। এখান থেকে পেরিয়ার নদীর মধ্য দিয়ে মোটর লঞ্চে করে বন্যজন্তুর বিচরণভূমিতে যাওয়া যায়। ত্রিবান্দম ও এর্নাকুলাম থেকে নিয়মিত বাস ঠেকাডি যায়। তামিলনাডু রাজ্য পরিবহনের বাস নিয়মিত মাদুরা ও ঠেকাডির মধ্যে চলাচল করে, যেটি পেরিয়ার হয়ে যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

পেরিয়ার নদীতে মোটর বোটে চেপে বন্যজন্তুর আবাসভূমি দেখার আনন্দ অভূতপূর্ব। এখানে বাইসন, হাতি, সম্বর, হরিণ প্রভৃতি দেখা যায়। কপাল ভাল হলে কখনও কখনও বাঘও নজরে পড়বে।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে একটি উচ্চ শ্রেণীর এবং একটি মধ্যম শ্রেণীর হোটেল আছে। মধ্যম শ্রেণীর হোটেলে দৈনিক জন প্রতি ২৫ থেকে ৪০ টাকা খরচ লাগে। এছাড়া—

(১) পেরিয়ার হাউস-এও থাকা খাবার ব্যবস্থা আছে। সংরক্ষণের জন্য ম্যানেজারকে লিখুন।

(২) এডাপালায়াম পর্যটন বাংলোতেও থাকা যায়। আর্যনিবাস হোটেলের ম্যানেজারকে লিখে ব্যবস্থা করা যায়।

॥ তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

মাদ্রাজ তামিলভাষী জনগণের বাসভূমি। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে, পূর্বঘাট পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। এ হল দ্রাবিড় সভ্যতার লীলাভূমি। প্রতিটি শহরে ও গ্রামে এই সভ্যতার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় মন্দিরের গোপুরম বা মন্দির চূড়াতে। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক এই মন্দিরগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অতি উন্নত। মন্দিরকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয় গ্রাম এবং গ্রামীণ জীবন মন্দিরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। এখানের মন্দির-শিল্পের শুরু পল্লবযুগে। এঁরা সমগ্র একটি পাহাড় কেটে যে মন্দির নির্মাণ করেন তা সত্যই শিল্পীদের সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। চোল রাজাদের সময় এই শিল্পের চরম উৎকর্ষ ঘটে। এই সময়ের ব্রোঞ্জ নির্মিত নটরাজমূর্তি ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। তাছাড়া কর্ণাটক ও ভারত নাট্যমের আবাসস্থল এই মাদ্রাজ। এছাড়া লোকনৃত্যের মধ্যে পূরবী অট্টম বিশেষ জনপ্রিয়। মাদ্রাজ যেহেতু উষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত, তাই ভ্রমণের প্রশস্ত সময় হল জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী। অন্য সময় অসহ্য গরমে ভীষণ ক্লান্তি লাগে। এটি ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। একদিকে বঙ্গোপসাগর এবং অপর দিকে কন্যাকুমারিকাতে তিন সাগরের সঙ্গম রাজ্যটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

যানবাহন ঃ—

মাদ্রাজ ভারতবর্ষের সব জায়গার সঙ্গে রেলপথে যুক্ত। কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বাই থেকে নিয়মিত গাড়ী যাতায়াত করে। এছাড়া পুনা, হয়দ্রাবাদ বাঙ্গালোর প্রভৃতি প্রতিটি বড় বড় শহরের সঙ্গেই মাদ্রাজ রেলপথে যুক্ত। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ মেল এবং এক্সপ্রেসে মাদ্রাজ পৌঁছান যায়। মাদ্রাজ-সিঙ্গাপুর এবং মাদ্রাজ-কলম্বো নিয়মিত জাহাজ চলাচল করে। এছাড়া বাস-পথে মাদ্রাজ—মাদুরা, বাঙ্গালোর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি বড় বড় শহরের সঙ্গে

যুক্ত। শহরে ঘোরবার জন্য রাজ্য পরিবহনের ভাল বাস আছে। এছাড়া পণ্ডিচেরী, মহাবলীপুরম, থিরুকালিকুন্দ্রম, কাঞ্চীপুরম এবং অন্যান্য জায়গার সঙ্গে দ্রুতগতিসম্পন্ন বাস যোগাযোগ আছে। মাদ্রাজে ট্যাক্সি ও বৈদ্যুতিক গাড়ীও আছে বিভিন্ন জায়গায় যাবার জন্য।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

ম্যারিনা

মাদ্রাজের আট মাইল লম্বা সমুদ্র উপকূলের নাম ম্যারিনা। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপকূল। সন্ধ্যায় ম্যারিনায় বসে অবসর বিনোদন অথবা হেঁটে বেড়ান সত্যই চমৎকার।

সেণ্ট জর্জ দুর্গ

মাদ্রাজ শহরের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই দুর্গ এবং এর পশ্চাতে জর্জ শহরটি। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গটি নির্মিত হয়। ইংরাজেরা ভারতের পূর্ব উপকূলে প্রথম শহর পত্তন করে এখানেই। চন্দ্রগিরির রাজাদের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই জায়গাটি লাভ করে। ফরাসী এবং ইংরাজদের মধ্যে কর্ণাটক যুদ্ধে এই দুর্গটি অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। রাজ্যের সরকারী দপ্তর ও আইনসভা ভবন এই দুর্গে অবস্থিত। দুটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়ী আছে দুর্গটির মধ্যে। একটি, যেখানে রবার্ট ক্লাইভ বাস করতেন আর অপরটি কর্ণেল ওয়েলেসলির। ভারতের প্রাচীনতম প্রটেস্টান চার্চ সেণ্ট মেরীর গীর্জা এখানেই অবস্থিত। দুর্গের মধ্যে অজানা এক চিত্রকরের অঙ্কিত একটি 'শেষ সপার' চিত্রের অনুলিপি আছে। এই দুর্গে একটি যাদুঘরও আছে যেখানে বহু কিছু প্রাচীন সঞ্চয়ের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক পরিচ্ছদ, মুদ্রা ও চীনামাটির জিনিসের এক অপূর্ব সংগ্রহ আছে।

সেণ্ট টমাস গীর্জা

পর্তুগীজরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে মায়লাপুরের কাছে একটি কারখানা স্থাপন ও সেণ্ট টমাসের সমাধির কাছে একটি গীর্জা নির্মাণ করে শহরের পত্তন করে। শহরের বাড়ীগুলির নির্মাণ কৌশল মূর ও ভারত-আরবীয় স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাতিঘর

১৬০ ফুট উঁচু বাতিঘরটি উপর উঠলে শহরের বিভিন্ন জায়গার দৃশ্য অতি

মনোরম। এখান থেকে হাইকোর্ট এবং বন্দরের দৃশ্যও চমৎকার। এছাড়া শহরের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল জর্জ টাউনটিও সুন্দর দেখায়।

কপালেশ্বর মন্দির

মায়লাপুরের এই মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তামিলনাড়ুর শ্রেষ্ঠ কবি তিরুভাল্লুভার এখানে উপাসনা করতেন ও ধর্মীয় কবিতা লিখতেন। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানের গোপুরমটি দেখার মত। এছাড়া নিকটবর্তী ট্রিপলিকেনের পার্থসারথী মন্দিরটি স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। পাশের মন্দিরটিও দর্শনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়

ম্যারিনা দিয়ে হেঁটে গেলে শহরের আধুনিক এবং প্রাচীন বাড়ীগুলি চোখে পড়ে। প্রাচীন সেনেট হাউসের পাশেই বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়েছে। এটি ১০০ বছরেরও পুরানো।

চীপক প্রাসাদ

বর্তমানের কয়েকটি সরকারী দপ্তর মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন কর্ণাটক রাজাদের বাসভবনকে। চীপক প্রাসাদটি দেখতে খুবই সুন্দর। এর পাশেই প্রেসিডেন্সী কলেজ। এটি প্রাচীন ইতালিয় পদ্ধতিতে নির্মিত।

যাদুঘর

আর্ট গ্যালারীর পাশেই সরকারী যাদুঘর অবস্থিত। এটি ১০০ বছরেরও বেশী পুরানো এবং বিশেষ প্রসিদ্ধির কারণ অমরাবতীতে প্রাপ্ত বৌদ্ধস্তূপের সংগ্রহ আছে এখানে, যেটি দ্বিতীয় শতকে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া চোল, পল্লব এবং পাণ্ড্য রাজাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শন এখানে সংগৃহীত আছে। সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলিও এখানে রক্ষিত।

আর্ট গ্যালারী

এখানের আর্ট গ্যালারীটি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। নটরাজের শ্রেষ্ঠ মূর্তিগুলি এখানে আছে। এছাড়া রাজপুত, মুঘল ও দক্ষিণ ভারতীয় অঙ্কনশিল্পের বহু নিদর্শনও এখানে আছে।

রাজাজী হল

শহরের কেন্দ্রস্থলে, মাউণ্ট রোডে অবস্থিত এই গৃহটি স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে

গভর্নরদের আবাসস্থল ছিল। যাঁরা এই গৃহে বাস করেছিলেন তাঁদের প্রতিকৃতি এর দেওয়ালে অঙ্কিত আছে।

গিণ্ডি

এখানে বর্তমানের রাজভবন অবস্থিত। এখানে দ্রুত শিল্পকারখানার বিকাশ ঘটায় দিন দিন শহর বেড়ে উঠছে। রাজভবনের পাশেই বিখ্যাত গিণ্ডি পার্ক, যেখানে বন্যজন্তু সংরক্ষণের বাগান আছে।

কাঞ্চীপুরম

স্বর্ণ নগরী কাঞ্চীপুরম মাদ্রাজ থেকে ৫২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজ্য পরিবহনের বাস নিয়মিত এই পথে যাতায়াত করে। হিন্দুদের নিকট এই শহরটি কাশীর পরই পবিত্র। কাঞ্চীপুরম পল্লব, চোল ও বিজয়-নগর রাজাদের রাজধানী ছিল। শহরটি মন্দিরবহুল। চারদিকে প্রচুর মন্দির ছড়ানো আছে। প্রধান মন্দির দুটি বিজয়-নগর রাজাদের দ্বারা নির্মিত। একটির নাম ভরদ্বাজস্বামী মন্দির ও অপরটি একম্বরনাথের মন্দির। একম্বরনাথের গোপুরম আটতলা এবং উচ্চতায় ১৮৮ ফুট। এই মন্দিরের পৃথ্বী-লিঙ্গটি প্রাচীন বলে কথিত। ভরদ্বাজ মন্দিরে রয়েছে সহস্র-স্তম্ভ কক্ষ। এখানে অতি চমৎকার মণি-মাণিক্য আছে। কক্ষের স্তম্ভগুলি খোদিত, শিল্পকলাসম্মত এবং সুপরিকল্পিত। এখানে আর একটি মন্দির হল, কামাক্ষী মন্দির। কথিত আছে শংকরাচার্য এখানে বৌদ্ধ দার্শনিকদের তর্কে পরাজিত করেন। অর্থশাস্ত্র প্রণেতা চাণক্যের জন্মভূমি কাঞ্চীপুরম। এছাড়া কাঞ্চীপুরমের নাম আমাদের ললনাদের কাছে অতি পরিচিত রেশমী শাড়ীর জন্য।

ভেল্লোর

মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৮৫ মাইল দূরে এটি অবস্থিত। চোল, বিজয় নগরের রাজারা ও মারাঠাগণ ভেল্লোর অধিকার করেছিলেন। একটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর দুর্গ এখানে আছে এবং দুর্গের মধ্যে একশিলার একটি মন্দির আছে, যার ভাস্কর্য অপরূপ।

তিরুকালকুন্দ্রম বা পক্ষীতীর্থ

মহাবলীপুরম থেকে কাঞ্চীপুরম যাবার রাস্তায় অবস্থিত এই তীর্থটি হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র। ৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর এই মন্দিরে ঠিক ১২টার

সময় বারানসী থেকে ছুটি চিল আহার্যের জন্য আসে। মন্দিরের পুরোহিতগণ এই আহার্য প্রস্তুত করেন।

মহাবলীপুরম

বঙ্গোপসাগর বিধৌত এই শহরটি মাদ্রাজ থেকে ৩৭ মাইল দূরে অবস্থিত। পল্লব রাজারা স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁদের সময় দক্ষিণ ভারতের যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল কাঞ্চীপুরম ও মহাবলীপুরম। কাঞ্চী ছিল তাঁদের রাজধানী এবং মহাবলীপুরম তাঁদের প্রধান বন্দর। প্রাচীনকালে এখান থেকেই বিদেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করে। এখানকার ভাস্কর্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) নির্মিত মকির।

(২) ছোট ছোট পাহাড় কেটে মন্দির।

(৩) রথ বা পাহাড় কেটে তৈরী মন্দির।

(৪) পাহাড় গাত্রের ভাস্কর্য।

সমুদ্রতীরে পাঁচটি প্যাগোডা মন্দির ছিল। সমুদ্রের উপকূলে বড় ঢেউ সারাক্ষণ আছাড় খাওয়ায়, কালের করাল আঘাতে ৪টি মন্দিরই সমুদ্রগর্ভে বিলীন। একটি এখনও টি কে আছে। এই মন্দিরটি কাঞ্চীপুরমের কৈলাশনাথ মন্দিরের মতই নির্মিত। যে পাহাড়টির ওপর বর্তমান পরিত্যক্ত বাতিঘর আছে তাঁর চারিদিকে রয়েছে অনেকগুলি গুহা। বরাহ গুহা এবং মহিষাসুর গুহায় বিভিন্ন মূর্তি আছে। ভগবান বিষ্ণু বরাহ রূপ নিয়ে সমুদ্র থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তাই বরাহ গুহা। আর একটি গুহাতে অনন্তনাগের নীচে বিশ্রামরত বিষ্ণুমূর্তি আছে। একটি ছোট পাহাড় কেটে তৈরী পাঁচটি রথ-মন্দির দেখা যায়। প্রথম নরসিংহ বর্মনের রাজত্বকালে এগুলি নির্মিত হয়। প্রথম মন্দিরটির নাম ধর্মরাজ রথ। এই ধরনের মন্দির এই প্রথম। শিলাখণ্ডের উপরিভাগ থেকে কাটতে শুরু করে পাঁচ তলায় মন্দিরটি শেষ করা হয়েছে। পাঁচটি মন্দিরের ছাদই বিভিন্ন। দ্বিতীয়টির নাম ভীম রথ, এটির ছাদ গাড়ীর ছাদের মত। তৃতীয়টি প্রথমটির নকল। চতুর্থটি সুরুচিসম্পন্ন। এই রথে আটভূজা মহিষমর্দিনীর মূর্তি আছে। পঞ্চমটি একটি হস্তিমূর্তি। এ ছাড়া আছে পাহাড়ের গায়ে ভাস্কর্য। সব থেকে ভাল নিদর্শন

সখীপরিবৃত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে গোবর্ধন পর্বত ধরে আছেন। আর আছেন তপস্যারত অর্জুন। বহু জন্তু, অপ্সরা ও মানবমূর্তি সেখানে খোদিত আছে। এক হাজার বর্গফুটেরও বেশী জায়গা জুড়ে এই ভাস্কর্যটি শোভিত।

উতকামণ্ড

মাদ্রাজ প্রদেশের দুটি স্বাস্থ্যনিবাসের মধ্যে এটি অন্যতম। সমুদ্রতল থেকে ৭৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। কোয়েম্বাটুর থেকে বাস এবং রেলে উতকামণ্ড যাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী রাজ্য মহীশূর থেকেও সরাসরি বাস যায়। এখানে ভ্রমণের প্রশস্ত সময় এপ্রিল—জুন। এখানে শিকারেও বেশ সময় কাটান যায়। উতকামণ্ডের অনতিদূরে সমুদ্রতল থেকে ৩০০০ ফুট উঁচুতে বহুজন্তুর আবাসস্থল হল মুদুমালাই। এখানকার বনে যথেষ্ট সেগুন, গোলাপ ও বাঁশ পাওয়া যায়। এই জায়গা থেকে চারিদিকে নদী, উপত্যকা, পাহাড় ও সমতলভূমি সুন্দর দেখায়।

কোয়েম্বাটুর

নীলগিরির পথে মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র কোয়েম্বাটুর। এখানে চা ও কফির বাগান, সিমেণ্ট কারখানা, সেচ পরিকল্পনা ও একটি মন্দির দর্শনীয়।

কুম্বকোণম

এটি এক সময় চোল রাজাদের রাজধানী ছিল। এখানে কুম্বেশ্বর স্বামীর মন্দির সম্ভবতঃ প্রাচীনতম এবং রূপার বাহনগুলির জন্য বিখ্যাত। মন্দিরটির এমন গঠনকৌশল যে একদিন কেন্দ্রীয় লিঙ্গে সূর্যের রশ্মি পড়ে। এ ছাড়া রামস্বামী ও শ্রীসারঙ্গপানী মন্দির দুটির ভাস্কর্য অদ্ভুত। কুম্ভমেলার মত এখানেও ১২ বছর ছাড়া মেলা হয়, তাতে হাজার হাজার যাত্রী আসেন।

চিদাম্বরম

নটরাজ মন্দির খ্যাত শহরটি মাদ্রাজ থেকে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। নটরাজ মূর্তিটি হিন্দু-শিল্পকলার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। এখানে বহু মণ্ডপ, সূক্ষ্ম মন্দির-স্থাপত্য ও গোপুরমগুলি হিন্দুরাজাদের অকুণ্ঠ ব্যয়ের নিদর্শন। পশ্চিম ও পূর্ব দিকের চূড়াগুলিতে ভারতনাট্যমের ১০৮টি মুদ্রা খোদিত আছে। প্রাঙ্গণে আছে গণেশ ও শিবকালী মন্দির এবং শিবগঙ্গা পুকুর। মন্দিরের

মধ্যে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত সহস্র স্তম্ভের একটি কক্ষ আছে। এই সবগুলিই শিল্প উৎকর্ষতার নিদর্শন। প্রসিদ্ধ আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অবস্থিত।

ত্রিচিনোপল্লী বা তিরুচির পল্লী ঃ—

দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির শহর। যদিও চোল এবং পল্লবরা এখানে রাজত্ব করেছেন তথাপি দুর্গ ও মন্দিরগুলি মাদুরার রাজাদের নির্মিত।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

শৈলমন্দির, গণেশ মন্দির ও পল্লবযুগের মন্দিরগুলি দর্শনীয়। দুর্গের উপর নির্মিত শৈলমন্দিরের উচ্চতা ২৩৭ ফুট। গণেশ মন্দির থেকে কাবেরী নদী ও শহরটিকে সুন্দর দেখায়। ওপরে ওঠার সময় বাঁদিকে পল্লবযুগের একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরগাত্রে পৌরাণিক নানা গল্প খোদিত আছে।

শ্রীরঙ্গম

তিরুচিরপল্লী থেকে ৩ মাইল দূরে কাবেরীর ও তার শাখানদীর মধ্যে দ্বীপের উপর শ্রীরঙ্গম অবস্থিত। রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে শহরটি গড়ে উঠেছে। মন্দিরের প্রত্যন্ত ভাগে সহস্র স্তম্ভের একটি কক্ষ আছে যেগুলি গ্রানাইট পাথরে তৈরী। শ্রীরঙ্গম বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্র।

যানবাহন ঃ—

তিরুচিরপল্লী রেলপথে মাদ্রাজ এবং দক্ষিণের সকল বড় শহরের সঙ্গেই যুক্ত। এ ছাড়া বাসেও প্রধান প্রধান সহরের সঙ্গে যুক্ত। মাদ্রাজ থেকে দূরত্ব ১৯৯ মাইল। চিদাম্বরম থেকে ১০০ মাইল। মাদুরা থেকে ৯৪ মাইল। তাঞ্জোর থেকে ৩০ মাইল ও কন্যাকুমারিকা থেকে ২৪৫ মাইল। প্রত্যেকটি জায়গা থেকেই দৈনিক বাস সার্ভিস আছে।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে প্রচুর ভাল ভাল হোটেল আছে। এছাড়া মধ্যবিত্ত আয়ের লোকেদের জন্য একাধিক হোটেলও আছে, যেখানে থাকা খাবার খরচ দৈনিক ১৫ থেকে ৩০ টাকার মত লাগে।

(১) গভর্নমেণ্ট টুরিস্ট বাংলোতে থাকা যায়। দুজনের জন্য ১২ টাকা লাগে শুধু থাকার খরচ।

(২) মিউনিসিপ্যাল টুরিস্ট বাংলোতেও থাকার জায়গা আছে। ঘরভাড়া ৮ টাকা করে লাগে।

(৩) সার্কিট হাউসেও থাকা যায়। এখানে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরও আছে, তার ভাড়া ১৫ টাকা। জেলা কালেক্টরকে লিখতে হয়।

(৪) পূর্তবিভাগ বাংলোতেও (P. W. D. Bungalow) থাকার জায়গা আছে, দুজনের থাকার জন্য খরচ মাত্র ২·৬২ পয়সা। জেলা কালেক্টর-এর অধীন।

মাদুরা :—

মাদ্রাজ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মাদুরা তিরুচিরপল্লী থেকে ৮৬ মাইল দূরে অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাদুরার সঙ্গে রোম এবং গ্রীসের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ছিল। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পাণ্ড্যরাজাদের রাজধানী ছিল এই মাদুরা।

যানবাহন :—

মাদুরা মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ ভারতের বড় বড় শহরের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত। রাজ্য পরিবহনের দ্রুতগতিসম্পন্ন বাস মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, তাঞ্জোর, তিরুচিরপল্লী, ঠেকাডি, উতকামণ্ড, কোদাইকানাল রামেশ্বরম্, কোট্টায়াম, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতির মধ্যে দৈনিক চলাচল করে। শহরের মধ্যে ঘোরার জন্য প্রচুর ট্যাক্সি ও বাস পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

তিরুমালাই নায়ক মহল

মধ্যযুগীর স্থাপত্যের উপর আরবীয় প্রভাব এখানে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মাদুরা থেকে ১½ মাইল দূরে অবস্থিত। উপরের চাল বা ছাদটি গোলাকার এবং কোনপ্রকার খিলানের সাহায্য ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে।

মীনাক্ষী মন্দির

দ্রাবিড় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করেই মাদুরা শহর গড়ে উঠেছে। পূর্ব প্রান্তের গোপুরম দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরে ৯টি গোপুরম আছে। সম্মুখভাগটিকে বলা হয় 'কাম্বাথাড়ি' মণ্ডপ এবং

এই মণ্ডপগুলিতে শিবের বিভিন্ন লীলা উৎকীর্ণ আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত একটি সহস্র স্তম্ভের মণ্ডপও আছে। মন্দিরে ঢোকার পর বাঁদিকে একসারি স্তম্ভ আছে, যাতে আঘাত করলে সঙ্গীতের স্বরলিপি অনুরণিত হয়।

আলাগার কয়েল

আলাগার পাহাড়ের সানুদেশে শহর থেকে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত আলাগার কয়েল মন্দির।

তিরুপরণ কুণ্ডম

এটি শহর থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তীর্থক্ষেত্র। পাহাড়ের শীর্ষে মুসলিম সাধু সিকন্দরের সমাধি অবস্থিত।

পেরিয়ার বাঁধ

মাদুরা থেকে ৮৭ মাইল দূরে অবস্থিত এই বাঁধ ও হ্রদ। হ্রদটি ১০ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃত এবং ২৭০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই হ্রদটির চারপাশে পেরিয়ার সংরক্ষিত বন্যজন্তুর আবাসস্থল। ভোরে অথবা সন্ধ্যায় লঞ্চে করে ঘুরে বেড়ালে অনেক বন্যজন্তু দেখা যায়। এখানে প্রচুর হাতিও দেখা যায়। পর্যটকদের সুবিধার জন্য কেরল সরকার একটি সুন্দর হোটেল নির্মাণ করেছেন।

কোদাইকানাল

মাদুরা থেকে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত এটি একটি পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। ৭৬০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই পার্বত্য নিবাসে বৃহৎ একটি হ্রদ আছে। মাদ্রাজ থেকে সরাসরি ট্রেনে কোদাইকানাল রোড়ে আসা যায় এবং সেখান থেকে বাসে কোদাইকানাল যাওয়া যায়। তাছাড়া মাদ্রাজ রাজ্য পরিবহন মাদুরা, তুতিকোরিন, তিরুচিরপল্লী প্রভৃতির সঙ্গে কোদাইকানালের বাস যোগাযোগ রক্ষা করেন। শহরটি পালনি পাহাড়ে অবস্থিত। এখানকার সুন্দর রাস্তায় ভ্রমণ, হ্রদে এবং ঝর্ণায় স্নান বিশেষ আরামদায়ক।

থাকবার স্থান :—

মাদুরাতে বেশ ভাল থাকবার ব্যবস্থা আছে এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাও আছে। মধ্যবিত্ত আয়ের লোকদের থাকার মতও প্রচুর হোটেল আছে। দক্ষিণ ভারতে খাওয়া সস্তা, তাই এই সমস্ত হোটেলে ১০ থেকে ১৫

টাকার মধ্যেই খাওয়া ও থাকার ভাল ব্যবস্থা হয়। এছাড়া মিউনিসিপ্যাল পর্যটন বাংলোতে থাকা যায়। দুজনের জন্য খরচ লাগে ৪'৭৫। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের আদেশ নিতে হয়। মাদ্রাজ সরকারের পর্যটন বাংলো আছে। দুজনের থাকার খরচ ১০ টাকা। সংরক্ষণের জন্য টুরিস্ট অফিসারকে লিখতে হয়।

কন্যাকুমারিকা

ভারতের শেষপ্রান্তে ও তিনটি সাগরের সঙ্গমস্থল হল কন্যাকুমারিকা। কুমারীদেবী কন্যাকুমারীর নাম থেকেই স্থানটির নাম কন্যাকুমারিকা। এছাড়া গান্ধী স্মৃতি-মন্দির এবং বিবেকানন্দ-শিলা আছে। এগুলির বর্ণনা কেরালা রাজ্যের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

রামেশ্বরম্ ঃ—

হিন্দুদের চারিটি দ্বারের মধ্যে রামেশ্বরম্ অন্যতম। রামেশ্বরম্ দ্বীপটি নাকি আকৃতিতে বিষ্ণুর পাঞ্চজন্যের মত। দ্বীপের উপর মন্দির ও তাকে কেন্দ্র করেই শহরের পত্তন। মন্দিরটি মাটি থেকে ৫ ফুট উঁচু মঞ্চের উপর নির্মিত। মন্দিরটির চতুর্দিকে বিপুলাকার স্তম্ভের সারি এবং তার মধ্যে প্রায় ১৬ ফুট চওড়া ঘোরানো বারান্দা আছে। এর মধ্যে সমস্ত মন্দির, পুকুর ও পবিত্র পথ আছে। সমস্ত স্থানের বিস্তৃতি খুবই সুন্দর। সংস্থাপন নক্সা ও স্থাপত্যের এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে এখানে। মন্দিরটির বারান্দা বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০০ ফুট।

যানবাহন ঃ—

রামেশ্বরম্ রেলপথে মাদ্রাজ প্রভৃতি বৃহত্তম শহরের সঙ্গে যুক্ত। বাসপথেও রামেশ্বরম্ দক্ষিণের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে যুক্ত। তবে ট্রেনে যাওয়াই সুবিধা।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে থাকবার ভাল ব্যবস্থা নেই। একটি মাত্র হোটেল আছে, 'মীনাক্ষী লজ'। এখানে থাকার জন্য দুজনের লাগে ৪০ টাকা। তবে অনেকগুলি ধর্মশালা আছে, যেখানে বিনা খরচে থাকা যায়। এছাড়া মন্দির কর্তৃপক্ষ অনেকগুলি রেস্ট হাউস এবং কটেজ ভাড়া দেন। এগুলি আসবাবপত্র দ্বারা

সজ্জিত। এখানে থাকবার জন্য জন প্রতি ৩ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত লাগে। তবে এখানে থাকতে গেলে বেশ আগে থেকে একদিনের ভাড়া পাঠিয়ে সংরক্ষণ করাই বিধেয়। সংরক্ষণের জন্য এক্‌জিকিউটিভ অফিসার, রামনাথস্বামী দেবস্থানম, রামেশ্বরম্‌কে লিখতে হয়।

তাঞ্জোর :—

দশ থেকে চতুর্দশ শতকের সৃষ্টিশীল রাজবংশ চোলদের রাজধানী ছিল তাঞ্জোর। কাবেরীর ব-দ্বীপের সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র তাঞ্জোর। চোলরাজ রাজারাজ বৃহদেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এটি সুবৃহৎ ও সুন্দরতম মন্দির বলে প্রসিদ্ধ। প্রধান আকর্ষণ হল গোপুরম, যার ছাদটি তৈরী করা হয়েছে, ৮০ মেট্রিক টন ওজনের একটি পাথর খোদাই করে। কথিত আছে এই গোপুরমটি মন্দিরের উপর তোলবার জন্য ৪ মাইল লম্বা ঢালু সমতল তৈরী করতে হয়েছিল। কারিগরি বিদ্যার আশ্চর্য নিদর্শন এই যে, গোপুরমের ছায়া কোন সময়েই মন্দিরের চত্বরে পড়ে না। প্রধান স্তম্ভের সামনে আছে বৃহদাকার নন্দী (ষাঁড়), যেটি কালো গ্রানাইটের তৈরী। গর্ভগৃহে যাওয়ার পথে দেওয়ালে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত চোল ও নায়ক রাজাদের সময়ের দেওয়াল-চিত্র আছে। এগুলি দক্ষিণ ভারতের চিত্রকলার জগতে বিস্ময়কর। তাঞ্জোর প্রাসাদটি একটি ছোট দুর্গের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই প্রাসাদ-দুর্গটি নায়ক এবং মারাঠাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

যানবাহন :—

তাঞ্জোর রেলপথ মাদ্রাজ, মাদুরা, ত্রিচিনোপল্লী ও রামেশ্বরমের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া রাজ্য পরিবহনের দ্রুতগতি সম্পন্ন বাস কোদাইকানাল, মাদ্রাজ, ভেলোর তিরুচিরপল্লী, নাগেরকয়েল, মাদুরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শহরগুলিকে তাঞ্জোরের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

থাকবার স্থান :—

এখানে একটিই খুব ভাল হোটেল আছে। সেটি হল ট্রাভেলার্স লজ। এছাড়া মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য একাধিক হোটেল আছে, যেখানে দৈনিক জন প্রতি ১৫ থেকে ২৫ টাকা থাকা ও খাবার জন্য লাগে। এছাড়া (১) মিউনিসিপ্যাল

রেস্ট হাউসেও থাকা যায়। খরচ লাগে দুজনের জন্য ৫ টাকা। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কাছে সংরক্ষণের জন্য লিখতে হয়। (২) রাজার রেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা আছে। খরচ ৫ টাকা শুধু থাকার জন্য। সংরক্ষণের জন্য সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে লিখতে হয়। (৩) নিরীক্ষণ বাংলোতেও থাকা যায়। অন্ততঃ এক সপ্তাহ আগে সংরক্ষণের জন্য জেলা কালেক্টর, তাঞ্জোরকে আবেদন করতে হবে।

॥ অন্ধ্র প্রদেশ ॥

উত্তরে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র; দক্ষিণে মহীশূর ও তামিলনাড়ু। পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে মহীশূর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত অন্ধ্রপ্রদেশ। রাজধানী হায়দ্রাবাদ। অন্ধ্রের জলবায়ু অত্যন্ত আর্দ্র ও গ্রীষ্মপ্রধান।

হায়দ্রাবাদ :—

অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদ। এটি নিজামের রাজধানী ছিল ও ভারতের স্বাধীনতার আগে নিজামের রাজত্ব ছিল। ৪০০ বছর আগে দাক্ষিণাত্যের রাজারা এই শহরের পত্তন করেন। মোঘল যুগে এর খুবই বাড়বাড়ন্ত ছিল। অবশেষে অনেক যুদ্ধের পর ইংরাজদের হাতে আসে। প্রাচীন দ্রষ্টব্য বস্তুর সঙ্গে আধুনিক অনেক দ্রষ্টব্য বস্তুর যোগ হয়েছে বর্তমানে। হায়দ্রাবাদ খুবই দ্রুতগতিতে শিল্প-শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে।

যানবাহন :—

রেলপথে হায়দ্রাবাদ সরাসরি কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি বড় বড় শহরের সঙ্গে যুক্ত। হাওড়া থেকে হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেসে সরাসরি এখানে পৌঁছান যায়। এছাড়া রাজ্য পরিবহনের বাস নিয়মিত নাগার্জুনসাগর, বিজয়ওয়াড়া, গুনটুর, বরংগল, তিরুপতি এবং হায়দ্রাবাদের মধ্যে চলাচল করে। শহর দেখার জন্য কনডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। ট্যুরিস্ট ব্যুরো থেকে শুক্রবার ছাড়া রোজ সকাল ৮টায় বাস ছাড়ে এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসে। জন প্রতি ভাড়া ১০ টাকা। এছাড়া একটি প্রাইভেট কোম্পানী রবিবারে নাগার্জুনসাগর ও তিন দিনের ট্যুরে অজন্তা ইলোরা নিয়ে যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

চারমিনার

হায়দ্রাবাদের প্রতীক এই মিনারটি ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটি শহরের কেন্দ্রে বাজারের পথে অবস্থিত। মনে হয় শহরের প্রাচীরের কাজ করছে। কথিত আছে শহরে একবার প্রচণ্ড প্লেগ রোগ দেখা দেয়। রোগ নিরাময়ের পর থেকে এই মিনারটি নির্মাণ করা হয়েছিল। একটি ছোট মসজিদের চারিদিকের মিনারগুলি ১৮০ ফুট উঁচু।

অজান্তা প্যাভিলিয়ান

হায়দ্রাবাদের সাধারণের জন্য নির্মিত একটি উদ্যান। এর চত্বরে কারুকার্যমণ্ডিত কতকগুলি চিত্রাঙ্কন করা আছে, যেগুলি অজান্তার অঙ্কনের সমধর্মী।

সালার জঙ্গ যাদুঘর

নিজামের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ আলি সালার জঙ্গ তৃতীয় এটির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজে অত্যন্ত রুচিশীল এবং কলাশিল্পেরও গুণগ্রাহী ছিলেন। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন সংগ্রহ করে এই যাদুঘরে রেখেছেন। চীন, বর্মা, জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই সমস্ত দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। এই যাদুঘরে যে সকল জিনিস আছে তার মধ্যে অঙ্কিত চিত্র থেকে আরম্ভ করে, মুদ্রা, প্রস্তরমূর্তি, মূল্যবান প্রচুর পাণ্ডুলিপি এবং অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে। টিপু সুলতানের পাগড়ী এবং ঐতিহাসিক হাতির দাঁতের চেয়ারটিও এখানে আছে। আর আছে মোগল সম্রাটদের তরবারীসমূহ।

গোলকুণ্ডা দুর্গ

হীরক আকরের জন্য গোলকুণ্ডা একসময় প্রসিদ্ধ ছিল। এর চারদিকে কুতুবশাহী রাজাদের রাজত্ব ছিল। এটি হাদ্রাবাদ থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। অনেকের মতে প্রসিদ্ধ মণি 'কোহিনূর' এই গোলকুণ্ডারই। তৎকালীন যুগের রীতি অনুযায়ী সমগ্র শহরটি দুর্গের প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। এই দুর্গটি 'শব্দবিজ্ঞানের' এক দুর্লভ নিদর্শন। প্রধান ফটকের কাছে হাততালি দিলে সঙ্গে সঙ্গে ২০০ ফুট উঁচুতে দুর্গের চূড়ায় তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মাটির নল পারসিক চাকার দ্বারা ছাদের ওপর জল তোলার

ব্যবস্থা ছিল গ্রীষ্মকালে ঘর শীতল রাখার জন্য। এই ব্যবস্থাটি বর্তমানের শীততাপনিয়ন্ত্রণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মক্কা মসজিদ

দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মসজিদ চারমিনারের কাছেই অবস্থিত। এখানে বহু লোক একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারে। এর উচ্চ স্তম্ভগুলি এবং দরজার খিলানগুলি একটি গ্রানইট পাথর কুঁদে নির্মিত।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৫ মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্যাকেন্দ্র। আরবী রীতিতে নির্মিত আর্ট কলেজটির স্থাপত্য খুবই সুন্দর।

ফালাকনুমা প্রাসাদ

প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত এই প্রাসাদটির সৌন্দর্য অপূর্ব। এটি একটি নীচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানকার পর্দা, আসবাবপত্র ও বহু মূল্যবান মুক্তা দেখার মত।

নাগার্জুন সাগর বাঁধ

৯০ মাইল দূরে অবস্থিত কৃষ্ণা নদীর জলাধারটি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। এই জলাধার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অন্ধ্র প্রদেশকে বন্যার হাত থেকে বাঁচান। বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত নাগার্জুনের নাম অনুযায়ী এই বাঁধের নামকরণ করা হয়েছে। ইনি এর কাছাকাছি বাস করতেন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। ৬ মাইল দূরে নাগার্জুন কোণ্ডাতে, নাগার্জুন যেখানে শিক্ষা দিতেন তার ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। হ্রদের একটি গৃহে, খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষগুলি রক্ষিত আছে।

ওসমান সাগর

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কুসি নদী অন্ধ্র প্রদেশের বন্যায় বিপুল ক্ষতি সাধন করে। তাই এই নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা প্রতিরোধ করা হয়। হায়দ্রাবাদ শহরে এই বাঁধ দেওয়া হ্রদ থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়।

বরংগল

কাকতীয় রাজাদের আবাসভূমি বরংগল হায়দ্রাবাদ থেকে প্রায় ৯৫ মাইল

উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখান থেকে কাজিপেট যাবার রাস্তায় একটি সহস্র থামের মন্দির আছে। এটির নাম হামাম কোণ্ডা। এই মন্দিরটি কাকতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন।

থাকবার স্থান ঃ—

হায়দ্রাবাদে প্রচুর ভাল ভাল হোটেল আছে। সাধারণের থাকার মত হোটেলও অনেকগুলি আছে, যেখানে খাবার ও থাকার জন্য ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত দৈনিক খরচ লাগে। এছাড়া নাগার্জুন সাগর বাঁধে থাকবার জন্য পি. আর. ও., নাগার্জুন সাগর প্রজেক্ট, বিজয়াপুরী উত্তর, লালগোণ্ডাকে আবেদন করতে হয়।

বিশাখাপত্তম ঃ—

ভারতের অন্যতম জাহাজ নির্মাণ কারখানা এবং ডকের জন্য বিশাখাপত্তন প্রসিদ্ধ। এখানে সাগরের উপকূলও দেখবার মত।

যানবাহন ঃ—

নিকটতম স্থান ওয়ালটেয়ার সাউথ ইস্টার্ন রেলের একটি বড় জংসন স্টেশন। মাদ্রাজ এবং কলকাতা থেকে মাদ্রাজ মেলে বা এক্সপ্রেসে আসা যায়। এটি প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। বোম্বাই বা দিল্লী থেকে বেজওয়াদা হয়ে আসতে হয়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

ওয়ালটেয়ার

এটি একটি প্রসিদ্ধ রেল কলোনী। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ইঞ্জিন ও বগী সারাই থেকে আরম্ভ করে সব কাজই এখানে করা হয়। তাছাড়া ওয়ালটেয়ারের বেলাভূমিটি অতি সুন্দর।

ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির

এই মন্দিরের গঠম-শিল্প বিশেষ প্রশংসনীয়। এর অদূরে সাগরের দৃশ্য নয়নাভিরাম।

সিমাচলম্

ওয়ালটেয়ার থেকে মাত্র ৭ মাইল দূরে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এটি হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। মন্দিরটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে একাধিক ভাল ভাল হোটেল আছে। ভারতীয় খাবার পাওয়া যায়। তাছাড়া আমিষ এবং অন্যান্য খাবারও পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের খাদ্যের সঙ্গে বাঙালীরা অভ্যস্ত নয়। এই খাদ্যের মধ্যে ঝাল এবং টকের পর্যাপ্ত ব্যবহার বাঙালী রসনার পক্ষে সবসময় সুখকর নয়।

॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব ভারতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। ভারতের সব থেকে ঘনবসতিপূর্ণ স্থান পশ্চিমবঙ্গ। বন্দরের দিক থেকেও এই রাজ্যের গুরুত্ব প্রভূত। কলকাতা বন্দর যদিও সমুদ্র থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত, তবুও এই বন্দরের গুরুত্ব সমধিক। বর্তমানে ফারাক্কা হওয়ার ফলে কলকাতার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে তুষারশুভ্র হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে আসাম ও বাঙলাদেশ এবং পশ্চিমে নেপাল, বিহার। একদিকে সাগর অপরদিকে পর্বত পশ্চিমবঙ্গকে মহিমামণ্ডিত করেছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম শিল্পশহর। ভারতের রপ্তানীর অন্যতম সামগ্রী চা এবং পাট এখানে প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। জল-হাওয়া মোটামুটি ভালোই। বর্ষায় পল্লী বাংলার রূপ অপূর্ব, দার্জিলিং-এর আবহাওয়া বেশ ভাল। দারুণ তাপদহে যখন সমতলভূমি জলতে থাকে তখন অনেকেই দৌড়োন শৈলশহর দার্জিলিং-এ। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'—এ শুধু কবির কবিতাই নয়, বাস্তব সত্য।

কলিকাতা :—

সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা তিনটি গ্রাম নিয়ে একদিন যে শহরের সূত্রপাত হয়েছিল এবং জব চার্ণক যে শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি যদি এখন দেখতেন তাহলেও তাঁর স্বপ্নের কলকাতাকে আর চিনতে পারতেন না। কলকাতা পূর্ব ভারতের সব থেকে ঘনবসতিপূর্ণ শহর।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে থেকেই কলকাতা ইংরাজদের দখলে আসে এবং কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এতেও শহর কলকাতার গুরুত্ব এতটুকুও কমেনি।

যানবাহন ঃ—

হাওড়া (কলকাতা) ভারতের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে রেলপথে যুক্ত। দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একাধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন গাড়ী আছে, যাতে সরাসরি হাওড়া আসা যায়। ভারতের দ্রুতগতিসম্পন্ন 'রাজধানী এক্সপ্রেস' হাওড়া ও দিল্লীর মধ্যে যাতায়াত করে। এছাড়া দ্রুতগতিসম্পন্ন বাস উত্তর বঙ্গ এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার মধ্যে চলাচল করে। পর্যটন কেন্দ্রগুলি দেখার জন্য রাজ্য পরিবহনের পর্যটন বাস আছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ স্থান দেখবার জন্য কনডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থাও আছে। দলবিশেষে বাস আলাদা-ভাবেও সংরক্ষণ করতে পারেন। শহরের যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন সরকারী বাস, ট্রাম, মিনিবাস, ট্যাক্সি এবং প্রাইভেট বাস আছে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

শহর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র তথা কর্মকেন্দ্র বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ। এখানে বড় বড় সরকারী ও সওদাগরী অফিস অবস্থিত। মহাকরণ ভবনটিও এখানেই। লালদীঘির ধারে বিভিন্ন বড় বড় অফিস। শহরের সব জায়গার সঙ্গে এখানকার বাসে ও ট্রামে যোগাযোগ আছে। এই জায়গাটি এমনই স্থানে অবস্থিত যে হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে প্রায় সমদূরত্ব। এখানে রাজ্য পর্যটন বিভাগের অফিস আছে, যাঁরা কলকাতা এবং আশেপাশের পর্যটন কেন্দ্রগুলি দেখবার ব্যবস্থা করেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, সেন্টপলস-ক্যাথেড্রাল, জৈন মন্দির দুটি, জাতীয় গ্রন্থাগার, নতুন মহাকরণ ভবন, মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংগীত, নাটক ও কলা বিশ্ববিদ্যালয়—রবীন্দ্র ভারতী, রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্বেল প্রাসাদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান। এছাড়া ডালহৌসির দক্ষিণে রাজভবন, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রভৃতি অবশ্য দ্রষ্টব্য। ডালহৌসির দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গার ধারে ইডেন উদ্যান। ভারতের এককালীন বড়লাট অকল্যাণ্ডের ভগিনী ইডেনের নামে এই উদ্যানের নামকরণ হয়েছে। এই উদ্যানের মধ্যে ইনডোর এবং আউটডোর রঞ্জি স্টেডিয়াম অবস্থিত। ভারতের ক্রিকেটের অন্যতম সেরা মাঠ এই স্টেডিয়াম। এছাড়া আছে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত উদ্যান, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের সাহায্যে বা কর্তৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাটের মন্দির

বিশেষভাবে দর্শনীয়। এ সমস্ত দর্শনীয় বস্তুগুলিই দেখা যায় ট্রাম, বাস, রাজ্য পর্যটন দপ্তরের কনডাক্টেড বাস এবং ট্যাক্সির সাহায্যে। এছাড়া বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম এবং দক্ষিণে ঢাকুরিয়া লেক প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করে।

শ্রীরামপুর

কলকাতার ১৫ মাইল দূরে দিনেমারেরা এখানে বসতি স্থাপন করে। দিনেমার সরকারের পুরানো অফিস-বাড়ীগুলির ধ্বংসাবশেষ এবং দিনেমার সমাধিক্ষেত্র এখনও দেখা যায়। কলকাতা থেকে বাস এবং বৈদ্যুতিক ট্রেনে অতি অল্প সময়েই এখানে পৌঁছান যায়।

চন্দননগর

ফরাসী উপনিবেশ প্রথম এখানেই শুরু হয়। কলকাতা থেকে মাত্র ২৩ মাইল দূরে এর অবস্থান। এখানে ফরাসী স্থাপত্যশিল্পের প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে—চার্চ, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতির মধ্যে। এছাড়া এখনকার কয়েকটি মন্দিরও বিশেষ প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে নন্দদুলাল, নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির প্রধান।

ব্যাণ্ডেল

কলকাতা থেকে ২৭ মাইল দূরে হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের উপর অবস্থিত ভারতের সব থেকে প্রাচীন পর্তুগীজ চার্চটি এখানে অবস্থিত। বর্তমানে এই চার্চের মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় আছে।

ডায়মণ্ডহারবার

হুগলী নদী যেখানে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কলকাতা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ডায়মণ্ডহারবার ঠিক সেখানে অবস্থিত। শিয়ালদা থেকে ইলেকট্রিক ট্রেন ও এসপ্ল্যানেড থেকে বাসে সরাসরি ডায়মণ্ডহারবার যাওয়া যায়। এখান থেকে হুগলী নদীর দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। অপর পারে হলদিয়া বন্দরের দৃশ্যও দেখবার মত।

সাগর দ্বীপ

এখানে সাগর রাজার ৬০,০০০ হাজার সন্তানকে বন্দী করে রেখেছিলেন কপিলমুনি। ভগীরথ গঙ্গাকে সাধনায় সন্তুষ্ট করে মর্তে নিয়ে এসে তাঁর পুণ্য জলসিঞ্চনে এদের প্রাণরক্ষা করেন বলে মহাভারতে কথিত আছে। কপিলামুনির আশ্রম এখানে আছে এবং মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে মেলা

বসে। এই পুণ্যস্থানে ভারতের বিভিন্ন জায়গার অধিবাসীরা দলে দলে আসেন পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য। এখান থেকে সাগরের দৃশ্য মনোরম। সাগর দ্বীপে যাওয়ার সহজ পথ, কলকাতা থেকে বাসে কাকদ্বীপ ৫৭ মাইল। এখানে থেকে ৫০ মাইল পথ বোটে করে সাগর দ্বীপ যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে মেলার সময় স্টীমার সার্ভিসও চালু থাকে।

ফ্রেজারগঞ্জ

কাকদ্বীপ থেকে বোটে করে ফ্রেজারগঞ্জে যাওয়া যায়। নামখানা থেকে ফ্রেজারগঞ্জ রাস্তা তৈরী প্রায় শেষ। দূরত্ব মাত্র ১৫ মাইল। নামখানা কাকদ্বীপ থেকে মাত্র ১০ মাইল। ২০০ গজ চওড়া ও ৫ মাইল দীর্ঘ সমুদ্রোপকূল দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব সুন্দর।

গান্ধীঘাট

কলকাতা থেকে ১৫ মাইল দূরে ব্যারাকপুর মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম ভাগীরথীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। এখানে একটি থিলানে গান্ধী-জীবনের অনেক দৃশ্য ও বাণী উৎকীর্ণ করা রয়েছে। বাস, ট্রেন ও ট্যাক্সিযোগে এখানে যাওয়া যায়।

থাকবার স্থান :—

কলকাতায় ভাল ভাল হোটেলের সংখ্যা কম নয়। মধ্যম আয়ের লোকদের থাকবার মত হোটেলেরও কোন অভাব নেই। হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনের নিকটবর্তী স্থানসমূহে প্রচুর হোটেল আছে। এসব জায়গায় থাকা ও খাবার জন্য জন প্রতি দৈনিক ২০ থেকে ৩০ টাকা লাগে। এছাড়া অনেকগুলি ধর্মশালাও আছে। ডায়মণ্ডহারবারে ট্যুরিস্ট লজ আছে, সেখানে থাকার ও খাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

মুর্শিদাবাদ :—

কলকাতার ১৩০ মাইল উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলা অবস্থিত। নবাব মুর্শিদকুলির নাম থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শহরের পত্তন। তারপর মীরকাশিম পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পীঠস্থান ছিল মুর্শিদাবাদ।

সুতরাং নবাবদের স্মৃতি বিজড়িত এই শহরে নবাবদের প্রচুর চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

যানবাহন ঃ—

শিয়ালদা থেকে সরাসরি ট্রেনে অথবা বাসে মুর্শিদাবাদে যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে যে দ্রুতগতিসম্পন্ন বাস যায় তাতেও মুর্শিদাবাদ যাওয়া যায়। ট্রেনে ৬ ঘণ্টার মত লাগে।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

মুর্শিদকুলি কাটরা

এখানে মুর্শিদকুলির সমাধি অবস্থিত। মুর্শিদকুলি মক্কার মসজিদের অনুকরণে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এর দুটি উঁচু মিনার ছিল যার ওপর থেকে মারাঠা আক্রমণকারীদের আগমন লক্ষ্য করা হত। একটি মিনার ভগ্ন অবস্থায় কোনমতে এখনও দণ্ডায়মান আছে।

হাজার দুয়ারী বা নবাব প্রাসাদ

এটি নবাবদের রাজপ্রাসাদ ছিল। গথিক স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। এই প্রাসাদের হাজারটি দুয়ার ছিল, যার জন্য এর নাম হাজার দুয়ারী। বর্তমানে এটি একটি সংগ্রহশালাতে রূপান্তরিত হয়েছে, এখানে দেশী ও বিদেশী দুর্লভ বস্তুসমূহ সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এছাড়া নবাবদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রের একটি সংগ্রহও আছে যা পর্যটকদের বিস্মিত করে। দরবারগৃহ, অস্ত্রশালা, অঙ্কন-ঘর যথার্থই আমাদের কৌতুহলী করে তোলে।

জাফরগঞ্জের কবরখানা

নবাব প্রাসাদের কাছেই জাফরগঞ্জ দেউড়ির নিকট অবস্থিত। এখানে মীরজাফর এবং তার উত্তরাধিকারীদের সমাধি আছে।

বিশ্বাসঘাতকের দরজা

নবাব প্রাসাদের কাছেই মীরজাফরের বাসস্থান। কথিত আছে এই প্রাঙ্গনেই সিরাজউদ্দৌলা যখন নামাজ পড়ছিলেন তখন তাঁকে হত্যা করা হয়।

জগৎ শেঠের প্রাসাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার ও বণিক জগৎ শেঠ পাঞ্জাবের

লোক। কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাঁর বাগান এবং গৃহসংলগ্ন মন্দির দেখবার মত।

মতিঝিল

আলীবর্দী কন্যা ঘসেটি বেগমের প্রাসাদ এই হ্রদের ধারে অবস্থিত ছিল। এখানে একটি ঘর আছে যার জানালা এবং দরজা কিছুই নেই। এক সময় এই হ্রদে পদ্মফুল ফুটে এর সৌন্দর্যকে শতগুণ বাড়িয়ে তুলতো।

জাহানকোষা কামান

১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই কামানটি দর্শকদের বিস্মিত করে। এটি ১৮ ফুট লম্বা ও ৪'৫ ফুট চওড়া, ঢাকার জনার্দন কর্মকার এটির নির্মাতা। ঢাকা থেকে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজধানী পরিবর্তনের সময় এটি মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। একবার তোপ দাগতে ২৮ সের পাউডার লাগত।

খোসবাগ

ভাগীরথীর অপরপারে শহর থেকে খানিকটা দূরে অবস্থিত চিরবিশ্রাম স্থল খোসবাগ। এখানে নবাব আলীবর্দী ও তাঁর আদরের নাতি সিরাজসহ বংশের অনেকেরই সমাধি আছে।

থাকবার স্থান :—

বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদ দেখার স্থবিধা। এখানে মধ্যম শ্রেণীর কয়েকটি হোটেল আছে। তবে খাবার স্থবন্দোবস্ত থাকলেও থাকবার স্থবন্দোবস্ত নেই। বর্তমানে রাজ্য সরকার বহরমপুরে একটি বিলাসবহুল টুরিস্ট লজ করেছেন, যেখানে থাকা এবং খাবার যথেষ্ট স্থন্দর ব্যবস্থা আছে। এছাড়া সার্কিট হাউসে এবং পূর্তবিভাগের বাংলোতেও থাকবার ব্যবস্থা আছে। সংরক্ষণের জন্য জেলাশাসককে লিখতে হয়।

মালদহ :—

মালদহ জেলার ইতিহাস খুবই গৌরববহুল। বাংলার উন্নতির যুগে শশাঙ্ক, পালরাজারা, সেনরাজারা এবং ইলিয়াশসাহী ও হুসেনশাহী রাজারা বিভিন্ন শতকে এখানে রাজত্ব করেছেন। স্বভাবতই তাঁদের সময়ের বহু নিদর্শন এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে পাল ও সেনরাজাদের সময়

বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কথা ভারতে প্রচারিত হয়। শেরশাহ পাঠানের আক্রমণের পর গৌড়ের গৌরব রবি অস্তমিত হয়।

যানবাহন ঃ—

কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যাবার পথে মালদা একটি বড় স্টেশন। মালদা থেকে ট্যাক্সি, বাস, রিক্সা প্রভৃতির মাধ্যমে পাণ্ড ও গৌড় ঘোরা যায়। কলকাতা থেকে একাধিক গাড়ী আছে, তবে সব থেকে ভাল গাড়ী দার্জিলিং মেল ও কামরূপ এক্সপ্রেস। দিল্লী ও বোম্বাই থেকে বারাউনী জংশন হয়ে কাটিহার জংশনে গাড়ী বদল করে মালদহে আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে কলকাতা হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। কলকাতা থেকে মালদহ মোটর পথে মাত্র ২১০ মাইলের মত। রাজ্যপরিবহনের বাস প্রতিদিন কলকাতা এবং মালদহের মধ্যে যাতায়াত করে। বাসপথ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গার ওপর দিয়ে গেছে। কল্যাণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, ফারাক্কা হয়ে মালদহ যাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

একলাক্ষী সমাধি

(পাণ্ডুয়া) ১৪১২—১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত পাণ্ডুয়ার স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর ভিতরে হিন্দু দেবতার মূর্তি আছে।

আদিনা মসজিদ

১৩৬৪—৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিকান্দর শাহ নির্মিত এই মসজিদটি সেই যুগের পাঠান-স্থাপত্য-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। সব থেকে আশ্চর্য এতবড় মসজিদের কোন প্রবেশ তোরণ নেই। যদিও আংশিক ভগ্নাবশেষ রূপান্তরিত হয়েছে তবুও মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্যের এ এক অপূর্ব নিদর্শন।

কুতুবশাহী মসজিদ

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মসজিদটির গঠনশৈলী অপূর্ব।

বড়ি দরগা

এখানে একটি দরগা আছে এবং এক সময়ে এর খুবই গুরুত্ব ছিল।

দখিল দরওয়াজা

(গৌড়) গৌড় যখন বাংলার রাজধানী তখন সমগ্র শহরটি প্রাচীর

দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই দুর্গের প্রধান তোরণ ছিল দখিল দরওয়াজা। এই ফটকের চারিদিকে চারটি ৫ তলা মিনার ছিল, যেখানে থেকে শত্রুর গতিবিধি নিরীক্ষণ করা হত।

বড় সোনা মসজিদ বা বারদুয়ারীর মসজিদ

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সুলতান নসরৎ শাহের অন্যতম কীর্তি এই মসজিদ। ইটের তৈরী এই বৃহৎ মসজিদ আজও দর্শকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু।

তমালতলা

সুলতান হুসেন শাহের সময় শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবন যাচ্ছিলেন সেই সময় এখানে আসেন।

চিকা মসজিদ

এই গম্বুজওয়ালা মসজিদটির গঠনরীতি সম্পূর্ণ নূতন। এর দরজা এবং খিলানগুলিতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল, কিন্তু সেগুলো ঘষে মুছে ফেলা হয়েছে। এর চিহ্ন এখনও বর্তমান।

লোটন মসজিদ

১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ইউসুফ শাহ এটি নির্মাণ করেন। কথিত আছে এক রাজনর্তকী এটি তৈরী করিয়েছিলেন।

মালদহ যাদুঘর

এই যাদুঘরে পাওয়া এবং গৌড়ের ভগ্নাবশেষ থেকে প্রাপ্ত যে সকল মুদ্রা, মূর্তি প্রভৃতি রক্ষিত আছে তা দেখবার মত।

এছাড়া কদম রসুল, ফিরুজশাহী মিনার, সালামি দরজা, লুকোচুরি দরজা এবং ফতেশাহের কবর দেখবার মত। পাল এবং সেন রাজাদের প্রাসাদ ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়।

থাকবার স্থান ঃ—

মালদহে কয়েকটি মধ্যমশ্রেণীর হোটেল আছে। এখানে থাকা এবং খাবার জন্য ১২ থেকে ১৫ টাকা দৈনিক জন প্রতি খরচ পড়ে। সব থেকে ভাল থাকবার ব্যবস্থা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট লজ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর এবং ইংরাজীখানা থেকে আরম্ভ করে মধ্যমশ্রেণীর আহার ও বাসস্থান পাওয়া যায়।

স্থান সংরক্ষণের জন্য ম্যানেজার, টু-রিস্ট লজ, মালদহ অথবা ট্যুরিস্ট ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৩।২ বিনয় বাদল দীনেশ বাগ, কলকাতা ১-এর কাছে লিখতে হয়।

ঝালদাপাড়া বন্যজন্তু আবাসস্থল :—

জলপাইগুড়ি জেলাতে অবস্থিত এই বন্যজন্তু সংরক্ষণের স্থানটি পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বড় সংরক্ষণ স্থান। এখানে বন্যজন্তুদের মধ্যে হরিণ, ভল্লুক, বাঘ এবং গণ্ডার দেখা যায়। গণ্ডার ভারতবর্ষের মধ্যে এই ঝালদাপাড়া এবং আসামের কাজিরাঙ্গা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

যানবাহন :—

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে হাসিমারা রেল স্টেশন ৯৫ মাইল দূরে অবস্থিত। হাসিমারা স্টেশনের কাছেই ঝালদাপাড়া সংরক্ষিত উদ্যান। কলকাতা থেকে কামরূপ এক্সপ্রেসে সরাসরি হাসিমারা আসা যায়। এখান থেকে বাস, ট্যাক্সি এবং রিক্সা পাওয়া যায়।

থাকবার স্থান :—

এখানে বনবিভাগের একটি বিশ্রামালয় রয়েছে যেখানে পর্যটকদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। বনবিভাগের অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে থাকার এবং বন্যজন্তু দেখার ব্যবস্থা আগাম করা যায়।

দার্জিলিং :—

রূপসী দার্জিলিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্বত্য নিবাস। একে 'পাহাড়ের রাণী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ৬৮০০ ফুট উচ্চে এই স্থানের আবহাওয়া অতীব আরামদায়ক। ভ্রমণের প্রকৃষ্ট সময় এপ্রিল—মে এবং সেপ্টেম্বর—নভেম্বর। এই সময় খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়ে না আবার বৃষ্টিও কম। কিন্তু ডিসেম্বর—মার্চ এখানে এত বেশী ঠাণ্ডা যে লোকবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এমনকি তুষারপাত পর্যন্ত হয়। দার্জিলিং-এর আর এক সুষমা এখানে মেঘের খেলা। রাস্তা দিয়ে চলার সময়, হোটেলের বিছানায় বিশ্রাম করার সময় হঠাৎ এক ঝলক মেঘ আপনাকে আচ্ছন্ন করে দেবে। পরক্ষণেই দেখবেন মেঘ সরে গেছে এবং সবকিছু পরিষ্কার। যদি হোটেলের জানলা সময়মত বন্ধ না করেন

তাহলে বৃষ্টিতে বিছানা সিক্ত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। এ ছাড়া হোটেল, পার্ক, রাস্তা সব জায়গা থেকেই 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র দৃশ্য অপূর্ব।

যানবাহন ঃ—

কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে গাড়ী পাল্টাতে হয়। এখান থেকে ছোট গাড়ীতে করে ৫০ মাইল দার্জিলিং। কলকাতা থেকে সরাসরি দার্জিলিং মেল নিউ জলপাইগুড়ি যায়, সেখান থেকে ছোট গাড়ী আছে। একসঙ্গে তিনটি গাড়ী ছাড়ে, পরে তিনটি আলাদা আলাদা অংশে রূপান্তরিত হয়। তখন এর দৃশ্য অপূর্ব। কখনও গাছের ফাঁকে, কখনও পাহাড়ের আড়ালে, কখনও বা বাঁকের মুখে একটি গাড়ী দেখা গেল, আবার কখনও তা অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকগুলি বিশেষ ধরনের বাঁক এবং লুপ পেরিয়ে দার্জিলিং যেতে হয়। এই রেলপথ কারিগরীবিদ্যার এক অপূর্ব নিদর্শন। দিল্লী ও বোম্বাই থেকে বারাউনী হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছান যায়। মাদ্রাজ থেকে কলকাতা হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। এ ছাড়া কলকাতা থেকে রাজ্য পরিবহনের বাসে নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়া যায় এবং এখান থেকে বাস, ল্যাণ্ডরোভার অথবা ট্যাক্সিতেও দার্জিলিং পৌঁছান যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

জলা পাহাড়

শহরের মধ্যে অনেকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। জলা পাহাড় ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। বার্চ হিল, অবজারভেটরী হিল প্রভৃতি শহরের থেকে উঁচুতে হওয়ার ফলে শহরের দৃশ্য, বিশেষতঃ রাত্রে অপূর্ব দেখায়। পায়ে হেঁটে উঁচু পাহাড়ে যাওয়া যায়, আবার যারা সখ করে ঘোড়ায় চড়তে চান তাঁদেরও ব্যবস্থা আছে। দার্জিলিং-এর ম্যাল দেখবার মত। এখানে ব্যাণ্ড বাজাবার জায়গাটিও সুন্দর। সমস্ত অভিজাত দোকান পসার এখানেই অবস্থিত। শহরের সব রাস্তাই শেষ পর্যন্ত এখানে এসে মিলেছে, বিরাট বিরাট পাইনগাছ চারদিকের সৌন্দর্যকে অপরূপ করে তুলেছে। লেবং-এ ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রেসকোর্স। পাহাড়ে চড়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে আছে মাউণ্টেনিয়ারিং ইন্‌সটিট্যুট। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীটি এখন চেষ্ট ক্লিনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তিনি যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন সে স্থানটি সযত্নে রক্ষিত। এখানে তাঁর ব্যবহার্য জিনিসপত্রের

সংগ্রহ আছে। এ ছাড়া রাজভবন, সরকারী কলেজ, লয়েড ব্যোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি দেখার মত। এখানে এত বিভিন্ন ধরনের অর্কিড আছে যা অনেক জায়গাতেই নেই। এর কাছেই আছে চিড়িয়াখানা। পার্বত্য পরিবেশে প্রাকৃতিক ইতিহাস যাদুঘর, বিভিন্ন মিশনারী স্কুল কলেজ, চা-বাগান ও ভুটিয়া বস্তী, মঠ ইত্যাদি দেখবার মত। এই সব দর্শনীয় স্থানগুলি হেঁটে দেখা যায়। শহরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় শিশু বৃদ্ধ বা অপটু লোকেরা রিক্সায় করে যেতে পারেন। সিমলা, মুসৌরীর মত এখানেও রিক্সা পাওয়া যায়, তবে অনেক বেশী দাম দিতে হয়। রিক্সাগুলি সামনে একজন টানে, পেছনে দুজন ঠেলে নিয়ে যায়। সম্প্রতি কনডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু হেঁটে বেড়ানোর মত আনন্দ কিছুতেই নেই।

বৌদ্ধমঠ ঘুম

এই অঞ্চলের সব থেকে বড় বৌদ্ধ মঠ। শহর থেকে ৬ মাইল দূরে এটি অবস্থিত। এর মধ্যে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও অঙ্কনের প্রভূত নিদর্শন আছে। ৭৪০০ ফুট উঁচুতে এই মঠের লামাদের নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য।

কেভেণ্টারস ডেয়ারী

এর কাছেই আছে কেভেণ্টার কোম্পানীর ডেয়ারী, যেখানে উন্নত শ্রেণীর গরু, মহিষ ও শূকর দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার মাখন প্রস্তুতের প্রণালীটিও দেখার মত।

সেনচল লেক

ঘুম-এর কাছেই পাহাড়ের উপর অবস্থিত প্রাকৃতিক হ্রদ। এটি একটি আদর্শ চড়ুইভাতির জায়গা। এই হ্রদে জল জমিয়ে রেখে দার্জিলিং শহরে জল সরবরাহ করা হয়। চারিদিকের সবুজ গাছের সমারোহ চোখ জুড়িয়ে দেয়।

টাইগার হিল

৮৫১৫ ফুট উচ্চে এবং দার্জিলিং থেকে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত টাইগার হিল। এখান থেকে সূর্যোদয় এবং তার প্রতিফলন এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘাতে অবিস্মরণীয়। পৃথিবীর আর কোথাও সূর্যোদয় এত সুন্দর দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

সন্দকফু

দার্জিলিং থেকে ৩৯ মাইল দূরে ১১৯৫৭ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই স্থান থেকে

তুষার শুভ্র হিমালয়ের অনেকগুলি চূড়া অপূর্ব দেখায়। জিপ যাবার মত রাস্তা আছে কিন্তু যেমন খাড়াই তেমনি বিপদসংকুল। এখান থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্যও ভোলবার নয়। সারাটা পথের দুপাশে রডডেনড্রন, ম্যাগনোলিয়া, গোলাপ প্রভৃতি ফুটে আছে। এখান থেকে যে চূড়াগুলো দেখা যায় তা হল, নাপসে, এভারেস্ট, চামলং, লোটসে, জান্নু, ডোম চূড়া, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি। সন্দকফুতে থাকবার জায়গা আছে যুব হোস্টেল, ডিষ্ট্রিক্ট ডাকবাংলোতে, কিন্তু খাবার কোনই ব্যবস্থা নেই। তাই সঙ্গে খাবার নিয়ে যাওয়াই উচিত।

ফালুট

সন্দকফু থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থান ভারত, নেপাল ও সিকিমের সংযোগস্থল। এর উচ্চতা ১১৮১১ ফুট। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাত্র ৩০ মাইল। এখানে পাহাড়ে চড়া অত্যন্ত আনন্দদায়ক। থাকবার জায়গা—যুব হোস্টেল ও জেলা উন্নয়ন বাংলো। কিন্তু এখানে খাবার কোন ব্যবস্থা নেই।

কার্শিয়াং :—

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছোট রেলে কার্শিয়াং যাওয়া যায়। দার্জিলিং থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরত্ব। ৪৮৫৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই স্থানের জলহাওয়া অত্যন্ত ভাল। এখানে থাকার জন্য কয়েকটি হোটেল এবং বাংলো আছে।

ডাউ হিল

কার্শিয়াং শহর থেকে পাহাড়ের উপরে ৩ মাইল উঠলে পাওয়া যায় ডাউ হিল। উচ্চতা ৭৫০০ ফুট। এখানে বনবিভাগের শিক্ষা বিদ্যালয়, দুটি সরকারী বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, বাগান এবং বনবিভাগের বাংলো আছে। এই সব বাংলাতে থাকবার জায়গা আছে। এ ছাড়া একটি যুব হোস্টেলও আছে। এখানকার আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

কালিম্পং :—

৪০০০ ফুট উচ্চে এবং দার্জিলিং থেকে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত এই পার্বত্য শহরটি। পথের দুধারে বড় বড় গাছের মধ্য দিয়ে পেশক রোড চলে গেছে।

পেশক চাবগানও ঐ রাস্তায়। তাছাড়া একাধিক চাবাগান চোখে পড়ে যে বাগানগুলির চা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ। কালিম্পং পৌঁছবার আগে তিস্তা নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু পেরিয়ে তবে যেতে হয়। এর কাছেই তিস্তা ও রঙ্গিয়ার সঙ্গম দেখা যায়। শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং থেকে নিয়মিত বাস কালিম্পং যাতায়াত করে। ভাড়া সীট অনুযায়ী পাঁচ থেকে আট টাকার মধ্যে।

থাকবার স্থান :—

কালিম্পং ও দার্জিলিং-এ একাধিক ভাল ভাল হোটেল রয়েছে। এ ছাড়া মধ্যম আয়ের ব্যক্তিদের জন্যও অনেক হোটেল আছে। হোটেলগুলিতে খাবার ও থাকবার জল দৈনিক জন প্রতি ৩০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত লাগে। খাওয়া-দাওয়া ভালই। রাজ্য সরকারের দুটি পর্যটন বাংলো আছে দার্জিলিং-এ, একটি বিলাসবহুল ট্যুরিস্ট লজ, অন্যটি মধ্যম শ্রেণীর লজ জলপাহাড়ের একেবারে উপরে অবস্থিত। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। এ ছাড়া অনেকগুলি ধর্মশালাও আছে। আর আছে পূর্ত ও বনবিভাগের ডাকবাংলো। সেখানে থাকার ও খাবার সকল বন্দোবস্ত আছে। ট্যুরিস্ট লজের জন্য লিখতে হয়, Tourist officer, Tourist Bureau, Govt. of West Bengal, Nehru Road, Darjeeling.

কালিম্পং-এর বিলাস বহুল অথবা ইকনমি ক্লাশের টুরিস্ট লজের জন্য যোগাযোগ করতে হবে Manager, Tourist Lodge, Kalimpong, Darjeeling-এর সঙ্গে।

চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা

হাওড়া থেকে ১৪৫ মাইল দূরে আগের মিহিজাম শহরটি রূপান্তরিত হয়েছে চিত্তরঞ্জন কারখানায়। এখানে আগে বাষ্পীয় ইঞ্জিত তৈরী হত কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিক ও ডিজেল ইঞ্জিন নির্মিত হচ্ছে। আগে থেকে লিখলে কারখানা দেখার অনুমতি পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি হোটেল আছে।

দুর্গাপুর

ভারতের দুর্গাপুর স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের মানসপুত্র। মাত্র ১০০ মাইল দূর কলকাতা থেকে। কোক ওভেন, হিন্দুস্থান ষ্টিলস, দুর্গাপুর ব্যারেজ, সার কারখানা, মাইনিং অ্যাণ্ড এলায়েড মেসিনারী, চশমার গ্লাসের কারখানা, তাপ-

বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি একাধিক কারখানা আছে এখানে। এটি পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ শিল্প-শহরে রূপান্তরিত হয়েছে।

মাইথন বাঁধ

দামোদর নদীতে বাঁধ দিয়ে একাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চলেছে এখানে। আসানসোল থেকে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। দুটি পাহাড়ের মাঝে এই বাঁধ দ্বারা জল ধরে রাখা হয় ও টারবাইনের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ডি, ভি, সি-র বাংলো রয়েছে, সেখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে। স্থান সংরক্ষণের জন্য Executive Engineer, D. V. C, Project, Bhawani Bhawan, Calcutta 27-কে লিখতে হয়।

জয়রামবাটি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গিনী শ্রীসারদা মায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটি। এখানে কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে মার্বেল নির্মিত মন্দিরটি অপূর্ব। এখানে রামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর জন্মদিনে উৎসব হয়। এখান থেকে ৩ মাইল দূরে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়েছিল। কলকাতা থেকে রাজ্য পরিবহনের আরামদায়ক বাস প্রতি রবিবার জয়রামবাটি ও কামারপুকুর যায়। পশ্চিমবঙ্গ টুরিস্ট ব্যুরোর সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে হয়।

বিষ্ণুপুর :—

কলকাতা থেকে ১০০ মাইল দূরে বাঁকুড়া জেলায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর অবস্থিত। ষোড়শ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মল্লরাজারা এখানে রাজত্ব করেন। বিশেষতঃ রাজা হাম্বীরের সময়েই এই শহরের বাড়বাড়ন্ত আরম্ভ হয়। এটি চলিতে থাকে ইংরাজ আগমনের আগে পর্যন্ত। তারপর নিলামে বিক্রয় হয়ে যায় বিষ্ণুপুর স্টেট বর্ধমানের মহারাজার কাছে। এই সময়ের বহু মন্দির ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও দর্শকদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। এখানকার হস্তশিল্প, রেশমের শাড়ী ভারত বিখ্যাত। কয়েকটি সুন্দর সুন্দর হ্রদ ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে।

যানবাহন :—

কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ মাইল এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর-আদ্রা

শাখায় অবস্থিত। বোম্বে থেকে টাটা অথবা খড়্গপুরে গাড়ী বদল করে এখানে আসা যায়। দিল্লী থেকে গোমো হয়ে এখানে আসা যায়। মাদ্রাজ থেকে খড়্গপুরে এসে গাড়ী বদল করতে হয়। কলকাতা থেকে দৈনিক দুটি গাড়ী, আদ্রা প্যাসেঞ্জার এবং গোমো প্যাসেঞ্জার বিষ্ণুপুরে যায়। সব থেকে সুবিধা দুর্গাপুর ট্রেন যাওয়া এবং ওখান থেকে বাঁকুড়া হয়ে সরাসরি বিষ্ণুপুর পর্যন্ত বাসে যাওয়া। খড়্গপুর হয়ে মোটর রাস্তায় বিষ্ণুপুর মাত্র ১২৬ মাইল।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

রাসমঞ্চ

রাসমঞ্চের গঠনশৈলী ও স্থাপত্য সমগ্র বিষ্ণুপুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটি মন্দিরও নয় এবং এখানে মূর্তিও নেই। তবে যখন মল্লরাজাদের সময় বৈষ্ণব-ধর্মের বান ডেকেছিল তখন বীর হাম্বীর এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাস পূর্ণিমায় যখন উৎসব হত তখন বিষ্ণুপুরের সমস্ত কৃষ্ণ-রাধা মূর্তি এখানে আনা হত। এখানে হাজার হাজার লোক জড় হয়ে রাসলীলা উৎসব পালন করত। এটি গঠনশৈলী বিচিত্র। ভিতরের মন্দিরের উপরে পিরামিড আকৃতিতে এটির গম্বুজ নির্মিত।

দলমাদল কামান

যখন মারাঠা আক্রমণে বাংলাদেশ কম্পিত তখন ভাস্কর পণ্ডিতকে পরাজিত করার জন্য এই কামানটি তৈরী করা হয়েছিল। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় সেই যুগে কি করে নির্মিত হয়েছিল এই কামানটি।

মদনমোহন মন্দির

বিষ্ণুপুরের সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রসিদ্ধ এই মন্দিরটি ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লরাজ দুর্জয় সিংহ নির্মাণ করেন। ৪০ ফুট চওড়া সম্মুখভাগ এবং ৫২ ফুট লম্বা এ মন্দিরটির দেওয়াল পোড়ামাটির কারুকার্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। দক্ষিণের দেওয়ালের পোড়ামাটির কাজ সারা বিশ্বে অনন্য বলা যেতে পারে।

জোড়বাংলো মন্দির

মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। বাংলাদেশের মন্দিরশিল্পে এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই মন্দিরটি। দুটি কুঁড়েঘর

একসঙ্গে জুড়ে দিলে যেমন দেখতে হয় এই মন্দিরটি গড়নও তাই। এছাড়া মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির অলংকরণও সুন্দর।

শ্যামরায় মন্দির

এটিও রঘুনাথ সিংহের কীর্তি। এটি নির্মাণ করেন ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। পুরাতন পঞ্চরত্ন মন্দিরের মধ্যে এটি অন্যতম। এখানেও পোড়ামাটির কাজের অনেক নিদর্শন আছে।

মল্লেশ্বরের মন্দির

এটির গঠনরীতি এতই ভিন্ন যে এই সময়ের বিষ্ণুপুরের সব ক'টি মন্দিরের থেকে এটির শৈলী আলাদা। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দের বীর সিংহ এই শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন। এটির গঠন 'রেখদেউল' স্থাপত্যের নিদর্শন।

থাকবার স্থান ঃ—

এখানে ভাল হোটেল নেই। দু'একটি সাধারণ হোটেল আছে, কিন্তু থাকার ভাল ব্যবস্থা নেই। থাকবার ভাল ব্যবস্থা আছে পূর্তবিভাগের ডাক-বাংলোতে। এখানে স্থান সংরক্ষণের জন্য প্রধান বাস্তুকার (Chief Engineer) বাঁকুড়াকে লিখতে হয়। তবে সব থেকে ভাল থাকার জায়গা বিষ্ণুপুরের সরকারী ট্যুরিস্ট লজ। এখানের কয়েকটি ঘর শীততাপ নিয়ন্ত্রিতও আছে। প্রতিটি ঘরের সঙ্গে চানঘর থাকায় খুবই সুবিধা হয়েছে। খাবার ব্যবস্থাও ভাল। ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ, বিষ্ণুপুরের কাছে স্থান সংরক্ষণ করা যায়। বিষ্ণুপুর বেড়াবার প্রকৃষ্ট সময় সেপ্টেম্বর—মার্চ মাস।

বক্রেশ্বর

সিউড়ি থেকে ১৩ মাইল দূরে বক্রেশ্বর অবস্থিত। সিউড়ি যেতে হলে ট্রেনে সাঁইথিয়া জংশনে গাড়ী বদল করতে হয়। সাঁইথিয়া বারহারওয়া লুপের একটি জংশন স্টেশন। এছাড়া হাওড়া-মোগলসরাই লাইনের উপর অণ্ডাল একটি জংশন, যেখান থেকে সিউড়ি যাওয়া যায়। সিউড়ি থেকে বাসে করে বক্রেশ্বর যাওয়া যায়। সাঁইথিয়া এবং বোলপুর থেকেও সিউড়িতে বাস যায়। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আবহাওয়া খুবই সুন্দর। এখানে অনেকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। এর মধ্যে একটি এতই উত্তপ্ত যে চাল ফেলে দিলে ভাত হয়ে যায়।

মাসাঞ্জোর বাঁধ

ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃষি এবং জলবিদ্যুতের সুবিধা হয়েছে। কানাডার সহায়তায় এখানকার বাঁধ নির্মিত হওয়ায় অনেকে একে কানাডা বাঁধও বলে থাকে। সিউড়ি থেকে ২৫ মাইল দূরে এটি অবস্থিত। যদিও বাঁধটি বিহারে অবস্থিত, তবু তত্ত্বাবধান করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই জলাধার এবং জলাধারের নীচেই পার্কটি দেখার মত। চারিদিকে পাহাড় এবং মধ্যে জলাধারটি দর্শনীয়। এখানে একটি ডাকবাংলো ও একটি যুব হোস্টেল আছে। ম্যানেজার, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, মাসাঞ্জোর, বিহার-এর নিকট সংরক্ষণের জন্য লিখতে হয়।

শান্তিনিকেতন ঃ—

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন যেখানে সহস্রশাখা বনস্পতির মত প্রসারিত হয়েছিল, সেই শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পুণ্যতীর্থ। কলকাতা থেকে এই স্থানের দূরত্ব ১০০ মাইল। কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেল বা আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে সরাসরি বোলপুর স্টেশনে আসা যায়। বোলপুর থেকে সাইকেল রিক্সা ও বাসে শান্তিনিকেতন যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে এ ছাড়াও অনেকগুলি ট্রেন আছে। দিল্লী ও বোম্বাই থেকে আসতে হলে বর্ধমানে গাড়ী বদল করে বোলপুর যাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকে আসতে হলে কলকাতা হয়ে আসাই ভাল। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত এই স্থানের পরিবেশ, সংগীত ও নৃত্যনাট্য অপূর্ব। যাঁরাই রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসেন তাঁরাই আসেন তাঁর মানসকন্যাকে দেখতে। শ্রীনিকেতন, উত্তরায়ণ, উদয়ন, সংগীত ভবন, কলা ভবন, ছাতিমতলা, উপাসনা গৃহ প্রভৃতি দেখার মত। কবির জীবনের সঙ্গে এই প্রতিটি জায়গাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এইসব জায়গায় ঘুরলে কবির যেন স্পর্শ পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা দিবস ৭ই পৌষে একটি বিরাট মেলা বসে এখানে। তাছাড়া শান্তিনিকেতন দোল-উৎসব অবিস্মরণীয়। বুধবার শান্তিনিকেতন বন্ধ থাকে। এখানে ট্যুরিস্ট কটেজে থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে।

কেন্দুবিল্ব

অজয় নদীর তীরে প্রসিদ্ধ কেন্দুবিল্ব গ্রামটি কবি জয়দেবের জন্মস্থান।

প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে, যেখানে আউল-বাউলের বিচিত্র বর্ণের পোশাক ও সঙ্গীত মানুষকে আকৃষ্ট করে। এখানে একটি মন্দির আছে যার পোড়ামাটির কাজ সুন্দর। বর্ধমান, সিউড়ি ও শান্তিনিকেতন থেকে নিয়মিত বাস কেন্দুবিল্ব যাতায়াত করে। এখানে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই।

দীঘা ঃ—

বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত দীঘা সমুদ্র সৈকত ভ্রাম্যমানদের বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করে। এখানকার সমুদ্র সৈকত প্রায় ৫ মাইল লম্বা ও খুবই শক্ত। এমনকি উড়োজাহাজ পর্যন্ত নামতে পারে। উপকূলকে রক্ষা করে অজস্র ঝাউগাছের বন। দীঘায় সমুদ্র-স্নান বেশ আনন্দদায়ক। পুরীর সমুদ্রের চেয়ে এর ঢেউ একটু কম বলে অনেকের স্নান করতে খুবই ভাল লাগে। দীঘার আর এক সৌন্দর্য বালিয়াড়ি। এ ছাড়া সমুদ্রোপকূলে মাছধরা দেখার আনন্দও কম নয়।

যানবাহন ঃ—

সব থেকে সুবিধা হাওড়া থেকে খড়্গপুর ট্রেনে যাওয়া, দূরত্ব মাত্র ৭২ মাইল। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের যে কোন গাড়ীতে হাওড়া থেকে খড়্গপুর যাওয়া যায়। এছাড়া হাওড়া ও খড়্গপুরের মধ্যে একাধিক লোকাল ট্রেন যাতায়াত করে। খড়্গপুর থেকে দীঘার দূরত্ব ৭৭ মাইল। পীচঢালা সুন্দর রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়। অনেকগুলি বাস খড়্গপুর ও দীঘার মধ্যে যাতায়াত করে। সময় লাগে ৩ ঘণ্টার মত, ভাড়া প্রায় ৫ টাকা। এ ছাড়া রাজ্য পরিবহনের বাস দৈনিক দীঘা ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করে, সময় লাগে প্রায় ৬ ঘণ্টা। ভাড়া ১৫ টাকা। এতে গেলে কোথাও গাড়ী বদল করতে হয় না। এ ছাড়া দীঘা-আসানসোল, দীঘা-মেদিনীপুর, দীঘা-বর্ধমান, দীঘা-বাঁকুড়া প্রভৃতির মধ্যে দৈনিক বাস যাতায়াত করে।

থাকবার স্থান ঃ–

দীঘায় একাধিক থাকবার জায়গা আছে। সরকারী পরিচালনায় অনেক-গুলি থাকার জায়গা পাওয়া যায়। একটি বিলাসবহুল টুরিস্ট লজ আছে।

বিছানা ও আসবাব দ্বারা সুসজ্জিত। ঠাণ্ডা ও গরম জল কল খুললেই পাওয়া যায়। এ ছাড়া সৈকতাবাসএ সুইট ও ঘরভাড়া পাওয়া যায়। প্রতিটি সুইট সুসজ্জিত, স্নানঘর ও রান্নাঘর সহ ভাড়া উপরে ৩০ টাকা এবং নীচে ২৬ টাকা। আর ডবল রুমের চার্জ নীচে ১৩ টাকা ও উপরে ১৫ টাকা। এ ছাড়াও টুরিস্ট কটেজে থাকা যায়। একক ঘর বিশিষ্ট কটেজ ভাড়া ৫·২৫ টাকা এবং দুইটি ঘর বিশিষ্ট কটেজের ভাড়া ৬·৫০ টাকা। বেশী লোক থাকবার জন্য চীপ ক্যান্টিন রয়েছে যেখানে থাকবার জন্য জন প্রতি ১·৫০ টাকা লাগে। প্রত্যেক স্থানেই ক্যান্টিন আছে যেখানে খাওয়া যায় অথবা প্রত্যেক জায়গাতেই তৈজসপত্র সহ রান্নাঘর আছে যেখানে রান্না করে খাওয়া চলে। আর আছে এমন অনেকগুলি হোটেল যেখানে থাকা ও খাবার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া আছে দীঘা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনেকগুলি রেস্ট হাউস, পূর্ত ও বনবিভাগের ডাকবাংলোও আছে, যেখানে থাকা ও খাবার ব্যবস্থা করা যায়।

।। আন্দামান ।।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

একদিন আন্দামান ছিল 'কালাপানি'র দেশ। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা নির্বাসিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত দুঃস্বপ্নপুরী এই আন্দামানের জেলখানায় গিয়ে পৌঁছতেন। সেখানে তাঁরা স্বজন পরিত্যক্ত অবস্থায় অত্যাচারিত হয়ে অসহনীয় যন্ত্রণায় কাল কাটাতেন। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন ভারতেরই অঙ্গ। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উর্মীমালা বিধৌত সেই সুন্দরী আন্দামান নবরূপে এখন ভ্রাম্যমানের কৌতুহলী দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে চলেছে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তিন শত পঞ্চাশটি বিভিন্ন আকৃতির দ্বীপের সমবায়ে গঠিত।

পোর্ট ব্লেয়ার ঃ—

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনকার্য পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র এই পোর্ট ব্লেয়ার। পর্যটকেরা সাধারণতঃ পোর্ট ব্লেয়ারকে কেন্দ্র করেই দ্বীপপুঞ্জ পরিক্রমা করে থাকেন। কলকাতা এবং মাদ্রাজ থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের দূরত্ব যথাক্রমে ১২৫৫ কিলোমিটার ও ১১৯১ কিলোমিটার।

যানবাহন ঃ—

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স্-এর বিমান সপ্তাহে দু'দিন কলকাতা ও পোর্ট ব্লেয়ারের মধ্যে যাতায়াত করে।

এছাড়া সমুদ্র পথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে জাহাজযোগে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দুটি যাত্রীবাহী জাহাজ কলকাতা-মাদ্রাজ ও পোর্ট ব্লেয়ারের মধ্যে যাওয়া আসা করে। এই জাহাজ ছাড়ার সময় জানতে হলে যোগাযোগ করতে হবে ঃ—

(i) The shipping Corporation of India Limited, Nilhat House.

11, R. N. Mukherjee Road, Calcutta.

(ii) M/s. K. P. V. Sheikh Mohammed Rowther & Co.

41, Linghi Chetty Street, Madras.

(iii) The Harbour Master, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair.

আন্দামান যেতে গেলে প্রথমেই কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে।

(১) কেবিনে স্থান পাবার জন্য নিম্নের ঠিকানায় দরখাস্ত করতে হবে :—

Assistant Secretary to the Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.

বাঙ্কে স্থান সংরক্ষণের জন্য নিম্নের ঠিকানায় দরখাস্ত করতে হবে :—

Harbour Master, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.

(২) দরখাস্তে নিম্নের বিষয়গুলি অবশ্যই জানাতে হবে।

[ক] যাত্রীর নাম [খ] পিতার নাম [গ] ঠিকানা [ঘ] জাতীয়তা [ঙ] যাত্রার উদ্দেশ্য [চ] দ্বীপে অবস্থিতির সম্ভাব্য সময়-সীমা [ছ] জাহাজে দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রার সম্ভাব্য সময় [জ] কলকাতা অথবা মাদ্রাজ, কোন্ বন্দর থেকে যাত্রী দ্বীপে যেতে চায় তার উল্লেখ [ঝ] কেবিন, বাঙ্ক প্রভৃতি কি ধরনের স্থান যাত্রী সংরক্ষণ করতে চায় তার উল্লেখ।

(৩) স্থান সংরক্ষণ, কেবিন (নানা শ্রেণীতে বিভক্ত), বাঙ্ক প্রভৃতিতে করা যেতে পারে। আরামপ্রদ কেবিনগুলির ভাড়া কমপক্ষে দুইশত, উর্ধ্বসীমা সাড়ে তিন শতের মত। খাওয়ার চার্জ আলাদা। বাঙ্কের ভাড়া কিঞ্চিদধিক চল্লিশ টাকা। খাবার জন্য ক্যানটিন আছে। প্রতিদিন জনপ্রতি ৩.৭০ খাবার খরচ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক অথবা ছাত্রদের জন্য অর্ধ মূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে।

(৭) যাত্রীদের কলেরা ইনজেক্সনের (ছ'দিনের কম নয়, ছ'মাসের বেশী নয়) সার্টিফিকেট এবং বসন্তের টিকার (আট দিনের কম নয়, তিন

বছরের বেশী নয়) সার্টিফিকেট অবশ্যই রাখতে হবে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক হেল্‌থ্‌ সার্টিফিকেটই গ্রাহ্য হবে। কলকাতার স্ট্রাণ্ড রোডে অবস্থিত নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর দ্বিতলের অফিস থেকে এই সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দ্বীপে যাবার জন্য ফেরী সার্ভিস আছে।

আন্দামানের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা আছে। ট্যাক্সিও ভাড়ায় পাওয়া যায়।

আন্দামানে যাতায়াতে জাহাজে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। পাঁচ ছ'দিন পোর্ট ব্লেয়ারে অবস্থান করার পর জাহাজ ফিরে আসে।

দু'সপ্তাহের কম সময়ে আন্দামান দেখা সম্ভব নয়। হাতে বেশী সময় নিয়ে গেলে বিভিন্ন দ্বীপ ঘুরে ঘুরে দেখা যায়।

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ—

পোর্ট ব্লেয়ার

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনকার্য এখান থেকেই পরিচালিত হয়। এটি সমুদ্র-সান্নিধ্যে একটি সুন্দর শহর। পোর্ট ব্লেয়ারকে কেন্দ্র করে সাধারণতঃ পর্যটকেরা পরিভ্রমণ করেন।

কৌতূহলী পর্যটকেরা পোর্ট ব্লেয়ারে সন্ধান নিয়ে একটি গ্রাম দেখে আসতে পারেন যেখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীরা ঘরবাড়ী তৈরী করে সংসার পেতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।

সেলুলার জেল

এই জেলখানাটি অবশ্য দর্শনীয়। অগ্নিযুগের বহু বিপ্লবী নির্বাসিত হয়ে এই জেলে কাল কাটিয়েছেন। বিপ্লবী বীর সাভারকরও এখানে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। গত বিশ্বযুদ্ধে জাপানী বোমার আঘাতে এই জেলের কিছু অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কারবাইন্‌স্‌ কোভ

একটি রমণীয় সমুদ্র সৈকত। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি একটি উপভোগ্য পিকনিকের স্থান। ছুটির দিনে বাস যাতায়াত করে। তাছাড়া ট্যাক্সি ভাড়া করেও যাওয়া যায়।

মিউজিয়াম

এখানে নৃতত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্যালারী আছে।

ফিস্ এ্যাকোয়ারিয়াম

পোর্ট ব্লেয়ারের মেরিন পার্কে এই এ্যাকোয়ারিয়ামটি বিশেষভাবে দর্শনীয়।

হর্টি কালচার ও জুলজিক্যাল গার্ডেন

এই উদ্যান পোর্ট ব্লেয়ারের হাডো অঞ্চলে অবস্থিত। বিশেষ তথ্যানুসন্ধানী এবং সাধারণ দর্শক সকলেই এই উদ্যান দেখে আনন্দ পাবেন।

থাকবার স্থান :—

পোর্ট ব্লেয়ারে হোটেল নেই। সরকারী ব্যবস্থাপনায় থাকা যায়। থাকার খরচ ৫'৫০ টাকা থেকে ১০'৫০ টাকার মধ্যে দৈনিক জনপ্রতি। খাবার খরচ আলাদা।

দক্ষিণ আন্দামানে যে সকল পর্যটন বাংলো আছে তার তালিকা :—

(১) Tourist Home, Haddo, Port Blair. (২) Tourist Home Carbyns Cove, Port Blair. (৩) Circuit House, Haddo, Port Blair. (৪) Rest House, Haddo, Port Blair. (৫) Inspection Bungalow, Ferragunj. (৬) Rest House, Neil Island প্রভৃতি।

মধ্য আন্দামানের পর্যটন বাংলোর তালিকা :—

(১) Rest House—Betapur. (২) Rest House—Kadamtala. (৩) Rest House—Ranaghat,

উত্তর আন্দামানের পর্যটন বাংলোর তালিকা :—

(১) Rest House—Aerial Bay. (২) Rest House—Kadamtala. (৩) Rest House—Diglipur. (৪) Circuit House—Nayabunder প্রভৃতি।

নিকোবরের পর্যটন বাংলোর তালিকা :—

(১) Circuit House—Car Nicobar.

(২) Inspection Bungalow—Car Nicobar.

(৩) Guest House—Kamorta.

এই সকল পর্যটন বাংলোতে থাকতে গেলে অনুমতি নিতে হয় :—

(১) Executive Engineer, North Division, Andaman & Nicobar Public Works Dept., Port Blair.

অথবা—

(২) Principal Engineer, Andaman and Nicobar, P. W. D., Port Blair.

নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশের দর্শনীয় স্থানগুলির হোটেল তালিকা প্রদত্ত হল। পশ্চিমী ধরনের হোটেলগুলির তালিকা শুরু হবার আগে একটি (প) চিহ্ন এবং ভারতীয় ধরনের হোটেলগুলির তালিকা শুরু হবার আগে একটি (ভা) চিহ্ন থাকবে।

উত্তর প্রদেশ

লক্ষ্ণৌ

(প) হোটেল : কার্লটন, কাপুরস্, বারলিংটন। (ভা) হোটেল : সেনট্রাল, নিউ ইণ্ডিয়া, রিপাবলিক, বেঙ্গলী, অশোকা।

এলাহাবাদ

(প) হোটেল : বারনেটস্, রয়্যাল। (ভা) হোটেল : প্রয়াগ, রাজ, কোকো, অশোক।

বারাণসী

(প) হোটেল : হোটেল দি প্যারিস, ক্লার্কস,। (ভা) হোটেল : অজয়, মিণ্টো হাউস, গ্র্যাণ্ড, প্যালেস, কোয়ালিটি, পাণ্ডের ধর্মশালা, দশাশ্বমেধ বোর্ডিং, সেন্ট্রাল হোটেল, মর্ডান বোর্ডিং।

আগ্রা

(প) হোটেল : ইম্পিরিয়াল, লরী, ক্লার্ক, আগ্রা, অপ্সরা। (ভা) হোটেল : অশোক, ক্যালকাটা, দেবীকা, ইম্পিরিয়াল, বেঙ্গল লজ, টুরিস্ট হোম, মহারাজ।

নৈনীতাল

(প) হোটেল : গ্র্যাণ্ড, রয়্যাল, সুইজ, ওয়ালর্ডফ বেলভেডিয়ার, মেট্রোপোল। (ভা) হোটেল : করোনেশন, এভারেস্ট, অলকা, হিন্দু বোর্ডিং, লেক ভিউ, অশোকা, ভারত, সেন্ট্রাল, হিমালয়।

রাণীক্ষেত

(প) হোটেল : ওয়েস্ট ভিউ, মুন, নটনস্। (ভা) হোটেল : হিমালয়, অলকা, স্নো ভিউ, ডিসেণ্ট, গ্র্যাণ্ড, এভারেস্ট, টুরিস্ট, পার্বতীয়া।

আলমোড়া

(ভা) হোটেল : অশোকা, হিমালয়, মানস সরোবর, দেওদার, এ্যামব্যাসাডার, গ্র্যাণ্ড।

মুসৌরী

(প) হোটেল : চার্লেভিল, স্যাভয়, হকম্যান। (ভা) হোটেল : লাইব্রেরী ক্লাব, কন্‌ট ক্যাসেল, ইম্পিরিয়াল, হিমালয় ক্লাব, ওয়ালনাট গ্রোভ, ডুন ভিউ, কাশ্মীর, প্রিন্স, মিনার্ভা সিলভারটোন, মুসৌরী ক্লাব।

দেরাদুন

(প) হোটেল : রিজেণ্ট, হোয়াইট হাউস, ডুন গেস্ট হাউস।
(ভা) হোটেল ডুন ভিউ, যতি মহল, কন্‌ট, ভিক্টোরিয়া।

দিল্লী

দিল্লী

(প) হোটেল : ওবেরয় ইণ্টার কণ্টিনেণ্টাল, অশোকা। (ভা) হোটেল : আগ্রা, নিরুলা, এমব্যাসী, রণজিৎ, গ্র্যাণ্ড, রিভিয়েরা।

মধ্য প্রদেশ

জব্বলপুর

(প) হোটেল : জ্যাকসন। (ভা) হোটেল : দীপক লজ, নেপিয়ার টাউন, সৌরাষ্ট্র হিন্দু হোটেল, হিন্দুস্থান লজ, স্ট্যাণ্ডার্ড।

খাজুরাহ

(প) হোটেল : চ ন্দলা ভা) হোটেল : মাদ্রাজ কাফ হাউস, রাজকুমার।

ভুপাল

(প) হোটেল : প্যাগোডা, ইম্পিরিয়াল। (ভা) হোটেল : গ্র্যাণ্ড, নালন্দা, বিজয়, ডিলাইট, গুজরাট লজ, অশোক।

গোয়ালিয়র

(প) হোটেল : উষাকিরণ। (ভা) হোটেল : মান মন্দির, অশোকা, গুজরী মহল, লক্ষ্মী, অলঙ্কার, রিগ্যাল।

ইন্দোর

(প) হোটেল : ল্যান্টার্ন। (ভা) হোটেল : শান্তিনিকেতন, ভারতমাতা বিরাম লজ, ফ্রেণ্ডস বোর্ডিং, পুরোহিত লজ, চন্দ্রালোক, স্ট্যাণ্ডার্ড, বোম্বে পাঞ্জাব।

পাঁচমারী

(ভা) হোটেল : নিউ হোটেল ব্লক, ওল্ড হোটেল ব্লক, কৈলাস, তেওয়ারী লজ, গুপ্তা লজ।

উজ্জয়িনী

(ভা) হোটেল : আদর্শ, গুপ্তা লজ, তাজমহল, গ্র্যাণ্ড, শ্রীনিবাস, সাভেরা।

শিবপুরী

(ভা) হোটেল : শিবপুরী।

রাজস্থান

জয়পুর

(প) হোটেল : ক্ষেত্রী হাউস, জয়মহল প্যালেস, কাইজারি হিন্দ, রামবাগ প্যালেস, রাজস্থান স্টেট। (ভা) হোটেল : বসন্ত, ডিলাক্স, স্বাভয়, জয়পুর, টুরিস্ট, হিন্দ, আসাম লজ।

আজমীড়

(ভা) হোটেল : সিরাজ, নাগপাল টুরিস্ট, মেরিনা, স্ট্যাণ্ডার্ড।

চিতোরগড়

(ভা) হোটেল : চন্দ্রবিলাস, গ্রীন।

মাউন্ট আবু

(প) হোটেল : জয়পুর, লেক, মাউন্ট, রাজস্থান গভর্ণমেন্ট সার্কিট হাউস, গুজরাট সার্কিট হাউস। (ভা) হোটেল : রাজেন্দ্র, অশোক, ভারতীয় নিউ গেস্ট হাউস, নবজীবন, সরস্বতী, গণপতি, অরবিন্দ নিবাস লজ।

বিকানীর

(প) হোটেল : রাজস্থান স্টেট।

যোধপুর

(প) হোটেল : উমেদ ভবন, প্যালেস, রাজস্থান স্টেট। (ভা) হোটেল : শান্তি, অরুণ, গ্র্যাণ্ড, আদর্শ নিবাস, অশোক লজ, প্রীতম লজ, আগরয়াল লজ।

কোটা

(প) হোটেল : নবরং, ব্রিজরাজ ভবন, সার্কিট হাউস। (ভা) হোটেল : গ্র্যাণ্ড, আগরয়াল, কমল, ব্রাদ্রাজ।

উদয়পুর

(প) হোটেল : রাজস্থান স্টেট, লেক প্যালেস, লক্ষ্মীবিলাস প্যালেস। (ভা) হোটেল : অপ্সরা, অলকা, অজন্তা, মহা গুজরাট, গার্ডেন, মহালক্ষ্মী ভোজনালয়।

পাঞ্জাব

অমৃতসর

(প) হোটেল : মিসেস ভাণ্ডারীর গেস্ট হাউস, এয়ারলাইনস, রিজ। (ভা) হোটেল : ইম্পিরিয়াল, গ্র্যাণ্ড, গ্রীন।

হিমাচল প্রদেশ

চণ্ডীগড়

(প) হোটেল : মাউন্ট ভিউ। (ভা) হোটেল : আরোমা, টুরিস্ট, এ্যামব্যাসাডার।

ভাকরা নাঙ্গাল

(ভা) হোটেল : নাঙ্গাল টাউনশিপ, নাঙ্গাল।

কুলু

(ভা) হোটেল : ট্রাভেলার্স লজ, হিমাচল প্রদেশ গভর্নমেণ্ট টুরিস্ট বাংলো।

মানালী

(প) হোটেল : জন ব্যনন গেস্ট হাউস, পাইন উড, অশোকা গেস্ট হাউস।
(ভা) হোটেল : স্নো-ভিউ, ঠাকুরস, টুরিস্ট, রিজেণ্ট, প্রেম গেস্ট হাউস।

ডালহৌসী

(প) হোটেল : ডালহৌসি ক্লাব, গ্র্যাণ্ড, ক্লেয়ারস। (ভা) হোটেল : মেট্রো, স্প্রিং, গ্রীন, গ্লোরী।

সিমলা

(প) হোটেল : সেসিল, ক্লার্কস্, হিমল্যাণ্ড। (ভা) হোটেল : রক্সি, মেরিনা, ঠাকুর, কন্টিনেণ্টাল, পাইন ভিউ, ব্রিজ ভিউ।

কাশ্মীর

শ্রীনগর

(প) হোটেল : বাদশা, ওবেরয় প্যালেস, নেডোস। (ভা) হোটেল : মাজদা, এ্যামব্যাসী, মহালক্ষ্মী, রিভার ভিউ, খালসা, গেলর্ড, গ্র্যাণ্ড, নিলম, ম্যাজেষ্টিক।

গুলমার্গ

(প) হোটেল : নেডো, গলফ্ ভিউ, হাইল্যাণ্ড পার্ক। (ভা) হোটেল : স্নো ভিউ, খালসা, গুলমার্গ, ভারত হিন্দু, টুরিস্ট।

পহেলগাম

(প) হোটেল : নটরাজ। (ভা) হোটেল : রিগ্যাল, পহেলগাম, পাইন ভিউ, কাশ্মীর, খালসা, প্লাজা, গ্রীনল্যাণ্ড, মাউণ্ট ভিউ, ভল্লা।

গুজরাট

আহমদাবাদ

(প) হোটেল : রিজ, কামা, ক্যাপিটাল, গুলমার্গ, গ্র্যাণ্ড, রূপালী। (ভা) হোটেল : রাজমহল, সংস্কার, গ্রীন, চেতনা গেস্ট হাউস, আপনা ঘর।

ভাবনগর

(ভা) হোটেল : মহাবীর, এভারগ্রীন, কাশ্মীর।

জামনগর

(প) হোটেল : এভারেস্ট লজ, অশোক, চেতনা, ড্রিমল্যাণ্ড।

পোরবন্দর

(ভা) হোটেল : এভারগ্রীন, চন্দ্রবিহার, প্যারামাউন্ট, প্যারাডাউস, নবভারত লজ।

বরোদা

(প) হোটেল : সার্কিট হাউস, গ্রীন, স্টেভেল। (ভা) হোটেল করোনেশন, শ্রীনিবাস, আনন্দনিবাস, কৃষ্ণনিবাস, ন্যাশনাল, জগদীশ লজ।

দ্বারকা

(ভা) হোটেল মহালক্ষ্মী, ব্রজভুবন লজ, মুরলীধর লজ।

জুনাগড়

(ভা) হোটেল : সারদা লজ, মুরলীধর লজ, টুরিস্ট লজ।

রাজকোট

(ভা) হোটেল : কাথিয়াবাড়, গ্রীন, মনোহর, মহাবীর হিন্দু লজ, তাজমহল, মহাকালী।

সোমনাথ

(ভা) সোমনাথে হোটেল নেই। সমস্ত হোটেলগুলি ভেরাবল স্টেশনে। ওখানে লা বেলা লজ, লিবার্টি রেস্ট হাউস ইত্যাদি আছে।

মহারাষ্ট্র

বোম্বাই

(প) হোটেল : তাজমহল, নটরাজ, রিজ, সি প্যালেস, ওয়েষ্ট এণ্ড, হিলটপ, গ্র্যাণ্ড। (ভা) হোটেল : অ্যামব্যাসাডর, মেট্রোপোল, পার্কলেন, বেঙ্গল লজ, মিনার্ভা।

অউরঙ্গাবাদ

(প) হোটেল : প্রিন্ট ট্রাভেল, গ্রীনস, অউরঙ্গাবাদ। (ভা) হোটেল : কাথিয়াবাড়, সাধনা, অশোকা, সিটি, অজন্তা, এম্পায়ার, নটরাজ, টুরিস্ট হোম, ভীনে কাফে

পানাজী

(প) হোটেল : সোলমার, নেপচুন, মনদোভী। (ভা) হোটেল : রিভিয়েরা, ইন্দিরা নিবাস, সেনট্রাল, ইম্পিরিয়াল প্যালেস, ভারত লজ, গুজরাট লজ।

ভাস্‌কোডাগামা

(প) হোটেল : জুয়ারী।

মারগাঁও

(প) হোটেল : নেপচুপ, গোয়া উডল্যাণ্ডস। (ভা) হোটেল : দুর্গা, আনন্দ ভবন, টুরিস্ট সওয়াগত লজ।

মহীশূর

বাঙ্গালোর

(প) হোটেল : শিলটন, গ্র্যাণ্ড, ভিক্টোরিয়া, ওয়েষ্ট এণ্ড, লোবো। (ভা) হোটেল : টুরিস্ট, ব্রডওয়ে, মাদ্রাজ উডল্যাণ্ডস।

মহীশূর

(প) হোটেল : কৃষ্ণরাজ সাগর, মেট্রোপোল, রিজ। (ভা) হোটেল : গায়ত্রী ভবন, দশপ্রকাশ মডার্ন কাফে, মডার্ন হিন্দু, ইন্দ্র ভবন।

কেরালা

ত্রিবান্দ্রম

(প) হোটেল: মাস্কোট, ম্যাগনেট। (ভা) হোটেল: গান্ধী, এন্‌ডরু জেভিয়ার, ত্রিবান্দ্রম, এরিস্ট, সুন্দর টুরিস্ট হোম, পদ্মনাভস্বামী টুরিস্ট হোম, ভেঙ্কটেশ্বর টুরিস্ট হোম, তাজ, রিজ লজ।

কোচিন

(প) হোটেল: কেসিনো, গ্রাণ্ড, মালাবার, ইণ্টারন্যাশনাল, সী লর্ড। (ভা) হোটেল: এ্যামব্যাসী, মডার্ন, এয়ারলাইনস, ব্রিজ, সেন্‌ট্রাল, মাস্ কিটকাট, উডল্যাণ্ড, টারমিনাস্, কোচিন টুরিস্ট হোম।

কুইলন

(প) হোটেল: নীলা। (ভা) হোটেল: জেভিয়ার, এভারেস্ট, পূর্ণ প্রকাশ, আনন্দ ভবন।

পেরিয়ার

(প) হোটেল: অরণ্য নিবাস (বন্যজন্তু সংরক্ষণালয়)। (ভা) হোটেল: পেরিয়ার ভিউ, কুমিলী, ভাণ্ডি পেরিয়ার, রিজ।

তামিলনাড়ু

মাদ্রাজ

(প) হোটল: ক্লারিজ, কুইনস, ইম্পিরিয়াল, উডল্যাণ্ড, কোন্নেমারা, স্টেট গেস্ট হাউস। (ভা) হোটেল: ভিক্টোরিয়া, ওসিয়ানিক, স্যাভয়, অশোকা, দশ প্রকাশ, নিউ উডল্যাণ্ড।

তাঞ্জোর

(প) হোটেল: ট্রাভেলারস্ লজ। (ভা) হোটেল: তাঞ্জোর কাফে, সেন্‌ট্রাল, কৃষ্ণা লজিং, আনন্দ লজ, গীতা কাফে, ফেঙ্কটেশ্বর লজ।

মাদুরা

(প) হোটেল: ট্রাভেলারস্ লজ, পানডায়ান। (ভা) হোটেল: উদিতি

বোর্ডিং অ্যাণ্ড লজিং, কলেজ হাউস, মিডল্যাণ্ড, মাদুরা ক্লাব, ইউনিয়ন ক্লাব, গেস্ট হাউস।

ত্রিচিনপল্লী

(প) হোটেল : এরিস্টো, ট্রাভেলারস্ লজ, ত্রিচিনপল্লী ক্লাব, এ্যামবাসী। **(ভা)** হোটেল : মডার্ন হিন্দু, কল্পনা, অজন্তা, মায়াভরম লজ, অশোক ভবন।

রামেশ্বরম

(ভা) হোটেল : মীনাক্ষী লজ।

কোদাইকানাল

(প) হোটেল : কার্লটন। **(ভা)** হোটেল : শনমুগাভিলাস, হলি ডে হোম, বাসস্ট্যাণ্ড লজিং রুম, টুরিস্ট বাংলো, মিসেস লোগানস্ গেস্ট হাউস, হাইওয়ে ট্রাভেলারস্ বাংলো।

উতকামণ্ড

(প) হোটেল : স্যাভয়, সিসিল। **(ভা)** হোটেল : মডার্ন লজ, দশ প্রকাস, উডল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন হাউস।

অন্ধ্রপ্রদেশ

হায়দ্রাবাদ

(প) হোটেল : রক্ ক্যাসেল, পার্শী, রিজ। **(ভা)** হোটেল : নিউ মাইশোর কাফে, তাজমহল, বৃন্দাবন, দ্বারকা।

নাগার্জুনসাগর

(ভা) হোটেল : টুরিস্ট এনেক্সি, ভিজিটরল্ লাউঞ্জ, কটেজ, প্রজেক্ট হাউস।

উড়িষ্যা

ভুবনেশ্বর

(ভা) হোটেল : পুষ্পক, রাজমহল, বেনারসওয়ালা, নিউ সেনট্রাল।

পুরী

(প) হোটেল : সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে। (ভা) হোটেল : ভিক্টোরিয়া ক্লাই, পুরী, সাগরিকা, ব্যারণ, বে-ভিউ, ওসান ভিউ, প্লাজা।

বিহার

পাটনা

(ভা) হোটেল : ইণ্ডিয়া, পাটনা লজিং, মাড়োয়ারী, অমর, শ্রী প্রকাশ, রাজস্থান।

রাজগীর

(ভা) হোটেল : উদয়ন, বেণুবন, গ্রান।

গয়া

(ভা) হোটেল : রাজপাল, পাঞ্জাব, অবন্তিকা, কৃপা লজ, কল্পনা রেস্ট হাউস।

রাঁচী

(প) হোটেল : দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, মাউণ্ট, যুবরাজ। (ভা) হোটেল : প্যালেস, মহারাজা, গুজরাট, মিডল্যাণ্ড, রাজ, আর্য, সঙ্গম, আনন্দ।

হাজারীবাগ

(ভা) হোটেল : প্রিন্স, স্ট্যাণ্ডার্ড, প্যাগোডা।

জামসেদপুর

(প) হোটেল : টিস্কো, বুলেভার্ড, নটরাজ। (ভা) হোটেল : হিন্দু লজ গ্রান, গুজরাট বোর্ডিং, বালি।

পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা

(প) হোটেল : এয়ারপোর্ট হোটেল, হিন্দুস্থান, গ্রাণ্ড, গ্রেট ইস্টার্ন, পার্ক, কার্লটন, এশিয়া, রাসেল, ব্রডওয়ে, স্পেনসেস্। (ভা) হোটেল : শান্তিনিকেতন, এ্যামব্যাসি, পূর্বরাগ, টাওয়ার, টাওয়ার লজ, শ্রীনিকেতন, আইডিয়াল হোম, অশোকা, ইণ্ডিয়া।

দার্জিলিং

(প) হোটেল : মাউণ্ট এভারেস্ট, সুইস, উডমণ্ড, নিরুলা, এ্যামব্যাসী, লুইস জুবিলী স্যানাটোরিয়াম, এলিস্ ভিলা। **(ভা)** হোটেল : স্নো ভিউ, কুণ্ডু, ইণ্ডিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা, হিমালয়, সেনট্রাল বোডিং, হিন্দু বোডিং, এভারগ্রীন, অশোকা, হিমালয়ান প্যালেস, অন্নপূর্ণা, ম্যাজেষ্টিক, শবন্‌ম।

কালিম্পং

(প) হোটেল : হিমালয়ান, **(ভা)** হোটেল : হিল ভিউ, প্যারাডাইস।

আসাম

শিলং

(প) হোটেল : পার্ক, পাইন উড। **(ভা)** হোটেল : আসাম, আনন্দ, অশোক, দিল্লী, ক্যালকাটা, রয়াল, হ্যাপী লজ, প্রকাশ, স্যানী, মনসুন।

গৌহাটি

(প) হোটেল : স্টেডিয়াম গেস্ট হাউস, এ্যামব্যাসাডার, নোভা। **(ভা)** হোটেল : অলকা, জনতা, হ্যাপী লজ।

মনিপুর

ইম্ফল

(প) হোটেল : মণিপুর। **(ভা)** হোটেল : ডিপ্লোম্যাট, এ্যামব্যাসাডার, পোলো ভিউ, গেস্ট হাউস, রাজ।

ত্রিপুরা

আগরতলা

(ভা) হোটেল : সৌরাষ্ট্র, ও. কে., রিজ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তীর্থ কেন্দ্র

এই সকল কেন্দ্রে যাত্রীরা তিন দিন থাকতে পারেন।

অধিক দিন থাকতে হলে ঃ ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা (সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়) থেকে অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে।

বারাণসী ঃ

বিদ্যাপীঠ রোড, সিগরা, বারাণসী-১ ইউ, পি।

প্রয়াগ ঃ

৯৩, তুলারাম বাগ, মহাত্মা গান্ধী রোড, এলাহাবাদ, ইউ, পি।

বৃন্দাবন ঃ

পোঃ বৃন্দাবন, জেলাঃ মথুরা, ইউ, পি।

হরিদ্বার ঃ

পোঃ হরিদ্বার, জেলাঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি।

গয়া ঃ

স্বরাজ্যপুরী রোড, গয়া, বিহার। (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অফিস স্টেশনে আছে। গয়ার সবকিছু তথ্যের জন্য অবশ্যই ওখানে অনুসন্ধান করবেন।

পুরী ঃ

স্বর্গদ্বার রোড, পুরী, উড়িষ্যা।

নবদ্বীপ ঃ

আমফুলিয়া পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেলাঃ নদীয়া।

●